# সাংবাদিকতা

## নীতি শৈলী শৈথিল্য

ড. সুধাংশু শেখর রায়

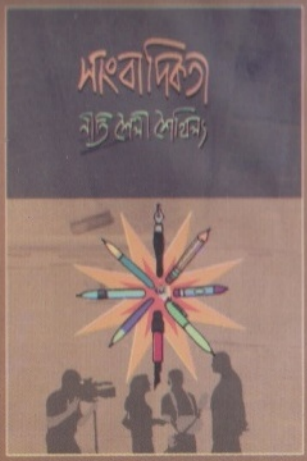


**সাংবাদিকতা নীতি শৈলী শৈথিল্য** বইটি সাংবাদিকতার কয়েকটি ক্ষেত্রকে সমন্বিত করে লেখা। প্রথাসিদ্ধ রেফারেন্স বইয়ের আঙ্গিকে লেখা না হলেও বইটিতে গ্রথিত লেখাগুলো সাংবাদিকতার পাঠ হিসেবে অনায়াসেই ব্যবহার করা যাবে। বইটি চরিত্রগত দিক দিয়ে ভিন্নধর্মী কিছু লেখার সমষ্টি হলেও তার মূল মনোনিবেশ হচ্ছে সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতা এবং শৈলী ও শৈথিল্য।

চরিত্র অনুযায়ী লেখাগুলোকে চারটি ক্যাটেগরিতে ভাগ করা হয়েছে। এর প্রথমটিতে সংবাদপত্রের ধারা-ধরণ ও ইতিহাস-ঐতিহ্য অন্বেষণ করা হয়েছে। সাংবাদিকতার বিভিন্ন পথপরিক্রমায় তার ধরন, স্টাইল, কৌশল ও বিষয়কে বিশ্লেষণ করে বর্তমান প্রেক্ষাপটকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গিটিও প্রতিফলিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে টেলিভিশন মাধ্যমের পরিবেশনা ও প্রভাব সম্পর্কে গবেষণাধর্মী ও একাডেমিক আলোচনা করা হয়েছে। টিভিমাধ্যম কেমন করে কাজ করে অথবা তারা প্রভাব তৈরিতে কী ভূমিকা রাখে সে সম্পর্কে এখানে মনোনিবেশ করা হয়েছে।

তৃতীয় ভাগে সাংবাদিকতাবিষয়ক নীতি ও আইন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে; এতে মিডিয়ার স্বাধীনতা কিংবা মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং এ সংক্রান্ত যে সকল দ্বান্দ্বিক অবস্থান বা সংকট তৈরি হয় তা বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। বিষয়গুলো সংবাদক্ষেত্রের মানুষজনকে নতুন করে চিন্তার খোরাক জোগাবে। কোন পেশাই নীতিহীন হয়, আবার কোন কিছুই নীতির নিগড় শৃঙ্খলে আবদ্ধ নয়।

বইয়ের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে এর চতুর্থভাগ। সাংবাদিকতা একটি উচ্চমার্গের শৈলী। কৌশলগুলো যখন খুবই শৈল্পিক ও চাতুর্যের সঙ্গে ব্যবহার করা হয় তখন সংবাদমাধ্যমের পরিবেশনা এক একটি ফুল হয়ে ফোটে। কিন্তু শৈলী অর্জন প্রক্রিয়ায় অথবা শৈলীর ব্যবহারে যখন শৈথিল্য দেখা দেয় তখন সংবাদমাধ্যমের পরিবেশন কদর্য লাগে। সংবাদকর্মী কখনই শৈথিল্যকে প্রশ্রয় দেন না। কিন্তু প্রতিনিয়ত আমাদের ভ্রান্তি ঘটে যাচ্ছে এবং সেগুলো কেমনতরো হচ্ছে অথবা তার প্রতিকারে কী করা উচিত তার কিছু সুপারিশমূলক পরামর্শও দেয়া হয়েছে বইটিতে। সর্বোপরি বইটি সাংবাদিকতার একাডেমিক ও পেশাগত ক্ষেত্র এবং চিন্তার রাজ্যে এক ধরনের উপযোগিতা তৈরি করে দেবে।

www.pathagar.com

# সাংবাদিকতা

## নীতি শৈলী শৈথিল্য

www.pathagar.com

# সাংবাদিকতা

## নানা শৈলী শৈথিল্য

ড. সুধাংশু শেখর রায়

পলাশ প্রকাশনী

www.pathagar.com

# সাংবাদিকতা

## নীতি শৈলী শৈথিল্য

ড. সুধাংশু শেখর রায়

**স্বত্ব**

জয়শ্রী রায়

**প্রকাশকাল**

ফেব্রুয়ারি, ২০১২

**প্রচ্ছদ**

মোমিন উদ্দীন খালেদ

**প্রকাশক**

খান মাহবুব

পলল প্রকাশনী

৪৭ আজিজ সুপার মার্কেট

শাহবাগ, ঢাকা

ফোন : ৮৬২৪৩২৭

**মূল্য**

২৫০/- টাকা

ISBN: 978-984-603-240-6

www.pathagar.com

উৎসর্গ

**শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী রায়,** আমার মা

ও

**শ্রী হিমাদ্রী শেখর রায়,** আমার মেঝদা

যাঁরা আমায় মরনের পাড় থেকে জীবনে ফিরিয়ে আনতে তাঁদের জীবনের অনেকটা বড় অংশ 'স্যাক্‌রিফাইস' করেছিলেন—

এবং

**ডা. স্ট্যানলি জন,** ভেলোর হাসপাতালের হৃদ্‌যন্ত্রের শল্যচিকিৎসক

যিনি ৩১ বছর আগে আমাকে পুণর্জন্ম দিয়েছিলেন;—

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# প্রাক্‌কথন

পলল-এর প্রকাশক খান মাহবুব সাহেব বেশ ক'টি বছর ধরেই লেগেছিলেন যে তাঁর হাউজ থেকে আমাকে দিয়ে সাংবাদিকতার ওপর একটি রেফারেন্স বই বের করবেন। কেননা সাংবাদিকতার ওপর আমার লেখা বেশ কয়েকটি রেফারেন্স বই ইতোমধ্যেই একাডেমিক শিক্ষার্থী ও পেশাদারদের কাছে ভালোই সমাদৃত হয়েছে। কিন্তু তারপরেও আরেকখানা রেফারেন্স বই লেখার মতো আঁটঘাট বেধে বসার ধৈর্য্যে আমার খানিকটা ঘাটতি পরে গেছে। কারণ একাডেমিক কারণে বর্তমানে আমার লেখার ফোকাস হচ্ছে গবেষণাধর্মী কাজ। সঙ্গতই মাহবুব সাহেবকে পরামর্শ দিয়েছিলাম যে বিভিন্ন জায়গায় (সে পত্রিকার পাতায় হোক কিংবা গবেষণাধর্মী কোন জার্নালে) সাংবাদিকতার ওপর আমার কিছু লেখা নিয়ে একটা বই প্রকাশ করার। একটু দেরীতে হলেও মাহবুব সাহেব তাতে সারা দিয়েছেন এবং 'সাংবাদিকতা নীতি শৈলী শৈথিল্য' বইটি হচ্ছে সেই পরামর্শ, চিন্তা ও তাকে ধারণ করার ফসল।

যেহেতু এটি কাঠামোবদ্ধ রেফারেন্স বই নয়, সেহেতু লেখাগুলোর ক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট বিষয়ের দিক থেকে এক নয়। যদিও তার সবই সাংবাদিকতা বিষয়ক। ভিন্নধর্মী লেখাগুলো একসূত্রে ধারণ ও গ্রন্থিত করাও ছিল বেশ দুরূহ কাজ। আঙ্গিকের দিক থেকেও লেখাগুলোর সহাবস্থান এক নয়। স্টাইলের দিক থেকেও কয়েকটি লেখা একেবারেই গবেষণাধর্মী কিছু আধা-গবেষণাধর্মী, কিছু পুরোমাত্রায় একাডেমিক আর কিছু পপুলার। তারপরেও বৈচিত্র্যের মধ্যেও এক ধরনের ঐক্যের সুর সংযোজনের চেষ্টা করেছি। ভিন্নধর্মী হওয়ায় ও বিভিন্ন জায়গায় ছাপা হওয়ার কারণে লেখাগুলোর ভাষা ও ব্যাকরণ রীতিও ভিন্ন; আবার কতগুলো লেখা বিষয়ের কারণে একে অপরকে 'ওভারল্যাপও করেছে। তারপরেও বিষয়বৈচিত্র্যের নিরিখে লেখাগুলোকে চারটি ক্যাটেগরিতে ভাগ করে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। বইয়ের একটি চরিত্র ও ভার তৈরি করার জন্য নতুন করেও কয়েকটি লেখা এতে সংযোজিত হয়েছে। সব মিলিয়ে লেখাগুলোর মধ্যে সাংবাদিকতার ধারা-ধারণা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, কলা-কৌশল, আদর্শ ও নীতি-নৈতিকতা, বিষয়-ভাবনা, পরিবেশনা-কর্তব্য এবং শৈলী ও শৈথিল্য সব কিছুকে ধারণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সব লেখার মূল সুর যেটি, সেটি হলো- সাংবাদিকতা বৃত্তি ও কর্মের নীতিগত ভিত্তি, কর্তব্য ও অবস্থান। সাংবাদিকতা পেশার প্রতি দায়িত্বশীলতার দিক

www.pathagar.com

থেকে বিষয়গুলো তাই যদি সবার নজরে ও চিন্তায় আসে তবে তাই হবে এই গ্রন্থ রচনার সার্থকতা।

কতগুলো লেখা বেশ আগে লেখা হলেও সেগুলোর তাৎপর্য বর্তমানকে অনেকাংশে ধারণ করে আছে। কিছু লেখায় সঙ্গত কারণেই ইষৎ পরিমার্জন করা হয়েছে এবং প্রয়োজনে দু'টো একটা পাদটীকা দেয়া হয়েছে। তাই লেখাগুলো আগে পরে হলেও বর্তমান প্রেক্ষাপটে উপযোগী হবে বলেই বিশ্বাস করি। সাংবাদিকতার শিক্ষার্থী থেকে নীতিনির্ধারক সবার জন্যই বইটি উপকারে আসবে বলেও ধারণা করি।

বইটি রচনায় উদ্‌যোগ গ্রহণে বাধ্য করায় আমি মাহবুব সাহেবের কাছে যারপর নাই কৃতজ্ঞ। বইটির অক্ষর যোজনার স্নায়ুক্ষয়ী কাজটি করেছেন পললের মুদ্রাক্ষরিক নূরুন নবী রুবেল। তাঁর প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা। আর তাঁদের প্রতি আমার আগাম কৃতজ্ঞতা যাঁরা সব সময়ই আমার কাছ থেকে সাংবাদিকতার বই পাবার আকাঙ্ক্ষায় থাকেন।

বইটির যেকোন ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। প্রয়োজনীয় পরামর্শ দ্বিতীয় সংস্করণের সুযোগ পেলে তাতে পরিমার্জনের আশা রাখি। নতুন বছরের শুরুতে সবাইকে বিনম্র সম্ভাষণান্তে-

১ ফেব্রুয়ারি, ২০১২

**ড. সুধাংশু শেখর রায়**
সহকারী অধ্যাপক
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

# সূচিপত্র


**ক. সংবাদপত্র : ধারা, ধরন, ঐতিহ্য, ইতিহাস** **১১-৫৪**

নতুন ধারার সাংবাদিকতার সন্ধানে ১৩
(শৈলী, কৌশল ও বিষয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে)

ইতিহাসের পরিক্রমায় বাংলাদেশে এখন চলছে সমবায় সাংবাদিকতা ২৯

পত্রিকা প্রকাশ : প্রাকভাবনা ও সিদ্ধান্ত ৩৫

জাতীয় দৈনিকের মফস্বল পাতা ৪৩

**খ. টেলিভিশন : পরিবেশনা, প্রভাব** **৫৫-৭৬**

টিভি মাধ্যমের সামাজিক প্রভাব : প্রেক্ষিত নির্বাচন, '৯৬ ৫৭

টিভি সংবাদের পরিবেশনা : পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ ৬৭

**গ. নীতি ও আইন** **৭৭-১২৮**

মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও চলচ্চিত্র : আইনি পরিপ্রেক্ষিত ৭৯

সাংবাদিকতায় নীতির দ্বন্দ্ব ১০২

বন্যা, ত্রাণকাজে পলিথিনের ব্যবহার এবং গণমাধ্যমের ভূমিকা ১১১

সংবাদপত্র ও বিজ্ঞাপন : একের কী অপরের? ১১৫

মিডিয়ার স্বাধীনতা : নীতি ও আইনি দৃষ্টিতে ১২২

**ঘ. শৈলী ও শৈথিল্য** **১২৯-১৬০**

শিরোনাম নিয়ে শিরঃপীড়া ১৩১

চাই নির্ভুল, নির্মোহ, নির্মেদ সাংবাদিকতা ১৩৯

ভ্রান্তি আমায় ক্ষমা করো ১৪৪

নামে কী আসে যায় ১৫১

বাংলাদেশের বাংলা সংবাদপত্র : সাম্প্রতিক প্রবণতা ১৫৫
(ভাষা, বিষয় ও পরিবেশনায়)


www.pathagar.com

www.pathagar.com

# সংবাদপত্র :
# ধারা, ধরন, ঐতিহ্য, ইতিহাস

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# নতুনধারার সাংবাদিকতার সন্ধানে

## (শৈলী, কৌশল ও বিষয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে)

### পটভূমি

খ্রিষ্টপূর্ব সেই ৫০ সালের দিকে রোম সম্রাট জুলিয়াস সিজারের আমলে 'Acta-Diurna' নামে যে সাংবাদিকতার শুরু, দু হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় তার অবয়ব এখন বিশাল, বিস্তৃত ও বহুমাত্রিক। সে সময়েও জানার প্রয়োজন ছিল, জানানোর প্রয়োজন ছিল। কিন্তু কী জানতে চাই, কাকে জানাতে চাই, কোন্ বিষয়ে জানতে চাই বা জানাতে চাই আর সেই জানা ও জানানো কোন্ অবয়ব বা কাঠামোর মধ্য দিয়ে আসবে বা যাবে তার মধ্যেই সাংবাদিকতার স্বরূপটি নিহিত।

দু-দুটি হাজার বছরের সময়ের বর্তনীতে সংবাদ লেখার অনেক কায়দা আবিষ্কৃত হয়েছে। বারবার কায়দার পরিবর্তন-পরিমার্জন হয়েছে। যুগে যুগে বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নতি ও অনুপ্রবেশের ফলে সংবাদ লেখার বিষয়ের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে, লেখার কায়দায় পরিবর্তন এসেছে, উপস্থাপনা ও পরিবেশনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। পাশাপাশি সমাজ যতই আধুনিক হচ্ছে ততই জীবন-যন্ত্রণা, জটিলতা বাড়ছে, গ্লোবালাইজেশনের ক্ষেত্রটি বিস্তৃত হচ্ছে। এর ফলে গতানুগতিক সাধারণ ও গুটিকয়েক বিষয়ের মধ্যেই সাংবাদিকতার কর্মক্ষেত্রটি স্থিরীকৃত নয়। অর্থাৎ দু হাজার বছরের আগের যে রূপে সাংবাদিকতার শুরু তার চেহারা ও চৌহদ্দী এখন একেবারেই ভিন্ন। এই পরিবর্তন বা ভিন্নতা বিষয়ের ক্ষেত্রে, এই পরিবর্তন শৈলীর ক্ষেত্রে, এই পরিবর্তন কাঠামোর ক্ষেত্রে; এই পরিবর্তন উপস্থাপনার ক্ষেত্রে। কিন্তু মাঝখানে যে প্রশ্নটি বড় হয়ে দাঁড়ায় তা হলো সাংবাদিকতার শৈলী, কাঠামো বা বিষয়ের ক্ষেত্রে কী সত্যিই কোনো মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে অথবা নতুন কোনো ধারার সাংবাদিকতার সন্ধানে আমরা ছুটে চলেছি কিনা।



www.pathagar.com

## ঐতিহাসিক পটভূমি

একসময় পত্রিকার পাতায় সংবাদবিবরণীর মাথায় কোন শিরোনাম থাকতো না। সংবাদবিবরণীগুলো থেকে তাৎক্ষণিক তৃপ্তি, পাঠকের চাহিদা ও দাবি মোতাবেক তথ্য পাওয়া যেত না। পত্রিকার পাতা ছিল বইয়ের পাতার মতো ধূসর। যে কারণে শিরোনামের সৃষ্টি সেটা তখন ছিল না। এমনকি সংবাদবিবরণীটাও সুনির্দিষ্ট কাঠামো বা অবয়বে সাজানো থাকতো না কিংবা ভাষার ব্যবহার কিংবা উপস্থাপনের ক্ষেত্রেও লাগসই শৈলীর ব্যবহার তো দূরের কথা, উদ্ভবই হয়নি। কোন বিষয়ে জানানোটাই ছিল মুখ্য। কোন্ কাঠামো বা শৈলীতে জানাচ্ছি তার দিকে মনোনিবেশ ছিল না। কিন্তু ইতিহাস ও প্রযুক্তি সাংবাদিকতাবৃত্তির মানুষদের সংবাদবিবরণী কায়দা করে লিখতে বাধ্য করলো।

১৮৪৪ সালে Morse টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করার পর যোগাযোগে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। সাংবাদিকরা বড় বড় সংবাদবিবরণী টেলিগ্রাফে পাঠাতে শুরু করেন। সে সময় খবর লেখা হতো এলোমেলোভাবে। কিন্তু বিবরণী পাঠানোর সময় কখনো কখনো টেলিগ্রাফ বিকল হয়ে গেলে দেখা যেতো যে, খবরের মূল অংশ বা মূল কথাটাই পাঠানো হয়নি। বিষয়টি আরো প্রকট হয়ে ওঠে ১৮৬১ সালে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময়। সে সময় বিভিন্ন ঘটনার বিবরণী পাঠাতে গিয়ে যখন যান্ত্রিক অসুবিধার কারণে মূল কথা অনেক সময়ই বাদ পড়ে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই প্রথম সুযোগেই সংবাদের মূল কথাটি পাঠিয়ে দেয়ার প্রচলন শুরু হয়।

## লেখার কায়দা

এসোসিয়েটেড প্রেস (অব আমেরিকা) অর্থাৎ এপি সংবাদ-সূচনা লেখার প্রচলন শুরু করে। সূচনা লেখার জন্য 5w's and H বা ষড় 'ক' ফরমুলারও উদ্ভব হয়। ১৮৬৪ সালের ৯ জুন আব্রাহাম লিংকনের প্রেসিডেন্ট পদে দ্বিতীয়বার মনোনয়ন লাভের খবরটি পেতে নিউইয়র্ক টাইমসের পাঠকদের পত্রিকাটির কলাম ধরে ধরে খুঁজতে হয়েছিল। অথচ ১৯৭৬ সালের ১৫ জুলাই একই পত্রিকার পাঠকদের প্রেসিডেন্ট পদে জর্জিয়ার জিমি কার্টারের ডেমোক্র্যাটিক দলের মনোয়ন লাভের খবরটি পেতে একটুও দেরি হয়নি।[১] এর কারণ লিংকনের সময়ে সংবাদ কায়দা করে লেখা কেবল শুরু হয়েছে আর তার একশ বছর পর ষড় 'ক' ফরমুলা ও উল্টোপিরামিড কাঠামোয় খবর লেখা একেবারেই প্রচলিত বিষয়। নতুন অনেক কায়দা বা ফরমুলার উদ্ভব হলেও ষড় 'ক'-এর ছয়টি উপাদান 'কে, কি, কখন, কোথায়, কেন ও কীভাবে' দিয়ে সংবাদ সূচনা সাজানোর প্রয়াস চলছে এখন পর্যন্ত। এমনকি পত্রিকা স্ক্যান করলে দেখা যাবে বেশিরভাগ সংবাদবিবরণীর সূচনা এই ছয়টি উপাদানের সবকটি না হোক একাধিক উপাদান দিয়ে সাজানো হচ্ছে আর পুরো বিবরণী তৈরি হচ্ছে প্রধানত উল্টো পিরামিড কাঠামোয়।



www.pathagar.com

কিন্তু এর ব্যত্যয় ঘটতেও শুরু করেছে। পথিকৃৎ সাংবাদিক ও যোগাযোগ বিজ্ঞানী এবং এপি'র এক সময়ের উপদেষ্টা রুডলফ্ ফ্লেশ দাবি করেছিলেন যে, 'ঐতিহ্যগতভাবে কে-কি-কখন-কোথায় ও কেন শীর্ষ সেকেলে, জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।'[২] যদিও ষড় 'ক'-এর সবকটি উপাদান দিয়েই সংবাদ-সূচনা লিখতে হবে এমন বাধ্যবাধকতা নেই। স্পষ্টতই একটি বা দুটি 'ক' দিয়েও সংবাদ-সূচনা লেখা যায়, তার কলা-কৌশলও আমাদের জানা। তবে সেই কৌশলও মাঝে মাঝে উল্টো পিরামিড কাঠামো কিংবা অন্য একাধিক কাঠামোর আওতায় লেখা হচ্ছে।

সংবাদ-সূচনা ও কাঠামো নিয়ে নানারকমের গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, এখনো হচ্ছে। নতুন পুরনো মিলিয়ে মিশ্র ধরনের কৌশল ও কাঠামো উদ্ভাবন করে খুব সহজে মোক্ষম কথাগুলো বলা এবং পুরো সংবাদবিবরণীতে আগাগোড়া পাঠককে আটকে রাখার চেষ্টা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় আমরা শ্যাম্পেন গ্লাস কাঠামো, হুক কাঠামো, ডায়মন্ড কাঠামো, সেন্টিপিড কাঠামো, ক্রনলজিক্যাল কাঠামোসহ অনেক কাঠামো উদ্ভাবনা এবং সেই কাঠামো অনুসারে সংবাদ লেখার কায়দা দেখতে পাই। প্রচলিত উল্টো পিরামিড কাঠামো অনুসরণ করে কোনো সংবাদবিবরণী ঘটনার টুকরো টুকরো চিত্রকে গুরুত্বের ক্রমাবনতি (Descending order of importance) অনুসারে সাজানো যায়। কেবল সূচনা পড়েই পাঠক তৃপ্ত হয়ে অন্যত্র চলে যেতে পারেন। ভালো লাগলে আরো পড়তে পারেন। এটি হলো একটি দিক। অন্যদিকে পাঠককে শুরুতেই মোক্ষম বা মূল কথাটি জানিয়ে দেয়ার মানসেই এই কায়দা। কিন্তু ইলেকট্রনিক আবিষ্কারের কল্যাণে যখন অনেক ঘটনার মূল কথাটা আমরা আগেই জেনে যাচ্ছি তখন উল্টো পিরামিড কাঠামোর কায়দায় খবর লিখে ফায়দা কী? অপরদিকে এমনও প্রশ্ন উঠতে পারে, শুধুমাত্র মূল খবরটি সূচনায় দিয়ে বিরাট একটি পাঠকগ্রুপকে আগেভাগেই বিদায় করে লাভ কী? অন্য কোন কায়দা করে পাঠককে শেষ পর্যন্ত যদি ধরে রাখা যায় তাহলে পাঠের (Readability) দিক থেকে একটি পত্রিকা সফল। সেই মানসেই অন্যান্য কায়দার উদ্ভব। কিন্তু সেই বাকি কায়দাগুলো কোন কোনটা কোন জটিল ইভেন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, আবার কোন কোনটা সংশ্লিষ্ট পত্রিকার পাঠকরা কিভাবে নেবেন সেটাও গবেষণাসাপেক্ষ। তৃতীয়ত সেই কায়দাগুলো অনুসারে সংবাদবিবরণী লেখার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পত্রিকার সাংবাদিকরা কতখানি দক্ষ অথবা কত দ্রুত সেই কায়দাকে রপ্ত করতে পারেন।

## ভাষা শৈলী

কায়দা করে বলা কিংবা সুনির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে বিবরণী বলার বাইরে ভাষার ব্যবহারটিও খুব জরুরি। ১৬৪৪ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট মুদ্রণযন্ত্রের বিস্তার রোধের প্রয়াসে লাইসেন্স প্রথা আরোপ করে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে জন মিল্টন যে ফিরিস্তি পাঠিয়েছিলেন সেটাই ছিল সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পক্ষে লড়াইয়ের প্রথম দলিল- অ্যারিওপ্যাজিটিকা।



www.pathagar.com

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য মিল্টনের লড়াইয়ের পর পঞ্চাশটি বছর লেগেছিল ব্রিটেনে মুদ্রণসংক্রান্ত লাইসেন্স প্রথা রদের। ১৬৯৫ সালে এই ঘটনাটি প্রকৃত অর্থে সাংবাদিকতার পথিকৃৎদের কাজ করার ভিত্তি দিয়েছিল যাঁরা ততদিনে ভাষা-পণ্ডিত হিসেবে মর্যাদা পেয়ে গেছেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন 'রবিনসন ক্রুসো' খ্যাত ড্যানিয়েল ডিফো, 'গালিভার্স ট্রাভেল' খ্যাত জোনাথন সুইফট, স্যার রবার্ট স্টিল, জোসেফ এডিসন এবং ম্যাথু প্রায়র প্রমুখ। এঁরা তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের লেখালেখির মূল উদ্দেশ্য ছিল সাংবাদিকতা। লেখালেখির বিষয়ে বিশেষ করে সাংবাদিকতার জন্য ডিফো লিখেছেন :

If any man was to ask me what I would suppose to be a perfect style of language, I would answer, that which a man speaking to five hundered people of all common and various capacities, idiots or lunatics excepted, should be understood by them all.[৩]

তিনি সরল করে লেখার ক্ষেত্রে একটি বিরল বৈশিষ্ট্য এনেছিলেন এবং পাশাপাশি সেই সরল লেখাতেও গুরুত্বপূর্ণ খুঁটিনাটির কমতি থাকতো না। তাঁর সময়ে সাংবাদিকতার জন্য যা করণীয় ছিল তাই-ই তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি সে সময়ের দায়িত্বশীল পপুলার রিপোর্টিংয়ের প্রচলনও ঘটিয়েছেন, অনেক ইস্যুতেই তিনি সংলাপের ক্ষেত্র তৈরি করতেন। তাঁর লেখায় মানুষ ভীত হতো না, প্রভাবিত হতো। তার তুলনায় সুইফট ছিলেন ভিন্ন স্রোতের বাসিন্দা। ভাষা শৈলীতে তিনি খুবই প্রখর, কিন্তু ছিলেন ঘোরতর রাজনৈতিক বিষয়ক লেখক। কাউকে আক্রমণ করতে ছাড়তেন না।

রুডল্‌ফ ফ্লেশ সহজ করে বলা ও সহজ করে লেখার ওপর একটি তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি তাঁর পরীক্ষায় একটি বাক্যে কতগুলো শব্দ রয়েছে, কতগুলো Syllable রয়েছে অথবা বাক্য খুব জটিল কিনা ইত্যাদি পরিমাপের একটি স্কেল তৈরি করেছিলেন। এখন তো বিদেশে এক বাক্যে এক প্যারা তৈরির প্রচলন হয়েছে। আমাদের দেশের সংবাদপত্র মালিকরা এটা করতে গিয়ে পত্রিকার স্পেস ছাড়তে রাজি নয়। অবশ্য ১৯৯৫ সালের দিকে নিউজপ্রিন্ট সংকটের সময় স্পেস বাঁচাতে বাংলাদেশের সাংবাদিকরা কথোপকথনের ভঙ্গিতে সহজ ভাষায় সহজ কথায় সংবাদবিবরণী লেখায় হাত প্রায় পাকিয়ে ফেলেছিলেন। আমরা আগেই বলেছি ইতিহাস ও প্রযুক্তি সাংবাদিকতার গতিপ্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। টেলিগ্রাফ আবিষ্কার যেমন সংবাদের মূল কথাটি প্রথম সুযোগেই জানিয়ে দেয়ার তাগিদটি তৈরি করেছিল তেমনি তারপর আরো বিভিন্ন কলা-কৌশল আবিষ্কার হয়েছে। একপর্যায়ে সাংবাদিকতার সঙ্গে নীতির প্রশ্নটিও যুক্ত হয়েছে। মুঘল কিংবা ইংরেজদের সময় কিংবা তার আগে বা পরে যে সাংবাদিকতার অনুশীলন হয়েছে সেখানে অনেকাংশেই নীতির বালাই ছিল না। কদর্যতা অশালীনতাসহ অনেক কিছুই ছিল। সার্বিক প্রেক্ষাপটে সংবাদপত্রকে একদিকে যেমন সরকারি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা হয়েছে, তেমনি একে একটি শৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে আসারও



www.pathagar.com

চেষ্টা হয়েছে। এই পথ ধরেই তৈরি হয়েছে অনেক সংবাদপত্র আইন, প্রণীত হয়েছে নীতি। পরামর্শ এসেছে সৎ সাংবাদিকতার। এই প্রক্রিয়ায় এসেছে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার কথা। বস্তুনিষ্ঠতা কোনো শৈলী নয়, কৌশলও নয়—এমনকি বিষয়ও নয়। Objectivity is not a technique, it. is an attitude.[৪] বস্তুনিষ্ঠতা একটি আচরণের ব্যাপার, একটি বোধের ব্যাপার। গত শতাব্দীর প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবাদে বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখার চেষ্টা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মার্কিন সাংবাদিকতার অন্যতম ঐশ্বর্যই হচ্ছে বস্তুনিষ্ঠতা। The American Society of Newspaper Editors in its 1926 code of ethics asserted that partisanship in the news columns must be looked on as 'subversive of a fundamental principle of the profesion'.[৫]

আমাদের এ অঞ্চলেও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতার কথাটি জোরে শোনা যায়। এই নীতি মেনে চলার জন্য অহরহ পরামর্শ দেয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্রের এই নীতির ওপর ভিত্তি করে দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা হয়েছে, চর্চা হয়েছে। কিন্তু সেখানেও একপর্যায়ে একে বাজে কথা বা বাগাড়ম্বর বলে অভিহিত করা হয়েছে। ভিয়েতনাম যুদ্ধ কভার করার জন্য পুলিৎজার পুরস্কারপ্রাপ্ত ডেভিড হ্যালবারস্টাম ১৯৭৬ সালে বলেছেন, Objectivity is bullshit.[৬] অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠতা হচ্ছে বাগাড়ম্বর।

১৯৬০-৭০-এর দশকের সাড়া জাগানো নতুন ধারার সাংবাদিকতার একটি পত্রিকা San Francisco Bay Guardian-এর রাগী সম্পাদক ব্রুস ব্রাগম্যান বলেছিলেন, I tell every reporter I don't want to see objective reporting।[৭] অপরদিকে Texas Observer-এর সাংবাদিক মলি ইভান্স বলেছেন, Objectivity is getting the facts straight and letting the truth go hang '[৮] এঁদের ধারণায় বস্তুনিষ্ট রিপোর্টিং মানে হচ্ছে যে ঘটনাটা যেভাবে ঘটেছে সেইভাবেই তুলে ধরা। কিন্তু একজন ভালো রিপোর্টার অবশ্যই ঘটনার পটভূমি ও দৃশ্যমান সব তথ্য তুলে ধরবেন। কোন রিপোর্ট যদি ভারসাম্যপূর্ণ (Balanced) ও সবতথ্য সম্বলিত (Complete information) করে যুতসই প্রেক্ষাপটে (appropriate context) তুলে ধরা না হয় তাহলে পুরনো ধারার বস্তুনিষ্ঠতা শুধুমাত্র সংশয়ই বাড়ায়।

ওপরের এই চিন্তা থেকেই সাংবাদিকতায় বস্তুনিষ্ঠতার পথ থেকে সরে এসে ডেপথ রিপোর্টিংয়ের পথে হাঁটা শুরু। যাঁরা এই ধারার সাংবাদিকতার কথা বলেছেন, তাঁদের মতে বেশিরভাগ সংবাদই থাকে সাদা চোখের আড়ালে। Depth reporting-এর দুটি ধারা- ব্যাখ্যামূলক ও অনুসন্ধানী রিপোর্টিং। সাংবাদিকতা জগতের আরেক পথিকৃৎ ওয়াল্টার লিপম্যান ব্যাখ্যামূলক সংবাদের বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, দিন যত বদলাচ্ছে আধুনিক সমাজ ততই বেশি জটিল হয়ে



www.pathagar.com

উঠছে। আমাদের নানামাত্রিক জটিলতা ও অস্পষ্টতায় পাঠককে শুধুমাত্র একটি ঘটনার উপরিতলের (surface) তথ্য দিলে চলে না। ঘটনাটি কেন ঘটলো, কিভাবে ঘটলো এর ব্যাখ্যা দিতে হবে। ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অস্পষ্ট ও জটিল দিকগুলো ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে। আর কোন ঘটনাই বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, একটি ঘটনা আরেকটি ঘটনারই অংশ মাত্র। অর্থাৎ একটি ঘটনার সঙ্গে একটি পটভূমি বা প্রেক্ষাপট বা প্রচ্ছন্ন দিক থাকে। তাকেও তুলে ধরতে হবে। ব্যাখ্যামূলক এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই একে Reporting in context বলা হয়ে থাকে। আর উইসকিনসন স্কুল অব জার্নালিজম এন্ড ম্যাস কমিউনিকেশনের পরিচালক হ্যারল্ড এল নেলসন এই ধারার সাংবাদিকতাকে অভিহিত করেছিলেন 'Journalism of cause and effect'[৯] হিসেবে। অর্থাৎ সব ঘটনারই সঙ্গেই অতীত ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক রয়েছে। আর এ কারণেই objective ধারার সংবাদ বিবরণীতে 'কে, কি, কখন ও কোথায়' থেকে রিপোর্টার পাঠককূলকে 'কেন ও কিভাবে'র বৃহত্তর পরিমণ্ডলে নিয়ে যায়। রিপোর্টার 'কেন ও কিভাবে'র ওপর আলোকপাত করেন বলেই সমালোচনা ওঠে-এ হচ্ছে বস্তুনিষ্ঠতার পরিপন্থি। ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং হচ্ছে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদির উপস্থাপন। সেই তথ্য হতে পারে বস্তুনিষ্ঠ অর্থাৎ সকলের কাছে দৃশ্যমান বা স্পষ্ট তথ্য কিংবা প্রাসঙ্গিক মন্তব্য অথবা মন্তব্য করার যোগ্যতা রাখেন এমন বিশেষজ্ঞ সূত্রের মন্তব্য। আর এসব কিছুই পাঠককে চলতি ঘটনাটি বুঝতে সাহায্য করে। ব্যাখ্যামূলক সংবাদ কাউকে প্রভাবিত করে না বা করতে চায় না বরং কোন বিষয়কে আলোকিত করে। এই ধারার রিপোর্টিং পাঠককে চিন্তা করতে সাহায্য করে না বরং ঘটনার পারিপার্শ্বিকতা ও জ্ঞান তাকে তার মতো করে মতামত তৈরি করে নিতে সাহায্য করে। আর এ কারণেই এ ধারার সাংবাদিকতাকে What the news means, অথবা news analysis কিংবা News background হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আমাদের দেশেও সংবাদ বিশ্লেষণ হয়। কিন্তু যখন প্রথম পাতায় বলা হয় 'মন্তব্য প্রতিবেদন' তখন তা-না পড়ে সাংবাদিকতা বিষয়ক নীতির আওতায়, না পড়ে সম্পাদকীয়'র ঘরে, কিংবা না পড়ে সংবাদ বিশ্লেষণের ঘরেও। 'মন্তব্য প্রতিবেদন' আমাদের সাংবাদিকতার ভাণ্ডারে একটি নতুন প্রত্যয় (term); কিন্তু তাকে প্রতিষ্ঠা দেয়ার জন্য যথেষ্ট যুক্তি এখনো খাড়া হয়নি, যদিও তর্ক রয়েছে অনেক। ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং কুড়ি শতকের সাংবাদিকতার এক বড় অবদান। এ ধারায় সাংবাদিকতার দুটো কৌশল হচ্ছে সংবাদ সাক্ষাৎকার (News Interview) ও পটভূমিকা (Background)। এ ধারার সাংবাদিকতার রিপোর্টারগণের কেউ কেউ এমন বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন যা তাঁদেরকে তাঁদের রিপোর্টে মতামত সম্মিলিত করার যোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা দেয়।

গত কয়েক দশকে এ ধারার সাংবাদিকতা বেশ প্রবল, তবে এর চর্চা গত শতাব্দীর তিরিশের দশকে। ১৯২৯-এ যে অর্থনৈতিক মহামন্দা শুরু তার জের চলেছিল দশ



www.pathagar.com

বছর ধরে। সে সময় এই ইস্যুটির ওপর সৃষ্ট বিভিন্ন সংশয় সম্পর্কিত সাধারণ ঘটনার খবরে পাঠক তুষ্ট হচ্ছিল না। সাংবাদিকদের মাঝেও একটা দায়বোধের সৃষ্টি হচ্ছিল যে, জনগণকে প্রকৃত তথ্য ও ভবিতব্য সম্পর্কে জানানো উচিত। এরই ধারাবাহিকতায় The New York Times, Christian Science Monitor প্রভৃতি পত্রিকা ব্যাখ্যার প্রচলন শুরু করে।

অপরদিকে গত শতাব্দীতে মার্কিন সাংবাদিকতার আরেকটি ক্যাচওয়ার্ড হচ্ছে Investigative reporting। কার্ল বার্নস্টাইন ও বব উডওয়ার্ড ওয়াটারগেট কেলেংকারী নিয়ে যে রিপোর্ট করেছিলেন তা বিশ্ববাসীকে নতুন ধারার আরেকটি সাংবাদিকতা বৃত্তির দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট করেছিল। যদিও ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় যে উনিশ শতকের তিরিশের দশকেও এ ধরনের সাংবাদিকতা হয়েছে। এমনকি গত শতাব্দীর শুরুতেও পুলিৎজার অপরাধ, তছরুপ, অসামাজিক কার্যকলাপ নিয়ে অনুসন্ধানী রিপোর্টিং করেছেন। বস্তুত তিনি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার স্বীকৃতিস্বরূপ সাংবাদিকদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থাও করে গেছেন। অর্থাৎ এ ধরনের সাংবাদিকতা নতুন নয়। কিন্তু ওয়াটারগেট কেলেংকারীর ঘটনা নিয়ে অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের ঘটনাটি সাংবাদিকতা জগতে একটি নতুন দিকমাত্রা নিয়ে আবির্ভূত হয়। ফলে তখন থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে সাংবাদিকরা অনুসন্ধানী রিপোর্টিং করার জন্য সদাই ব্যস্ত। ওয়াটারগেট ঘটনার পর একই মাত্রায় অসংখ্য অনুসন্ধানী রিপোর্টিং হওয়ায় সেই প্রেক্ষাপটকে অনেকে 'Post-watergate syndrome' আখ্যায়িত করেছেন। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় সত্য উদঘাটন করার ধরন-ধারণ একটু চমকপ্রদ হওয়ায় একে অনেক মার্কিনী ভোজবাজী সাংবাদিকতা বা 'Jugular journalism'[১০] বলতে ছাড়েন না।

ডেপথ্ রিপোর্টিংয়ের একটি ধারা হচ্ছে ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং—যেখানে আজকের ঘটনাকে গতকালের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে আগামীকাল সম্পর্কে একটা দিকনির্দেশ দেয়া হয়। এ সম্পর্কে ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিংয়ের একজন বিশেষজ্ঞ Roscoe Drummond-এর খুবই জনপ্রিয় বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'Setting todays event against yesterdays background to give tomorrows meaning' অন্যদিকে অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের প্রধান উদ্দেশ্য হলো উদঘাটন করা। অর্থাৎ অপরাধ, যৌনতা, দুর্নীতি, শৈথিল্য ও কেলেংকারীর তথ্য উন্মোচন করা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সামাজিক কর্মে (Social action) প্রবৃত্ত হতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা। সেটাকে অন্য অর্থে ক্রুসেডের সঙ্গেও তুলনা করা যায়। ব্যাখ্যামূলক কিংবা অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা হচ্ছে সাংবাদিকতার একটি কৌশলগত দিক। বিষয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে নতুন কোন কিছু নয়। তবে অনুসন্ধানী রিপোর্টিং করার জন্য নতুন কোন কৌশলের দরকার নেই। রিপোর্টিং করার জন্য দিনকে দিন যে প্রস্তুতি দরকার তা কোন পদ্ধতির মধ্যে নয় বরং যে পরিবেশের মধ্যে কাজটি হচ্ছে তার মধ্যেই এটি নিহিত।



www.pathagar.com

## বিষয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে

বিষয়ের দিক থেকে যে সাংবাদিকতা আমাদের মাথায় প্রথম আসে সেটি হলো হলুদ সাংবাদিকতা। হলুদ সাংবাদিকতা বা Yellow Journalism চাঞ্চল্যকর সাংবাদিকতা অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পত্রিকার প্রচারসংখ্যা বাড়ানোর জন্য এই ধরনের সাংবাদিকতায় অহেতুক চাঞ্চল্য সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়। অকারণ চমক সৃষ্টি ও সেই সঙ্গে অলীক এবং ভিত্তিহীন খবর প্রকাশ করাকে লোকে Yellow Journalism বলে থাকে।

কিন্তু যে নিন্দনীয় অর্থে 'হলুদ সাংবাদিকতা' কথাটি আজ পরিচিত তার উদ্ভব হয়েছিল ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। উনিশ শতকের শেষদিকে সাংবাদিকতার দুই পথিকৃৎ জোসেফ পুলিৎজার ও রুডলফ্ হার্স্ট তাঁদের দুটি পত্রিকায় yellow kid নামে হলদে রঙের কার্টুন কিড ছাপাতেন। সেটা ভালো দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু তাদের দুজনের মূল বিরোধ ছিল অন্যখানে। অযথা চাঞ্চল্য সৃষ্টি, গসিপ ও কেলেংকারী, পারস্পরিক রেষারেষি তৈরি করে সংবাদবিবরণীগুলোকে আরো উপজীব্য করে তোলাই ছিল তাঁদের কাজ। খুনোখুনি হয়েছে পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে। সেই থেকেই চাঞ্চল্যকর সাংবাদিকতা Yellow Journalism বলে পরিচিত। তবে এটা মনে করার কোন কারণ নেই যে, চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পারে এমন সহজাত ঘটনা সৎ সাংবাদিকতার আওতায় পড়ে না। বড় সংবাদ সব সময়ই চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে থাকে। হলুদ সাংবাদিকতাকে প্রধানত বিষয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও শৈলী ও ভাষাগত উপস্থাপনের দিকটি অবশ্যই উপেক্ষনীয় নয়। কারণ চাঞ্চল্যকর নয়, কিন্তু তারপরেও তাকে চাঞ্চল্যকর হিসেবে তুলে ধরে তা ভোক্তার কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য তথ্যের সত্যাতীত উপস্থাপন এবং চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে এমন সব শব্দ প্রক্ষেপণ ও বাক্যের ব্যবহারের দিকটিও আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

পুলিৎজার ও হার্স্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করার প্রয়াস পেয়েছেন যে ধরনের পত্রিকায় তার সফল প্রয়োগ হয়েছে ট্যাবলয়েড পত্রিকায়। যে পত্রিকাগুলো নির্ভেজাল পপুলার হিসেবেও পরিচিতি। তবে 'সান', 'মিরর'-এর মতো ট্যাবলয়েড পত্রিকা যে ভূমিকা পালন করে থাকে তা আমাদের দেশের ট্যাবলয়েডগুলো করে না। বরং উল্টোপথে আমাদের দেশের মূলস্রোতের অনেক পত্রিকাও মাঝেমাঝে ট্যাবলয়েড পত্রিকার মতো আচরণ করে থাকে। তবে এমনটি মনে করার কোন কারণ নেই যে, ট্যাবলয়েড পত্রিকাগুলোই কেবল ইয়েলো জার্নালিজম করে থাকে। আমাদের দেশে পত্রপত্রিকাগুলো, সে ব্রডশিটই হোক অথবা ট্যাবলয়েড, সাধারণত জেনেশুনে অথবা খুব সচেতনভাবে এটি করে থাকে এমন নয়। কারণ এর পরিণামকে রোখার মতো অন্তরশক্তি পত্রিকাগুলোর নেই। কিন্তু এর বিপ্রতীপে অসংখ্য পত্রিকা এমন সব সংবাদবিবরণী ছাপছে যেগুলোকে অবলীলায় ইয়েলো জার্নালিজমের আওতায়



www.pathagar.com

ফেলা যায়, কিন্তু সংশ্লিষ্ট পাঠককূলের তা গায়ে না মাখানোর প্রবণতা তৈরি হয়েছে।

**ষাটের দশকের নব্য সাংবাদিকতা**

আমরা আগেই বলেছি যে, গত শতাব্দীর ষাটের দশকে নতুন মাত্রার একটি সাংবাদিকতার উদ্ভব ঘটে এবং অবশ্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। কী শৈলী বা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে অথবা বিষয়ের ক্ষেত্রে এ সত্যিকারেই ছিল নতুন। সাংবাদিকতার মূল স্রোতের বাইরে থেকে তার উদ্ভব, বিকল্প ধারা যার নাম। এই নয়া ধারা নিয়ে যাঁরা হাজির হলেন তাঁদের মধ্যে পথিকৃৎ ছিলেন গে টেলেসি, টম উল্‌ফ, নরমান মেলার, রিচার্ড গোল্ডেনস্টাইন প্রমুখ। তাঁরা সংবাদের চিরাচরিত নির্মেদ অবয়বকে ঝেড়ে ফেলে উপন্যাসের স্টাইলে, কল্পকথার স্টাইলে তা পরিবেশন করতে শুরু করেন। তাঁরা সংবাদ ঘটনার বর্ণনাময় পরিবেশ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের খুঁটিনাটি নিখুঁতভাবে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন।

গে টেলেসি'র বয়ানে নব্যসাংবাদিকতার সংজ্ঞা হল :

The new journalism, through often reading like fiction is not fiction. It is, or should be, as reliable as the most reliable reportage although it seeks a larger truth than is possible through the mere compilation of verifiable facts, the use of direct quotations, and adherence to the rigid organizational style of the older form. The new journalism allows demands in fact a more imaginative approach to reporting and it permits the writer to inject himself into the narrative if wishes....[১১]

এই ধারার সাংবাদিকরা ছিলেন প্রকৃত অর্থে সাহিত্যিক। পত্রিকায় তাঁদের রচনাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে উপন্যাস যা সাংবাদিকতা বৃত্তির এক একটি দলিল। এই বিকল্প ধারার সাংবাদিকতার আশ্রয়ে ও প্রশ্রয়ে কিছু আন্ডারগ্রাউন্ড প্রেসও গড়ে উঠতে থাকে যাদের পত্রিকা প্রকাশের পুঁজি আসতো তৃতীয় উৎস থেকে। এই ধারার সাংবাদিকতার মুদ্রণ প্রযুক্তিও ছিল ভিন্ন। নব্য সাংবাদিকরা যখন বেশ ঝড় তুলেছেন তখন ষাটের দশকের মাঝামাঝি আর একদল সাংবাদিক এঁদের সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন Dwight Macdonald. তিনি বলেছেন :

নব্য সাংবাদিকতা হল Para journalism..., এটি সাংবাদিকতার জারজ রূপ। সাংবাদিকতার তথ্যের ওপর নির্ভর করে ওরা উপন্যাসের কল্পনার অবাধ সুবিধা গ্রহণ করে থাকেন।[১২] এই ধারার সাংবাদিকদের দাবিটা ছিল- এই সাংবাদিকতা fiction-ধর্মী কিন্তু fictitious নয়।



www.pathagar.com

সে সময়টা ছিল এক সংঘাতময় সমস্যাসঙ্কুল অস্থির সময়। ভিয়েতনাম যুদ্ধের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে সমাজে। চলছে ছাত্র অসন্তোষ, বর্ণবৈষম্যের নগ্ন চেহারাটা আরো স্পষ্ট, ঘটেছে দুই কেনেডির হত্যা। তৈরি হয়েছে রক্ (Rock) সংস্কৃতি। রাগী যুবকেরা বিপ্লবের চেতনায় শানিত। নারী স্বাধীনতার ধারণাটি আন্দোলনে রূপান্তরিত হচ্ছে। পাশাপাশি চন্দ্র বিজয়ের মতো ভিন্নধর্মী ঘটনাও ঘটছে। এই একটি মিশ্র সমসাময়িক বিষয় নিয়ে নব্য সাংবাদিকরা লিখতে থাকেন রিপোর্ট-গল্পের মতো করে, উপন্যাসের ঢঙে। বিবরণীর দৈর্ঘ্য বিশাল আর ভাষা স্পষ্টতই সাহিত্যের। স্বভাবতই তাঁদের লেখা সাংবাদিকতার বহুল চর্চিত শব্দ 'বস্তুনিষ্ঠতা'র বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল না। তাঁরা মন্ময় (Subjective) দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো বিষয়কে দেখতে ও বিচার করতে চেয়েছেন।

নব্য সাংবাদিকতা কালের বিচারে তেমন জনপ্রিয়তা পায়নি। বিকল্প ধারার এই সাংবাদিকতা বিকল্পই থেকে গেছে। কখনই মূলস্রোত হয়নি। এর অন্যতম কারণ, নব্য ধারার সংবাদ প্রতিবেদনগুলো ছিল দীর্ঘ। পত্রিকার পাঠকের তা পড়ার অতো সময় নেই। আর প্রতিবেদনে মন্ময়তার আধিক্য মনস্তাত্ত্বিক কারণেই বেশিরভাগ পাঠক গ্রহণ করে না। আর অনেক পাঠকই মূল খবরটা জানতে চায়, বাহানা নয়। কিন্তু তারপরেও বাংলাদেশের সাংবাদিকতায় সাম্প্রতিক সময়ে নব্য সাংবাদিকতার প্রভাব পড়েছে। যে ধারা যুক্তরাষ্ট্রে ষাটের দশকে শুরু হয়ে বলতে গেলে সে দশকেই শেষ হয়ে গেছে তা বাংলাদেশে বিশেষ করে বাংলা সাংবাদিকতায় প্রভাব ফেলতে শুরু করে নব্বই'র দশকের প্রথম দিকে। 'আজকের কাগজ' ও 'ভোরের কাগজ' তার পথিকৃৎ। এদের ধারার উত্তরাধিকার প্রথম আলো, যুগান্তর প্রভৃতি। তবে যে আশা জাগিয়ে শুরু হয়েছিল তার তেজ স্তিমিত হয়ে গেছে অনেক আগেই। ষাটের দশকে মার্কিন সমাজে যে তারুণ্য প্রভাব ফেলেছিল নব্বই'র দশকে বাংলাদেশের সাংবাদিকতায় সেরকমই একটি তারুণ্যে ভরপুর প্রাণস্পন্দন দেখা গিয়েছিল। তার এখন অনেকটা ভাটা পড়েছে। তবে এখনো এই ধারায় যা কিছু হচ্ছে তা অনেকাংশেই গল্প, কোনো কোনো সময় তা গল্পের অতীত। যেখানে তথ্যের চেয়ে Fiction অনেক বেশি Dominant হয়ে ওঠে।

## উন্নয়ন সাংবাদিকতা

নব্য সাংবাদিকতার ঢেউ স্তিমিত হয়ে আসার পরপরই আরেকটি সাংবাদিকতা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জায়গা দখল করে নিয়েছে। এর নাম উন্নয়ন সাংবাদিকতা। এই সাংবাদিকতা যতটা না উপস্থাপনা বা পরিবেশনের দৃষ্টিকোণ থেকে তার থেকে বেশি বিষয়ের দিক থেকে।

নতুন শতাব্দীর সূচনায় এসে সাংবাদিকতায় নতুন প্রযুক্তির স্পর্শ লাগায় এখন পরিবেশনের ক্ষেত্রে যেমন একটা পরিবর্তন হয়েছে তেমনি বিষয়ও হয়েছে বহুবিচিত্র। ইতোমধ্যে নতুন প্রজন্মের পাঠকও তৈরি হয়ে গেছে। ফলে পরিবেশন পদ্ধতি ও কৌশলে তো অবশ্যই অনেকটাই পরিবর্তন হয়েছে, তবে বিষয় নির্বাচন



www.pathagar.com

এখন খুবই লক্ষণীয়। কিন্তু দু' কিংবা আড়াই দশক আগেও বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলো সাংবাদিকতায় তেমন প্রযুক্তিনির্ভর ছিল না, তেমনি সংবাদপত্রে পরিবেশিত উপাদানও (reading material) জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করেনি। তখন অভিযোগ উঠতো পত্রিকার পাতায় চাঞ্চল্যকর ঘটনা, অপরাধ, হত্যা, যৌনতা এবং যা খবর হবার নয় তাকে খবর হিসেবে বানিয়ে উপস্থাপন করা হচ্ছে; কিন্তু দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কথা, তাদের সাফল্য, ব্যর্থতা, সংগ্রামের কথা উঠে আসছে না, তাদের জীবনে বেঁচে থাকার কৌশল, পন্থা, পদ্ধতির কথা উঠে আসছে না। তখন পরামর্শ এলো, সংবাদ ও লেখা এমনভাবে পরিবেশন করা হোক যাতে দেশের মধ্যে উন্নয়ন কাজে অংশ নিতে দেশবাসী উদ্বুদ্ধ হবে। উন্নয়ন কাজে প্রযুক্তি হস্তান্তরের বিষয়টিকে সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানানোর ব্যবস্থা হোক। এরই নাম উন্নয়ন সাংবাদিকতা।

উন্নয়ন সাংবাদিকতা এখন বাংলাদেশে একটি বহুল প্রচারিত ও অনুশীলনকৃত নাম। উন্নয়ন সাংবাদিকতায় চাঞ্চল্য নেই, আলোড়ন নেই, উত্তেজনা নেই। কিন্তু প্রচলিত যে সাংবাদিকতা তাতে নেতিবাচক বিষয়ই বেশি প্রাধান্য পায়। যেখানে Bad news is always good news ধারণাটি স্বতঃসিদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে তখন উন্নয়ন সাংবাদিকতার ধারণাটি প্রবল হলো। বলার চেষ্ট হলো সংবাদপত্রের প্রধান উপজীব্য রাজনীতি ও সরকার বিরোধিতার বাইরে সাধারণ জনগণের সংগ্রাম-সাফল্য গাঁথাকে ইতিবাচক ও প্রচারের ঢঙে চিত্তাকর্ষকভাবে পরিবেশন করা যায়। এজন্যেই একে কেউ কেউ অভিহিত করেছেন Positive Journalism হিসেবে। এ সাংবাদিকতায় জনগণের হাজারো সমস্যার সমাধানসূত্র থাকে বলে একে Solution Journalismও বলা হয়। একে এনজিও জার্নালিজমও বলা হয়, কারণ সাধারণ জনগণের সংগ্রামে তারা সরাসরি সম্পৃক্ত এবং তারা এই ধরনের সাংবাদিকতার জন্য লভ্য বিশাল তথ্যের সংগ্রাহক ও সরবরাহকারী এবং ক্ষেত্র প্রস্তুতকারী। ফিলিপাইনের ম্যানিলাভিত্তিক এই সাংবাদিকতার উপাদান তিনটি এবং তাতে স্পষ্ট এ ধরনের সাংবাদিকতার স্বরূপটি। উপাদান তিনটি হচ্ছে : এক. উদ্ভাবন, দুই. উদ্দেশ্য এবং তিন. রূপায়ণ বা যোগাযোগ। অর্থাৎ এ ধরনের সাংবাদিকতায় নতুন চিন্তা বা নতুন দ্রব্য উদ্ভাবনের প্রশ্ন জড়িত এবং একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে তাকে জনগণের সামনে তুলে ধরা বা প্রচার করা। এ ধরনের সাংবাদিকতা অনেকটা ফিচারধর্মী ও দীর্ঘ। প্রচলিত শৈলী ও পরিবেশন পদ্ধতির দিক থেকে খুব বেশি ভিন্নধারার নয়, তবে বিষয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে অপেক্ষাকৃত নতুন। ফলে উন্নয়নের সঙ্গে পরিবেশ, গণতন্ত্র, সুশাসন, অধিকারসহ বহু বিষয় এই ধারার সাংবাদিকতায় নতুন নতুন প্রাঙ্গণ (Avenue) হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। আমরা নব্য সাংবাদিকতা ও উন্নয়ন সাংবাদিকতার কথা বলেছি যার মূল উদ্দেশ্যটা হচ্ছে প্রচার। এই প্রচারধর্মী সাংবাদিকতার আরেকটি মাত্রার নাম Advocacy Journalism-যার বাংলা কেউ কেউ করেছেন ওকালতি সাংবাদিকতা। তবে ওকালতি কথাটার মধ্য দিয়ে Advocacy কথাটার প্রকৃত অর্থের ইতর মূল্যায়ন করা হয়। এটাও প্রচারধর্মী সাংবাদিকতা তবে তার চর্চার ক্ষেত্র হচ্ছে সামাজিক ইস্যুগুলো।



www.pathagar.com

এ সময়ের নতুন শ্রোতার জন্য এডভোকেসি জার্নালিজম নতুন মনে হতে পারে। ডিফো-সুইফট্‌রা যে কাজ করেছেন তা এডভোকেসি জার্নালিজমের একটি সুপ্ত ধারা। এটাকে স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের সময়। ১৮১৮ সালে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের মালিকানাধীন প্রথম ভারতীয় পত্রিকা 'বাঙ্গাল গেজেটী' প্রকাশিত হবার পর থেকে ভারতীয়রা বিশেষ করে বাঙালিরা সংবাদপত্রে নিবিড়ভাবে অংশগ্রহণ করতে থাকে। সে সময়ই সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারের প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে। সংবাদপত্রগুলো যেহেতু এই দুটো বিষয় নিয়ে ভূমিকা নিতে শুরু করেছে ফলে চারপাশে তর্কবিতর্ক ও উত্তপ্ত ঝড় বইতে শুরু করে। এরকমই টালমাটাল ও ঝড়ো পরিবেশের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের সামাজিক সংস্কার আন্দোলন সংবাদপত্র জগতে নতুন উন্মাদনার সৃষ্টি করে। বহু যুগের সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধকে কাটিয়ে প্রগতিবাদী বুর্জোয়াবোধের সৃষ্টি করে রাজা রামমোহন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখের ব্যাপক সংস্কার আন্দোলনের মুখে সে সময়ে ব্রিটিশরাজ বাল্যবিবাহ, সতীদাহ প্রথার মতো অনৈতিক প্রথা বন্ধ করে দেয়। সমাজে যুগোপযোগী, আধুনিক ও বিজ্ঞানমনস্ক ও ইংরেজি লেখাপড়া শুরু হয়। এই সমাজ সংস্কারকদের আন্দোলনের মুখেই তৎকালীন সামন্ততান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা ভেঙে যায় এবং তার জায়গায় বুর্জোয়া চিন্তাধারা শেকড় গাড়তে শুরু করে। আর এর সবটাই প্রকৃতপক্ষে সংবাদপত্রের দান। সংস্কার আন্দোলনকে সংবাদপত্রের মাধ্যমে তুলে ধরার বিষয়টিই এডভোকেসি বা ওকালতি সাংবাদিকতা।

এডভোকেসি সাংবাদিকতা হচ্ছে প্রচারধর্মী সাংবাদিকতা। এ ধারার সাংবাদিকতার অনুসারীরা সমাজের কোন সংস্কারযোগ্য মূল বিচার্য বিষয় বা ইস্যুকে খোলাখুলি সমর্থন করেন এবং তার সমর্থনে ব্যাপক ও জোরালো যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। এই ধরনের সাংবাদিকতায় সাদা চোখের বস্তুনিষ্ঠতা মানা হয় না। অনেকটাই মনুয় ঢঙে বলার চেষ্ট হয়। কিন্তু তথ্যগত ভ্রান্তি ও বিকৃতি দিয়ে লেখা হয় না। এ ধরনের সাংবাদিকতায় যতটা বেশি রিপোর্টিং তার থেকে বেশি জোরালো সম্পাদকীয়, সংবাদ বিশ্লেষণ, কলাম। তবে তা আজকের জমানার মন্তব্য প্রতিবেদন নয়। প্রতিবেদন এক জিনিস আর মন্তব্য আরেক জিনিস।

এডভোকেসি জার্নালিজমের সময় ও ক্ষেত্র এখনো অটুট। বিভিন্ন সামাজিক ইস্যু নিয়ে এখনো এডভোকেসি জার্নালিজম হচ্ছে। তবে আমাদের দেশে আফলাটক্সিন বা এরকম ধরনের ইস্যু নিয়ে পত্রিকাগুলো যে লড়াই করেছে তা এডভোকেসি জার্নালিজম নয়। অনেক ইস্যু নিয়ে যে এডভোকেসি জার্নালিজম হয়নি তা নয়, তবে বেশিরভাগই ভালো পরিণতি লাভ করেনি।

Advocacy Journalism-কে কেউ কেউ Adversary Journalism বলে অভিহিত করেন। কারণ Adversary Journalism কারো পক্ষে যাচ্ছে এবং কারো বিরুদ্ধে। Adversary Journalism-এর ধারণাটি মূলত তৈরি হয়েছে এই কারণে যে সরকার ও সংবাদপত্রের মধ্যে একটি সহজাত সংঘাত রয়েছে। এই ধরনের সাংবাদিকতার অনেক কিছুই সরকার ও সরকারের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়।



www.pathagar.com

## সিভিক জার্নালিজম

নব্বই'র দশকেই মার্কিন সংবাদপত্র সংগঠনগুলোর বার্তাকক্ষে একটি নতুন ধারার সাংবাদিকতা একেবারে ঝড় না হলেও আলোড়ন তুলে চলেছে-এর নাম 'সিভিক', অথবা 'পাবলিক' জার্নালিজম। এই সাংবাদিকতা শৈলী অবয়ব বা কাঠামোর দিক থেকে নতুন নয় বরং বিষয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে নতুন। এই ধারায় মার্কিন সাংবাদিকদের বেশি করে সাধারণ মানুষের কথা শুনতে বলা হচ্ছে এবং সামাজিক পরিবর্তনের পেছনে নিহিত মূল শক্তিগুলোকে বোঝার চেষ্টা করতে বলা হচ্ছে।

বিষয়য়ের দৃষ্টিকোণ থেকে সিভিক বা পাবলিক জার্নালিজম উন্নয়ন সাংবাদিকতারই উল্টোপিঠ বলা যায়। আর যদি এ সাংবাদিকতার সুফলভোগীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়, তবে একে কমিউনিটি জার্নালিজমের সঙ্গেও তুলনা করা যায়। কারণ এধরনের সাংবাদিকতায় নিয়োজিত কর্মীদের স্থানীয় কমিউনিটিতে কী খারাপি চলছে বা কী অসুবিধা আছে তা বের করার বাইরেও পত্রিকাগুলো বিভিন্ন ফোরাম আয়োজনের আহ্বান জানাচ্ছে, এমনকি বিভিন্ন নাগরিক সংগঠনকে সমর্থন যুগিয়ে যাচ্ছে যেখানে জনগণ আলাপ আলোচনা করে তাদের সমস্যার সমাধান করতে পারে। এজন্যে একে সলিউশন রিপোর্টিং বলেও আখ্যায়িত করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পাদক পরিষদের এক সময়ের সভাপতি এড মারে।

'বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণে সচেতন ব্যক্তি বা সংগঠন জননীতি প্রণয়ন বা সংস্কারের লক্ষ্যে গণমাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে যখন সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন তখন তা মিডিয়া এডভোকেসি নামে অভিহিত হয়। মিডিয়া এডভোকেসির ধারণা থেকেই জন্ম নিয়েছে 'এডভোকেসি জার্নালিজম' বা 'সিভিক জার্নালিজম'। এডভোকেসি জার্নালিজম বা সিভিক জার্নালিজম গতানুগতিক সাংবাদিকতার গণ্ডি অতিক্রম করে আরো এক ধাপ এগিয়ে সাংবাদিকার জগতে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। কেবলমাত্র ঘটনার বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও অনুসন্ধানের মধ্যে এডভোকেসি জার্নালিজম বা সিভিক জার্নালিজমের ধারণা সীমাবদ্ধ নয়, বরং বিবৃত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে জনমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে সাংবাদিকতার এই ধারা'[১৩]। বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকা এমনকি মিডিয়া সংগঠনগুলো বিভিন্ন ফোরামের আয়োজন করে কমিউনিটির স্বার্থসংশ্লিষ্ট ইস্যুগুলোর সমাধান খোঁজার চেষ্টা করছেন এবং পত্রপত্রিকায় তার বিস্তারিত কভারেজ দেয়া হচ্ছে। কেননা এ ধরনের সাংবাদিকতায় একটা সম্ভাবনাময় পাঠক-যুথও তৈরি হয়ে যাচ্ছে।

সিভিক বা পাবলিক জার্নালিজম প্রবর্তনের পেছনে একটি উদ্দেশ্য অবশ্যই কাজ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রে সংবাদপত্র পাঠকের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। এমনিতেই মার্কিনিদের 'Headlines scanner race' বা 'শিরোনাম পড়ুয়া জাত' বলে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ শিরোনাম ছাড়া তাঁরা পত্রিকার আর কিছুই পড়ে না বলে ধরা যায়। তাহলে প্রশ্ন জাগে মনে পত্রিকাগুলো কী পাঠক চাহিদা অনুযায়ী বিষয়



www.pathagar.com

দিতে পারছে না কিংবা সংবাদপত্রে আকৃষ্ট করার উপস্থাপনা পদ্ধতি ভালো নয়? কিন্তু ওঁরা তো উন্নত জাতি, শিক্ষিত। যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত সে জাতি তত বেশি বই-পত্রপত্রিকা পড়ে। তাহলে পাঠকের আগ্রহ নেই কেন? মার্কিন সমাজ টিভি দেখতে এত অভ্যস্ত যে তাদের TV viewing race-ও বলা হয়। টিভির ওপর খুব বেশি নির্ভরশীল ওরা। কিন্তু টিভিতে উন্নয়ন বা এ ধরনের সাংবাদিকতা খুব বেশি বিস্তারিতভাবে জানানো যাচ্ছে না। কারণ টিভির বেশি সময় দখল করে নিচ্ছে বিভিন্ন স্পন্সরের সস্তা বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান যা সাংবাদিকতার মানদণ্ডে পরিমাপ করা কঠিন। এ প্রেক্ষাপটে মার্কিন সাংবাদিকরা মনে করেছেন যে মার্কিন জনগণকে সংবাদপত্র পড়ায় ফিরিয়ে আনা যাবে যদি তাৎপর্যপূর্ণ কমিউনিটি ইস্যুগুলো সম্পর্কে তাঁদের উৎসাহিত করা যায় কিংবা সেই ইস্যুগুলোর মাঝে তাদের সংশ্লিষ্ট করা যায়। ওখানকার জনগণ রাজনীতি-জাতীয় বা আন্তর্জাতিক-কিংবা তাদের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে এত বেশি মাত্রায় ব্যস্ত ও প্রভাবিত যে সাংবাদিকতার প্রচলিত বিষয়গুলোতে তাঁদের মনোনিবেশ নেই। এছাড়া দেশটির মানুষ বিভিন্ন জাত, সমাজ, সংস্কার ও সংস্কৃতিতে বিভক্ত। ফলে কমিউনিটির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর দিকে মনোনিবেশ করছে মার্কিন সাংবাদিকরা- আর এই কমিউনিটির কোনটা ক্লাস কমিউনিটি (Class community) আবার কোনটা ম্যাস কমিউনিটি (Mass Community)। এই ধরনের কমিউনিটি রয়েছে আমাদের দেশেও। এমনকি ঢাকার মতো নগরীতেও এমন কিছু Class Community রয়েছে যাদেরকে সাংবাদিকতার চিরাচরিত বিষয় ও শৈলী দিয়ে তৃপ্ত করা যায় না, করা যায় কমিউনিটি ইস্যু ও ভিন্ন মাত্রার উপস্থাপনা দিয়ে। যদিও পুরো জাতি শিক্ষিত না হলে কমিউনিটি চরিত্রের পত্রিকা তৈরি করা মুশকিল। পত্রিকাকে তখন 'পপুলার ক্যারেকটার'-এ চালানো ছাড়া উপায় থাকে না।

সিভিক জার্নালিজন-এর ধারণা সত্ত্বেও সেখানকার পত্রিকাগুলো যুক্তরাষ্ট্রের অনেক সামাজিক সমস্যার সমাধান দিতে পারেনি। এই সাংবাদিকতা বাংলাদেশের পরিমণ্ডলে কতখানি ভূমিকা রাখতে পারছে বা পারবে তা এখনই বলা মুশকিল। কারণ কমিউনিটি পর্যায়ে কমিউনিটি ইস্যু নিয়ে লিখে সাফল্য পাওয়া যাবে তখনই, যখন কমিউনিটি অনেক বেশি 'যুথবদ্ধ' হবে, শিক্ষিত হবে, সচেতন হবে। প্রকৃতপক্ষে সমাজের বেশিরভাগ নাগরিক যতক্ষণ অশিক্ষিত ও অসচেতন থাকে ততক্ষণ একটি সিস্টেমে পপুলার ক্যারেকটারের পত্রিকা প্রাধান্য বিস্তার করে চলে।

সিভিক বা পাবলিক জার্নালিজমের এই সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করে জে রোজেন ও ডেভিস মেরিট নামের দুই লেখক 'Public Journalism Theory and Practice' শীর্ষক সিরিজ লেখায় বলেছেন :

...in a nation segmented by race, class and cultural barriers, and by a polity absorbed in the vicarious experience of television



www.pathagar.com

rather than community activity, strategies to recapture readers will always be incomplete without and another sort of strategy aimed at re-engaging citizens in public affairs and the life of the community.

উপরের বিবৃতিটি যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে ক্ষুদ্র বলয়ে হলেও আমাদের দেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

**উপসংহার**

সাংবাদিকতা বৃত্তির সূচনার পর বহু বছরের পথ পরিক্রমায় তার প্রয়োগের ক্ষেত্রগুলোর পরিবর্তন হয়েছে, বহুবিস্তৃত হয়েছে। পরিবর্তন হয়েছে উপস্থাপনা বা পরিবেশনায়। পরিবর্তন হয়েছে পরিবেশনের শৈলীর ক্ষেত্রেও। সমাজ যতই আধুনিক হচ্ছে ততই পরিবারসহ বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের শাখা-প্রশাখার বিস্তার ঘটেছে। যুগযন্ত্রণা ও জটিলতা বেড়েছে। সমাজ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত মানুষজনের কর্মবিস্তৃতি ও মনোযোগ বহুমাত্রিক হয়েছে। ফলে সংবাদবৃত্তির চর্চার ক্ষেত্রগুলো এখন নানামুখী ও দিগন্তবিস্তৃত। কিন্তু শৈলীর ক্ষেত্রে প্রায়োগিক পরিবর্তন কতটুকু? নতুন ধারার সাংবাদিকতার স্বরূপ অন্বেষা যতটা বিষয়ের ক্ষেত্রে, তার থেকেও বেশি শৈলী বা কায়দার ক্ষেত্রে। যারা এই বৃত্তিতে পুঁজি যোগায় তাদের চাহিদাই কি নতুন ধারার উন্মেষ ঘটায়?

সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে বিষয়ের ক্ষেত্রে যতটা পরিবর্তন দৃশ্যমান ও বহুল প্রচারিত-চর্চিত, শৈলী বা কায়দার ক্ষেত্রে পরিবর্তন অত স্পষ্ট নয়। অন্তত নতুন নতুন কায়দাগুলো আবিষ্কৃত হলেও তার ব্যবহার বা প্রয়োগ ততটা নয়। কারণ মৌলিক কায়দাগুলোই এখন পর্যন্ত বহুল ব্যবহৃত, অন্তত আমাদের সাংবাদিকতায়; বিশেষ করে এখনো যখন এদেশের অধিকাংশ পত্রপত্রিকা পপুলার ঢঙে সংবাদ কভার ও পরিবেশন করে। এইসব দিকগুলোকেই প্রবন্ধ স্পষ্ট করার চেষ্টা হয়েছে। প্রবন্ধে উপস্থাপিত তথ্য ও অনুষঙ্গগুলোই স্পষ্ট করে দেবে নতুন ধারার সাংবাদিকতার অন্বেষণের দৌড়ে আমরা কতটা এগিয়েছি।

**তথ্যসূত্র :**


- Michell V. Charnley & Blair Charnley : Reporting (Fourth edition); Holt, Rinehant and winston, New York, 1979; P-110
- এফ, ফ্রেজার বন্ড (ফেরদৌস নিগার হোসেন অনূদিত) : সাংবাদিকতা পরিচিতি, বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৮৭; পৃষ্ঠা-১৮৯
- David Wainwright; Journalism Made Simple; Rupa & Co, Calcutta; 1992; P-28
- Michell V. Charnley & Blair Charnley : Ibid, P-42
- Ibid, P-37




www.pathagar.com

- Ibid, P-40
- Ibid, P-40
- Ibid, P-40
- Ibid, P-323
- Ibid, P-339
- পার্থ চট্টোপাধ্যায়; বিষয় : সাংবাদিকতা; লিপিকা, কলকাতা, ১৯৮৬; পৃ-৯২
- পূর্বোক্ত, পৃ-৯৩
- প্রান্তজন, এমএমসি জার্নাল, কামরুল হাসান মঞ্জু সম্পাদিত; পৃ-৫১
- Paul Malamud; Civic Journalism (An Antidote to Apathy), Electronic Journals of the US Information Agency, Vol-1, No. 8 : P-30

**পাদটীকা :** তথ্যপ্রযুক্তির চরম উৎকর্ষের ফলে ইতোমধ্যে সামাজিক যোগাযোগের কিছু হাতিয়ার বা মাধ্যম যেমন ফেসবুক, টুইটার, ব্লগ প্রভৃতি তৈরি হয়ে গেছে এবং এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষই 'ইনফরমালি' সাংবাদিকতা করে যাচ্ছেন, গণযোগাযোগ করছেন। এঁদের মাধ্যমেই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বড় বড় সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন তৈরি হয়ে গেছে। গোটা আরব জুড়ে যে ব্যাপক রাজনৈতিক পালাবদল, তা এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিয়োজিতদের যোগাযোগের ফসল। পশ্চিমাদের সৃষ্ট অসুর সদৃশ্য কর্পোরেট গ্রুপের সৃষ্ট এই মাধ্যমগুলোর মাধ্যমেই তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধিরা কর্পোরেটদের বিরুদ্ধেই এখন আন্দোলন দাড় করিয়েছে। 'Occupy Wall Street' কনসেপ্টটি হচ্ছে তার বড় প্রতিফলন। সামাজিক যোগাযোগের এই মাধ্যমকে অনেকে মূলস্রোতের মাধ্যম হিসেবে রূপান্তরের কল্পনা করছেন এবং একটি অপ্রচলিত ভাষা ও শৈলীও তারা ইতোমধ্যেই তৈরি করেছেন-যার মাধ্যমে ইতোমধ্যেই তৈরি হয়ে গেছে এক বিরাট অডিয়েন্স। তবে এও সত্য, সবাই কবিতা লেখলেও যেমন সবাই কবি নয় তেমনি সবাই সাংবাদিকতা করলেও সবাই সাংবাদিক নয়। নতুন ধারার এই যোগাযোগ চর্চায় ইতোমধ্যেই কড়ামাত্রার 'সাইড ইফেক্ট্ও' তৈরি হয়ে গেছে এবং এটা প্রমাণ করে যে এটা প্রচলিত গণমাধ্যমের কর্মের একীভূত অংশ নয়।

*সূত্র : লেখাটি ম্যাসলাইন মিডিয়া সেন্টারের জার্নাল 'প্রান্তজন'-এর ৩য় সংখ্যায় (২০০৩) প্রকাশিত।*



www.pathagar.com

# ইতিহাসের পরিক্রমায় বাংলাদেশে এখন চলছে সমবায় সাংবাদিকতা

আমেরিকানরা নাম তৈরিতে পাকা। তাঁরা নাম বানায়, নাম পাল্টায়, এক নামের ওপর আরেক নামের প্রলেপ লাগায়। আবার অন্যের নাম নামিয়ে ফেলতেও ওঁরা পটু। অন্যের নামধাম ধ্যানধারণাগুলোকে ওঁরা খুবই ঘেন্না করে অথবা ঘৃণার প্রলেপ ছড়িয়ে দেয়। 'গ্লোবালাইজেশন' হচ্ছে ওঁদের দেয়া একটা চটকদার নাম, যার কল্যাণে আমরা আমাদের সংস্কৃতি হারাতে বসেছি। উল্টোপিঠে সমাজতন্ত্রের বারোটা ওঁরাই বাজিয়েছে। কিন্তু নিজেদের পুঁজিবাদ যখন তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে তখন তাকে সর্বমতযোগ্য করার জন্য 'সোশ্যালিস্টিক ক্যাপিটালিজম' বা কল্যাণকর পুঁজিবাদের মিষ্টি আবরণ দিয়ে বাজারে ছেড়েছে। তো আমেরিকানরা সাংবাদিকতার ধরনধারণ বা রকমফেরেও বহু নামের উদ্ভাবন এরই মধ্যে ঘটিয়েছে। তার সর্বশষ সংস্করণ হচ্ছে ফিকশন (fiction) বা গল্পের ছলে লেখা। ইংরেজি News item কে সংবাদগল্প বললে আমাদের শিক্ষকরা ভুল শুধরে সংবাদবিবরণী বলতেন তা কিন্তু এখন প্রকৃতই সংবাদগল্পের রূপ ধারণ করছে। সে আবার যে সে গল্প নয়, মাঝে মাঝে গল্পেরও অতীত। এ ধরনের সাম্প্রতিক নাম হচ্ছে Narrative Journalism. আমেরিকানদের মধ্যে 'পাঠ-মান্দ্য' এত চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে যে সংবাদের উপস্থাপন এখন অতীন্দ্রীয় গল্পের ঢংয়ে না বললে পাঠক পাওয়া যাচ্ছে না। ওঁরা এটা নিজের দেশে চালাচ্ছে অন্য দেশেও রপ্তানি করছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশেও তার ভালরকম আঁচ পড়েছে। এ হলো সাংবাদিকতার কলোনিয়ালিজ্‌ম্‌।

সাংবাদিকতার নাম ও বৈশিষ্ট্য মাহাত্ম্য নিয়ে আমেরিকানদের যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তার ওপরে ভিত্তি করেই উপমহাদেশে-বিশেষ করে বাংলাদেশের আমরাও এ ক্ষেত্রটিতে বিচরণ করে জীবিকা নির্বাহ করছি, নাম কিনছি, দুর্নামও কিনছি।

আমেরিকা দীর্ঘদিন ব্রিটেনের কলোনী ছিল। আমরাও ছিলাম। সেই উপনিবেশী আমলের সাংবাদিকতাকে আমেরিকানরা একটা সময়ের মধ্যে গেরো দিয়ে বলেছে



www.pathagar.com

Colonial Journalism বা উপনিবেশী সাংবাদিকতা। এমনটাই বলার কথা। আর আমরা যখন কলোনিয়াল যুগে, তখনই এ অঞ্চলে সাংবাদিকতার শুরু বৃটিশদের হাতে ধরে। উনিশ শতকের শুরুতে সেই সাংবাদিকতা জমেছিলও ভালো- সংস্কার ইস্যুকে কেন্দ্র করে। কিন্তু সেই যুগটাকে আমরা Colonial Journalism-এর অভিধায় অভিহিত করতে পারিনি। Advocaey Journalism বা 'ওকালতি সাংবাদিকতা' (শব্দটি আমার কাছে একটু ইতরযোগ্য) কিছুটা নাম পেয়েছিল। ওই শতকে সীমিত পর্যায়ে বাঙালির একটি সাংস্কৃতিক উত্থান ঘটেছিল তার পরেও তাকে আমরা 'রেনেসাঁ জার্নালিজম' নাম দিতে পারিনি, যেমনটা পারিনি ১৯৮০ এর পুরোটা দশক। সে সময়ের স্বেচ্ছাচারী সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ফ্রন্টের বাইরে শিল্পসাহিত্য ফ্রন্টেও লড়াই চলছিল, সঙ্গতই পুরো দশকটাজুড়ে শিল্পসাহিত্য সাংবাদিকতা দারুণ জমে উঠেছিল। কিন্তু আমরা তাকে সাংবাদিকতার কোনও সুনির্দিষ্ট নামের ফিতায় আটকাতে পারিনি।

১৬৯০ সালে আমেরিকার থেকে বের হয়েছেল Publik Occurances নামে এক পত্রিকা, যেটি ছিল সেদেশের প্রথম স্বীকৃত পত্রিকা। সে পত্রিকায় ব্রিটেনকে উদ্দেশ্য করে হয়তো কিছু লেখা হয়েছিল অতত্রব ব্রিটিশ গভর্ণর সাহেব খেপে গিয়ে পত্রিকাটির জন্মের প্রথমদিনই তাকে গলাটিপে মেরে ফেলেছিলেন। এ ছিল 'কলোনিয়াল জার্নালিজম'-এর সহজাত নমুনা। কলোনী হলেই কি কোন পত্রিকাকে গলাটিপে মেরে ফেলা হয়? অন্য সময় নয়? আমেরিকার স্বাধীনতার কিছু আগে ও পরে ব্রিটিশ সরকারের ওপর আমেরিকান সংবাদপত্রের অসন্তুষ্টি জমেছিল ভালোই এবং দু'পক্ষই যখন সংবাদপত্রকে প্রচারণার মিশন হিসেবে বিবেচনা করছিল তার ওপর ভিত্তি করে নাম তৈরি হয়ে গিয়েছিল 'রিভ্যুলুশনারী প্রেস'। একি 'বিদ্রোহী' না 'বিপ্লবী' সংবাদপত্র! 'রিভ্যুলুশনারী প্রেস'-এর সম্প্রসারিত রূপ হচ্ছে 'পার্টি প্রেস'। সে সময় প্রতিটি প্রেসিডেন্সিয়াল এডমিনিস্ট্রেশনের আওতায় সরকারি সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে থাকে। আমাদের দেশে এখন যেমন সব সরকারের ও বিরোধী দলের আনুগত্যে পত্রপত্রিকা রেডিও টেলিভিশন একাধিক আছে। দলীয় এক একটি প্রপাগাণ্ডা মেশিন! ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত আমরা দ্রোহে বা বিপ্লবে ছিলাম। কিন্তু সেই সময়ের সাংবাদিকতাকে গবেষণার স্বার্থে আমরা ব্র্যাকেট-বন্ধনী করতে পারিনি। আর একাত্তরের ওই নয় মাসকে আরো বেশি স্পষ্ট করে 'লিবারেশন প্রেস' কী বলতে পেরেছি? এ নিয়ে বিচ্ছিন্ন পর্যায়ে কাজ হয়েছে কিন্তু সময়টা স্পষ্টতর হয় নি। সে সময়ের সাংবাদিকতার কথা চিন্তা করলে 'বিবিসি', 'স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র' ও 'আকাশবাণী' বারবার উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে কিন্তু সাংবাদিকতার প্রাণ সংবাদপত্র ও তার ভূমিকা নিয়ে আমরা এখন পর্যন্ত একটা নামতিলক স্পষ্ট করে বসাতে পারিনি। কারণ সীমিত সামর্থে ও সাধ্যে যে কাজ সেসময় হয়েছিল তাকে একত্রিত ও সমন্বীত করে পরের প্রজন্মের বিদ্যার্থীদের জন্য পাঠ তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছি আমরা। ফিসফিসে গলায় অবশ্য বলা হয়েছে 'অবরুদ্ধ সংবাদপত্র'। তা কি সবার কাছে খুব স্পষ্ট হয়েছে?



www.pathagar.com

আমেরিকার 'পার্টি প্রেস' সাংবাদিকতার একটি নতুন এভিনিউ খুলে দিয়েছিল। অর্থাৎ এ সময় থেকেই শুধুমাত্র সংবাদবিবরণীতে নয়, সম্পাদকীয় লেখার ধরনটা বিকাশ পেতে শুরু করে এবং এর সুনির্দিষ্ট পাঠকশ্রেণীও নির্ণীত হতে শুরু করে। রিভ্যুলুশনারী ও পার্টি প্রেসের পরের ধাপটা হচ্ছে 'পেনী প্রেস'। দলীয় আনুগত্য ছেড়ে সংবাদপত্রগুলো স্বাধীন হতে শুরু করলো। মন্তব্য করার বদলে সংবাদের ওপর মনোনিবেশ বাড়লো। স্থানীয় সংবাদ ও মানবিক আবেদন-সমৃদ্ধ সংবাদ পরিবেশিত হতে শুরু করলো বেশি বেশি করে। আর এ সময় থেকেই বাড়তে শুরু করলো পাঠকসংখ্যা, ফলে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় পত্রিকা পাঠকের হাতে পৌছে দেয়ার প্রাণান্ত চেষ্টা, সে লড়াই বিস্তৃত আজ অব্দি। রিডারশীপের চেতনাটা তখন থেকেই। গোটা তিনেক বৈশিষ্ট্য তখন ছিল চোখে পড়ার মতো। নিয়মিত গ্রাহকদের (Regular household subscribers) বদলে পত্রিকা রাস্তায় রাস্তায় বিক্রি হতে শুরু করলো। অর্থাৎ মাথায় তখন সার্কুলেশন বাড়ানোর ও মার্কেটিংয়ের নতুন নতুন আইডিয়া। আমাদের দেশে যেমন সাম্প্রতিক সময়ে 'আমাদের সময়' ও 'বাংলাদেশ প্রতিদিন' গাড়িতে ভ্রমণকারী ও রাস্তায় চলমান লোকদের প্রায় নিয়মিত গ্রাহক বানিয়ে ফেলেছে সম্ভবত শুক্রবার ছাড়া। দ্বিতীয়ত পেনী প্রেস মানে এক পেনী দিয়েই পত্রিকা কেনা যায়। বাংলাদেশে এই ধারার পথিকৃৎ 'আমাদের সময়' মাত্র দু'টাকায় প্রথমত চার পরে ছয় পৃষ্ঠার পত্রিকা দিয়ে একটা নতুন পাঠকগোষ্ঠী তৈরি করে ফেললো। যদিও প্রায় সব পাতা জুড়ে অসংখ্য নাতিদীর্ঘ সংবাদ, বিবরণীগুলো তার কিঞ্চিৎ উচ্চকিত, চাঞ্চল্যের মিশেল। 'মূলস্রোতের পত্রিকা' বলে দাবিকৃত পত্রিকাগুলো থেকে ভিন্ন তার উপস্থাপনা, পাঠককে আরো আলোচনা, তর্কে ও বিতর্কে উসকে দেয়ার প্রবণতা। কোন সম্পাদকীয় কিংবা কলাম নেই, তার বদলে শুধু খবর। সার্কুলেশন বাড়ানোর এ নবতর রূপ। পেনী প্রেসের মতো বাংলাদেশের এই দুটো পত্রিকা প্রথমদিকে যতটা না ছিল ম্যাস মিডিয়াম তার থেকেও বেশি ছিল টার্গেট মিডিয়াম। অর্থাৎ সম্ভাব্য পাঠকশ্রেণীর বিরাট অংশকে টার্গেট করে তাদের গ্রাহকরূপে তৈরি করার যে মাধ্যম-তাই টার্গেট মিডিয়াম। আমরা ভালো করেই বুঝি যে, দু'টাকার একটি পত্রিকার উৎপাদন খরচ আট-দশ টাকার কম নয়। তাহলে রাজস্বটা আসে কোত্থেকে? একটা সাধারণ ধারণা হলো যে, মোটামুটি ভালো মানের পত্রিকার তিন-চতুর্থাংশ রাজস্বই আসে বিজ্ঞাপন থেকে। কিঞ্চিৎ পরিমাণ আসে বিক্রি (Paid-up circulation) থেকে। অতএব দু'টাকায় বিক্রি করলেও কিছু আসে যায় না। তবে বিজ্ঞাপন পাওয়াটা নিশিত হয় ওই সংশ্লিষ্ট পত্রিকার সার্কুলেশন কত তার ওপর। একটা কনসেপ্টই তাই তৈরি হয়েছে যে : 'It is not Ad, rather circulation is the life-blood of newspaper.' অতএব টার্গেটটা যদি বড় হয় তাহলে বিজ্ঞাপন পাওয়া কোন সমস্যা নয়। পুরোনো আমলের পেনী প্রেসের মতো আমেরিকায় কিংবা পশ্চিমের অন্যান্য রাষ্ট্রে এমন কিছু টার্গেট মিডিয়াম (সংবাদপত্র) আছে যারা



www.pathagar.com

পত্রিকার জন্য এক টাকাও নেয়না। কিন্তু তারা জানে তাদের বিশাল পাঠকশ্রেণীর দেয়া বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাদের উৎপাদনী খরচ ও মুনাফা দুটোই উঠিয়ে ফেলতে পারবে। পেনী প্রেসের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল দলীয়ভাবে সংবাদ উপযোগী ঘটনার তথ্য সংগ্রহ। ইরেজিতে যাকে বলা যায় Cooperative news gathering system। সংবাদপত্রের মালিকানায় Joint Operation Ownership বলে একটা কথা আছে। এই মালিকানার উদ্দেশ্যই হচ্ছে একাধিক পত্রিকা একে অপরের সুযোগ-সুবিধাগুলো (Facilities) ব্যবহার করতে পারে। যেমন একই মুদ্রণযন্ত্র, ভবন, পরিবহন, মাঝে মাঝে একে অপরের সংবাদকর্মী দল। তবে যৌথভাবে সংবাদসংগ্রহ করতে গেলে সাংবাদিকতার যে সহজাত প্রতিযোগিতা তা আর থাকেনা। কিন্তু প্রতিযোগিতা হচ্ছে সাংবাদিকতার প্রাণ। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাংলাদেশে বর্তমানে চলছে সেই Cooperative Journalism বা সমবায় সাংবাদিকতা। কী বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা অথবা মূলস্রোত সর্বত্রই চলছে এই নতুন ধারা—সমবায় সাংবাদিকতা। বাংলাদেশের টিভি মিডিয়ামে এটাতো আরো প্রকট। পনের-বিশ বছর আগেও Exclusive বা একান্তসংবাদ উপস্থাপনের যে বাধ্যবাধকতা ছিল তা প্রায় হারিয়ে গেছে। সাংবাদিকরা এখন একটু সংবাদের গন্ধ পেলেই সেখানে দলবেঁধে ঝাপিয়ে পড়ছেন। সংবাদের টোকাগুলো (jottings) একে অপরের সঙ্গে 'শেয়ার' করে সংবাদবিবরণীর কাঠামো বাঁধছেন। সংবাদপত্রে তবুও বা কিছুটা পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু টিভি চ্যানেলের সুইচ এদিক ওদিক ঘুরিয়ে শুধু একই কথা। চব্বিশ ঘণ্টা পরেও চব্বিশ ঘণ্টার আগের কথা।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়টিতে (চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশক) আমেরিকায় বয়ে গেছে গৃহযুদ্ধ। সে সময়ই আবিষ্কার হয়েছিল টেলিগ্রাফ মেশিনের; আর টেলিগ্রাফ মেশিনের যন্ত্রপাতির গোলমেলে কারণে সময়ে অসময়ে তার অকার্যকারিতা ও গৃহযুদ্ধের হাঙ্গামার ফলে সৃষ্ট একটি পরিস্থিতিতেই সংবাদের 'ইন্ট্রো' বা সংবাদ-শীর্ষ লেখার কায়দাটি আবিষ্কৃত হয়েছিল। গৃহযুদ্ধের বিষয়টিই বোধহয় পরে অষ্টাদশ শতকে পশ্চিমে শিল্পায়নের পত্তন ঘটিয়েছিল। গৃহযুদ্ধ ও শিল্পায়নের দুটো বেশ বড় সময় সাংবাদিকতার জন্য ভালো উপাদান ছিল। আব্রাহাম লিংকন ছিলেন গৃহযুদ্ধের সময়কার প্রেসিডেন্ট এবং গৃহযুদ্ধের বলি। তো সাংবাদিকতার জন্য সেই দুটো উর্বর সময়কে আমেরিকানরা বৃত্তবন্দী করলো 'Civil war press' ও Industrial age press হিসেবে। তারপরে এসেছিল সেই মোক্ষম সময়টা। প্রথমে ইয়েলো এবং অনেকটা পরে নিউজার্নালিজম। সাংবাদিকতায় যুক্ত হলো চাঞ্চল্য যার লাগামটা টানা গেলো না আজকেও। সময়ের বৃত্তে চাঞ্চল্যবাদী সাংবাদিকতাকে কাগজে কলমে আটকানো গেলেও তা চলছে নতুন এ শতাব্দীতেও। বাংলাদেশের তুলনামূলক নবীন ব্রডকাস্টিং সাংবাদিকতায় চাঞ্চল্যই হচ্ছে প্রাণ। এর বাইরে আমরা যেতেই পারছি না। সেখানে রীতিনীতির রাখঢাকের বালাই নেই।



www.pathagar.com

যে সময় পশ্চিমে চাঞ্চল্যবাদী সাংবাদিকতা তখনও এ অঞ্চলে বিশেষত বাংলাভাষী অঞ্চলে প্রকৃত সাংবাদিকতার উন্মেষকাল এবং ভারত-পাকিস্তান ভাগ হওয়ার আগে পর্যন্তও তার স্পষ্ট ও সঠিক রূপটি তৈরি হয়নি। মার্কিনী চাঞ্চল্যবাদী সাংবাদিকতা তখন প্রবল প্রতাপে। পুলিৎজার ও হার্স্টের মারামারির মধ্য দিয়ে ওঁরা সাংবাদিকতার একটি নতুন বৈশিষ্ট্যকে আবিষ্কার করলো। রংয়ের ব্যবহার ও বড় বড় শিরোনাম চাঞ্চল্যবাদী সাংবাদিকতার প্রধান অনুষঙ্গ। এর মধ্যে ফটোগ্রাফির উন্নতি হয়েছে। অতএব নানামাত্রিক ছবি ইয়েলো জার্নালিজমের আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। সেই ধারা বাংলাদেশের মূলস্রোতের পত্রপত্রিকায়ও প্রকট।

এর পরে যেটি এলো অর্থাৎ হলুদ সাংবাদিকতার প্রায় কাছাকাছি সময়ে- তাহলো সংস্কার সাংবাদিকতা বা Reform Journalism। সংস্কার ইস্যুকে কেন্দ্র করে উনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে কোলকাতায় এক ধরনের সাংবাদিকতা তৈরি হয়েছিল। পত্রপত্রিকার আবির্ভাব এবং সংস্কার ইস্যুর ওপর বক্তব্য প্রকাশের জন্য সংবাদপত্রগুলো হয়ে উঠলো প্রধান হাতিয়ার। হিন্দুদের মধ্যকার বিক্ষুব্ধবাদী ও সংস্কারবাদীদের- যার নেতৃত্বে ছিলেন রাজা রামমোহন রায়- লড়াই সাংবাদিকতায় একটা নাম ঠিক করে দিলো-Advocacy Journalism-যেটি আমরা আগের লেখাতেও উল্লেখ করেছি। যদিও তা এডভোকেসীর শালীন সীমানা ছাড়িয়ে কাদা ছোড়াছুড়ির ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল-যাকে আমরা বলতে পারি Adversary Journalism. আমাদের নামহীন সাংবাদিকতার পরিমণ্ডলে তবুও ভালো আমরা এক ধরনের সাংবাদিকতাকে সময় নয়, আচরণের বোতলে বন্দী করেছি যার নাম Adversary Journalism. কিন্তু বর্তমানে বেশ কিছুটা সময় ধরে *প্রথম আলো* ও *কালের কণ্ঠের* পারস্পরিক রেষারেষি Adversary Journalism -এর খুবই ভালো উদাহরণ; অন্যান্য কিছু পত্রিকাও স্বল্পমাত্রায় একাজটি চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ সমাজ কাঠামো ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সংস্কারের অনেক ইস্যু রয়েছে। সেগুলো নিয়ে পত্রিকাগুলো 'বাহাস' করতে পারে, লড়াই চালাতে পারে। দু'একটি পত্রিকা একেবারেই করছে না তা নয়। তবে মাত্রায় একেবারেই কম। অথচ সংস্কারবিষয়ক সাংবাদিকতাকে আমরা নতুন করে একটি সময়ের মলাটে বন্দী করতে পারতাম।

গত শতাব্দীর প্রথম ভাগের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশক আমেরিকা দেখেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, তার পিছে সওয়ার হয়েছিল অর্থনৈতিক মহামন্দা। জাতীয় পর্যায়ে তাদের দেখা দিয়েছিল এক মহাসংকট। সাংবাদিকতার চোখও ছিল সেদিকে। অতএব আমেরিকানরা অবলীলায় এর নাম দিয়েছে National Crisis Journalism. বাংলাদেশেরতো বেশিরভাগ সময়ই সংকট। এ সংকট ক্ষুধা দারিদ্র্য, যুদ্ধ, রাজনৈতিক সংঘাত, দীর্ঘমেয়াদে পরিবেশ বিপর্যয়। আর এসবই হচ্ছে ন্যাশনাল ক্রাইসিস জার্নালিজমের একেকটি অনুষঙ্গ। গত শতাব্দীর '৭৫-'৮০, '৮১-'৯০ হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য দুটো সংকট কাল। ২০০৭-২০০৮ তো হচ্ছে আমাদের মহাসংকটকাল। আমরা কী সে সময়ের সাংবাদিকতাকে National Crisis



www.pathagar.com

Journalism নামের ব্যানারে অভিহিত করতে পেরেছি? সেই আন্দাজে কি সাংবাদিকতার স্টাইল, ধরন, রূপ বা আঙ্গিক তৈরি হয়েছে?

সময়ের পরিক্রমায় সাংবাদিকতার রং পাল্টাচ্ছে। সময়ের একেকটা খণ্ডাংশ সেই সময়ে বিরাজমান পরিস্থিতি, উদ্ভূত বিষয়সমূহ সাংবাদিকতার গতিপ্রকৃতি ও ধারা এবং ধারণা বিনির্মাণ করছে। তাকে কেন্দ্র করে পশ্চিমারা বিশেষ করে আমেরিকানরা সাংবাদিকতাকে বাহারী কায়দায় মলাটবন্দী ও তত্ত্বগ্রাহ্য করে ভিন্নভাবে উপলব্ধির চেষ্টা করেছে। যদিও ষাটের দশকে কৃষিকে কেন্দ্র করে ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা, ভারত এমনকি বাংলাদেশের কিছু সাংবাদিক প্রকৃতপক্ষে একটি ভিন্নধারার সাংবাদিকতা প্রবর্তন করে তার একটি তাত্ত্বিক ধারণা দিয়েছিলেন যাকে আমরা উন্নয়ন সাংবাদিকতা বলে অভিহিত করছি। কিন্তু সেটিও সুনির্দিষ্ট কোন্ সময়টিকে ধারণ করছে তা স্পষ্ট হয়নি। বরং সব ধরন ও সময়ের সাংবাদিকতাকে সংমিশ্রিত করে প্রায় একশটা বছর ধরে যে সাংবাদিকতা আমরা করছি তাকে 'পপুলার সাংবাদিকতা' এই প্যাকেজ নামের বিশেষণের অলংকার দেয়া যায়।

সাংবাদিকতার পথ পরিক্রমায় নতুন নতুন এভিনিউ খুললেও ঘুরে ফিরে এটাই যেন মনে হয় পোশাকের পুরোনো স্টাইল যেমন নতুনরূপে হাজির হয়ে সে সময়ের মানুষের সামনে নতুন স্টাইল হিসেবে উপস্থাপিত হয় কিংবা মানুষকে আকৃষ্ট করে এটাও অনেকটা তেমনি। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে যে সাংবাদিকতা তা গত শতাব্দীর শুরুর দিককার চাঞ্চল্যবাদী সাংবাদিকতার থেকে কম নয় এবং তথ্য আহরণ ও উপস্থাপন পার্টি প্রেস বা পেনী প্রেসের আঙ্গিকে একটি 'সমবায়ী রূপ ও চরিত্র' ধারণ করেছে। উপস্থাপিত বিষয়গুলোতে সংবাদের গুণাবলী অনেকাংশে অনুপস্থিত, বরং তার চরিত্র সংবাদভাষ্যের মতো এবং উপস্থাপিত তথ্যগুলোর মধ্যে যেন নতুনত্ব নেই; সব পত্রিকা কিংবা চ্যানেলে তার একই সুর, উপস্থাপনা ও ভাষার চরিত্র হয়তো একটু ভিন্ন। দল বেঁধে আমরা সোর্সের কাছে যাচ্ছি একে অপরের কাছে তথ্যের আদান প্রদান করে প্রায় একই স্টাইলে প্রায় একই প্রকার তথ্য উপস্থাপন করছি। এ প্রক্রিয়ায় এটা অত্যুক্তি হবে না যে বর্তমানে বাংলাদেশে চলছে 'সমবায় সাংবাদিকতা'। এ হচ্ছে সাংবাদিকতার Syndicaton. দুঃখের সঙ্গেই বলতে হয় এ নামের সাংবাদিকতা কেউ গ্রাহ্য না করলেই ভালো। তাকে আমরা কোন নামের অভিধায়ও অভিহিত করতে চাইনা।

**পাদটীকা :** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ স্কুল Advocacy-এর একটা ভালো বাংলা নাম দিয়েছে-'অধিপরামর্শ'। Advocacy journalism এর বাংলা কি তাহলে আমরা 'অধিপরামর্শ সাংবাদিকতা' বলবো!

**তথ্য নির্দেশ :** Jay Black, Jennings Bryant, and Susan Thampson (1998) : Introductuion to Media Communication (5th edition); McGraw-IIill Companies, Inc.



www.pathagar.com

# পত্রিকা প্রকাশ : প্রাকভাবনা ও সিদ্ধান্ত

কেউ যদি এসে বলে, একটি পত্রিকা বের করতে চাই কি করবো? এর উত্তর যেমন সহজ, তেমনি কঠিনও বটে। পঁচিশ তিরিশ বছর আগেও একটা পত্রিকা বের করতে গেলে বহুমাত্রিক সমস্যা অতিক্রম করেই করতে হতো। সেই সমস্যগুলোর আঙ্গিকের পরিবর্তন হয়েছে কিছু ক্ষেত্রে, আর কিছু সমস্যার আরো বিস্তৃতি ঘটেছে। আগে পত্রিকার ব্যবস্থাপনা ছিল সীমিত পর্যায়ে। ব্যবস্থাপনার সাজ-সরঞ্জাম এখন অনেক সহজলভ্য হওয়ার পরও পত্রিকা প্রকাশ খুব একটা সহজ কাজ নয়।

বিশ্বায়নের ফলে পুঁজিবাদী অর্থনীতির আরো সম্প্রসারণ ঘটায় সংবাদপত্রের পুঁজি বা মূলধন গঠনের ক্ষেত্রগুলো অনেক স্পষ্ট হয়েছে। অপরদিকে তথ্য প্রযুক্তি ও মুদ্রণ-প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ঘটায় তথ্য সংগ্রহ ও পত্রিকা প্রকাশের প্রক্রিয়াটিও অনেক সহজ হয়েছে। কিন্তু এরই সাথে চলছে পত্রিকা পত্রিকায় ব্যাপক প্রতিযোগিতা। তাই নিজের অস্তিত্বের জন্যই সংবাদপত্র প্রকাশ একটি ক্ষুদ্রবিনিয়োগ নয়, বরং একটি বিরাট উদ্‌যোগ্। এ বিষয়টাকে মাথায় রেখে যাঁরা পত্রিকা প্রকাশ করেন তাঁদেরই সফল হবার সম্ভাবনা। কিন্তু পুরো মাত্রার সম্ভাব্যতা যাচাই না করে শুধুমাত্র কল্পনার সওয়ার হয়ে এবং কোনও লক্ষ্য স্থির না করে পত্রিকা প্রকাশের উদ্‌যোগ নিলে তার পরিণামটা মোটেই সুখকর হবে না এটা নিশ্চিত। এই সহজ হিসেবটাকে মাথায় রেখে পত্রিকা প্রকাশের আগে কতগুলো ক্ষেত্র সম্পর্কে গবেষণা করে নিলে ভালো হয়। পত্রিকা প্রকাশের লক্ষ যেন এমন না হয় 'আজ আছে কাল নেই' অর্থাৎ 'Here today, gone tomorrow'. বরং এ হবে 'আজ আছে, কাল আছে, পরশুও আছে, আছে প্রতিদিন'।

**প্রথমেই বুঝতে হবে পত্রিকাটি কাদের জন্য। প্রকাশিতব্য পত্রিকার প্রথম লক্ষ্য হবে—**

**ক.১. পাঠক :** পত্রিকা প্রকাশের পর পাঠক এমনি এমনি তৈরি হয়ে যাবে এমনটা ভাবা বোকার স্বর্গে বাস করা। পত্রিকাটির পাঠক কাঁরা হবে তা আগে থেকেই স্থির



www.pathagar.com

করে নেয়া ভালো। তবে পাঠক যাঁরা হবে, তাঁদের রুচি ও চাহিদা কেমন হতে পারে তা বিচারবিবেচনা করে নিতে হবে আগেভাগেই। মনে রাখতে হবে শিক্ষিত ও রুচিবান পাঠকের একটি বিরাট অংশ হচ্ছে তরুন শ্রেণী। যাঁদের বয়স ২৫-৩৫ এর ঘরে। আর একটি গ্রুপ ৩৫-৫০ এর ঘরে যাঁরা অনেক কিছু খুটিয়ে খুটিয়ে পড়েন। তরুণ গ্রুপটি শুধু নির্ভেজাল সংবাদ নয়, অন্যান্য পাঠযোগ্য বিষয়েও মনোনিবেশ করে থাকে। এছাড়া রয়েছে শিশুকিশোর, বয়স্ক মানুষ ও মহিলা। তাঁদের সবার জন্য পাঠের বিষয়বস্তু সরবরাহ করতে হবে। আজকের যুগ হচ্ছে 'তথ্যযুগ' বা 'ইনফরমেশন এজ'। মানুষ তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে বিভিন্নভাবে, পন্থায়, প্রকার, প্রকরণে তথ্য পাচ্ছে। তাঁকে পাশ কাটানো কিংবা বঞ্চিত করার কোন অবকাশ নেই। যেখানে তথ্য প্রযুক্তি সহজলভ্য, সেখানে পাঠের সামগ্রীও প্রচুর তৈরি হচ্ছে কিন্তু আমাদের সমাজ এখনও আমেরিকার সমাজের মতো নয় যেখানে পত্রপত্রিকা বা বই পড়ার অভ্যেস মানুষের ক্রমশ কমে যাচ্ছে। বছর পাঁচেক আগেও আমেরিকার শীর্ষস্থানীয় পত্রিকা 'দ্য নিউইয়র্ক টাইমস'-এর প্রচার সংখ্যা ছিল ১১ লাখ। বছর কয়েক ধরে তা কমে ৯ লাখে দাড়িয়েছে। এতেও যখন কুলোচ্ছেনা তখন পত্রিকার ব্যয় সংকোচ এবং পাঠকের কাছে আরো আর্কষণীয় করার জন্য পত্রিকাটির ব্রডশীট সাইজের আয়তনও কমিয়ে ফেলা হয়েছে। টিভি কম্পিউটারসহ নানা মাত্রিক বহু প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে যন্ত্রবত (mechanical) মার্কিন সমাজে পড়ার ক্ষেত্রে এক অবক্ষয়ের শুরু এটি। কিন্তু যেখানে প্রকৃত শিক্ষিত ও সচেতন নাগরিক আছেন, যন্ত্রপাতি ব্যবহারের বদলে পাঠের ক্ষুধা রয়েছে, পড়তে না পারার বেদনা ও অতৃপ্তি রয়েছে সেখানে পত্রিকার বাজার ও চাহিদা এখনও ব্যাপক ও বিস্তৃত। যেমন জাপান, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, সুইজারল্যাণ্ড অথবা বাড়ির কাছের ভারত। জার্পানীরা যন্ত্রবিদ্যায় ব্যাপক পারদর্শী ও সংশ্লিষ্ট। কিন্তু আমেরিকানদের মতো তাঁরা কেবল গড়ে প্রতিদিন ১৮ মিনিট পত্রিকা পড়ায় যে ব্যয় করেন তা নয় এবং এই বিষয়টা একটি উদাহরণ দিলেই স্পষ্ট। সেদেশের প্রধান ও দ্বিতীয় সেরা পত্রিকা আসাহি শিম্বুন (Asahi Shimbun) ও ইওমিউরি শিম্বুন (Yomiuri Shimbun) পত্রিকার সার্কুলেশন নয় নয় করেও এক কোটিরও বেশি। অর্থাৎ ওঁরা পড়তে ভালোবাসে। বাংলাদেশে এখন স্বাক্ষরতার হার ৬০ শতাংশের ওপর, অতএব শিক্ষিতের হারও বেশি। বুঝের পাঠকও (cirtical reader) বেশ বেড়েছে, অতএব নতুন নতুন পত্রিকা এখনও এখানে চলবে। তবে পাঠের বিষয়বস্তু কি হওয়া উচিত তা পত্রিকা প্রকাশের আগেই জরীপ করে জেনে নেয়া উচিত।

**ক.২. পত্রিকার বিষয়বস্তু :** পত্রিকার পাঠককে ধরা এবং ধরে রাখার জন্য শুধু ভালো ভালো সংবাদ কভারেজই মুখ্য নয়, অন্যান্য রিডিং ম্যাটেরিয়াল্সও জোগাতে হবে। কোন্ শ্রেণীর পাঠক ধরতে চাই তার ওপর ভিত্তি করে পত্রিকার



www.pathagar.com

সম্ভাব্য বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা উচিত। পাঠক ধরার জন্য ভালো সংবাদ কভারেজ এবং তার চমৎকার পরিবেশনা, জোরদার সম্পাদকীয়, সুখপাঠ্য, তথ্যবহুল ও বিশ্লেষণী উপসম্পাদকীয় ও কলাম এবং বাহারী বিষয়ের বাহারী লেখার প্রয়োজন। কোনও সন্দেহ নেই, সব পত্রিকাই খবর হিসেবে রাজনীতিকেই প্রাধান্য দেবে। তবে তার সঙ্গে থাকবে অর্থনীতি, সামাজিক সাংস্কৃতিক ও উন্নয়ন সংবাদ, ক্রীড়া, বিনোদন, অপরাধ, বিজ্ঞান, সাফল্য প্রভৃতি। তবে সেই সংবাদ যথাযথ কভার করা হচ্ছে কিনা, পরিবেশন যথাযথ না দায়সারা হচ্ছে তা খতিয়ে দেখা দরকার। আমাদের এখানে অনেক ভালো সার্কুলেশনের পত্রিকার সংবাদ কভারেজ ততোটা মানসম্মত নয়। সংবাদযোগ্য নয় এমন বারোয়ারি বিষয় দিয়ে পত্রিকার প্রথম পাতাকে পড়ার অযোগ্য করে তোলা হচ্ছে, তবে সংবাদ কভারেজটাই পত্রিকার মুখ্য হওয়া উচিত। এখন তো ব্যাপক হারে বিজ্ঞাপন দিয়ে পত্রিকার প্রথম পাতাকে পড়ার অযোগ্য করে তোলা হচ্ছে আমাদের দেশে। তবে শুধু সংবাদ নয়, সংবাদের বাইরে সংবাদবিষয়ক কলাম, ভাষ্য, উপসম্পাদকীয় এমনভাবে সাজাতে হবে যে আপনার স্থিরীকৃত পাঠককূল ব্যাপক সংখ্যায় তা পড়বে। এর বাইরে এমন একটি বিরাট পাঠকগোষ্ঠী আছে যাঁরা সংবাদ ও সংবাদভাষ্য নিয়ে তেমন উৎসাহী নয়, বিশেষ করে তরুণ শ্রেণী, তাঁদের মনমানসিকতা দ্রুত পরিবর্তনশীল। একই বিষয় এবং একই আঙ্গিক বা স্টাইলের পরিবেশনা তাঁরা পছন্দ করে না। সনাতনী, সার্বজনীন ও সর্বকালীন বিষয়সমূহের সঙ্গে নতুন নতুন বিষয় নতুন ফর্মে এবং নতুন স্টাইলে পরিবেশন করতে হবে। তবে এর মানে এই নয় মার্কিনী স্টাইলে আমাদের পত্রিকাগুলোর পরিবেশন 'ড্রামাটাইজ্‌ড' ঢংয়ে করতে হবে। বাংলাদেশে সে অবস্থা এখনও আসেনি। কি কি বিষয় কভার করবো, কোন ঢংয়ে করবো তা জানার জন্য পাঠক চাহিদা জরীপ করতে হবে। একটা বিষয় মানতে হবে, যুগের দাবির প্রেক্ষাপটে পাঠক ও তাঁদের চাহিদা নিরূপণ করতে পারলে পত্রিকার সার্কুলেশন ক্রমান্বয়ে বাড়বে এবং সেভাবে রিডারশীপও বাড়বে। পাঠক জরীপ করে পত্রিকা বের করার রীতি আমাদের দেশে এখনও তেমন তৈরি হয়নি। তবে দু'একটি পত্রিকা গবেষণা করে পত্রিকার সমস্যা সম্ভাবনা এবং পাঠের বিষয় শনাক্ত করে তাঁদের পত্রিকা নতুন করে সাজাচ্ছেন। দেশে বুঝের পাঠকের (Critical reader) সংখ্যা ও মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়লেও রিডারশীপ সে হারে বাড়েনি, কিন্তু পত্রিকার সংখ্যা বাড়ছেই, তাই প্রতিযোগিতা বেশ তীব্র, অতএব সফলতা অর্জন করতে হলে জরীপ ও গবেষণা করে মাঠে নামাই ভালো। পরিকল্পনা ছাড়া হুটহাট করে পত্রিকা প্রকাশ বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ পত্রিকা প্রকাশ শুধু ব্যবসা নয়, সামাজিক দায়িত্বও বটে।

**খ. সার্কুলেশন বা বন্টন নেটওয়ার্ক :** কোনও পত্রিকার স্বাস্থ্যসম্মত প্রচারসংখ্যা ও রিডারশীপ নির্ভর করে পত্রিকার বন্টন ব্যবস্থার নেটওয়ার্কটি কেমন তার ওপর।



www.pathagar.com

কাঙ্খিত পাঠকের কাছে অন্য পত্রিকাগুলোর চেয়ে আগেই পৌছে যাওয়ার জন্য বিলিবন্টন ব্যবস্থা অনেক নিখুঁত, মসৃন ও দ্রুততর হতে হবে। এজন্য পত্রিকার নির্ধারিত 'ডেডলাইন' দু'একদিনের ব্যতিক্রম ছাড়া, সবসময়ই অটুট রাখার চেষ্টা করতে হবে। ডেডলাইনের সীমারেখাটা মাঝে মধ্যেই ভেঙ্গে গেলে আপনার পাঠক প্রতিদিন সকালের একটি সুনির্দিষ্ট সময়ে পত্রিকা পেতে ব্যর্থ হবে। এতে একসময় সার্কুলেশন কমবে, কমবে রিডারশীপ এবং বিজ্ঞাপন দাতারাও তাদের বিজ্ঞাপনী বার্তা অস্থির রিডারশীপের কাছে পৌছে দিতে আগ্রহী হবে না। মনে রাখতে হবে ডেডলাইন অক্ষুন্ন রাখার জন্য কতগুলো শর্ত কাজ করে। যেমন সংশ্লিষ্ট পত্রিকাটির মুদ্রাযন্ত্রের মুদ্রণক্ষমতা কেমন, পত্রিকাটির সার্কুলেশন ও রিডারশীপ যথেষ্ট সুদৃঢ় (Sound) কিনা, পত্রিকাটির বিলিবন্টন ব্যবস্থা নিখুঁত কিনা, পত্রিকাটির বিভিন্ন বিভাগের আন্তঃসম্পর্ক চমৎকার কিনা এবং পত্রিকাটির লোকবল সুদৃঢ় কিনা। পত্রিকা মুদ্রণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা যেন সংশ্লিষ্ট পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে দ্রুত যথাস্থলে পৌছে দেয়া যায় তার জন্য পত্রিকার সার্কুলেশন বিভাগকে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পরিবহন কোম্পানীর সঙ্গে ভালো কাজের সম্পর্ক ও চুক্তি করে নিতে হবে। হকার এজেন্সী ও একক হকারদের সঙ্গে উষ্ণ সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। হকার বা এজেন্সী ছাড়াও নিয়মিত গ্রাহকদের জন্যও মাঝে মাঝে ইনসেনটিভ্সের ব্যবস্থা করতে হবে। পত্রিকার পরিবহন ব্যবস্থা যদি নিজস্ব হয় তাহলে পাঠকের কাছে ঠিক সময়ে পৌছে যাওয়া অনেকটা নিশ্চিত হয়। ঢাকার বাইরের পত্রিকা *দৈনিক করতোয়া* এই ব্যবস্থা করে অনেক আগেই যথেষ্ট সফলতা পেয়েছে। স্থানীয় সাংবাদিকরাই যদি পত্রিকার এজেন্সীর দায়িত্ব নেন, তাহলে দুদিক থেকেই ভালো। তারা সংবাদও পাঠাচ্ছে আবার পত্রিকা বিক্রির দায়িত্বও পালন করছে। এতে করে পত্রিকার খুব অল্প সংখ্যক কপিই অবিক্রিত থাকবে। এই ব্যবস্থায় সার্কুলেশন বিভাগ আগাম জানতে পারবেন কোন এলাকায় আজ কতসংখ্যক কপি চলবে।

**গ.১. সংবাদপত্রের পুঁজি বা মূলধন :** একুশ শতকে এসে সংবাদপত্র আর ছোটোখোটো উদ্যোগ নয়, এ এক বিশাল ব্যাপার, সে জন্যে প্রয়োজন বিশাল পুঁজির। এখন আর লক্ষ টাকার হিসেবে পত্রিকা চলেনা। এ এখন বিশ পঞ্চাশ একশ কোটি টাকার মামলা। এক সঙ্গে ২৪ পৃষ্ঠা মুদ্রণ করতে পারে এরকম মুদ্রাযন্ত্রের দামই হয়তো বিশ তিরিশ কোটি টাকা। এর বাইরেতো পত্রিকার অফিস, ব্যবস্থাপনা, তথ্য সংগ্রহের নেটওয়ার্ক, সাংবাদিক কর্মচারীর বেতনভাতার জন্য বিপুল অংকের অর্থ ব্যয় করতে হবে। এই কাড়ি কাড়ি টাকা কোত্থেকে আসবে! নিজের পকেট থেকে পুরো টাকা দিয়ে পত্রিকা প্রকাশ করা আজকাল একটি অলীক কল্পনা মাত্র। অতএব একাধিক উৎস থেকে মূলধন গঠন করতে হবে। বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মানসিকতা এখনও এমন তৈরি হয়নি যে তারা পত্রিকাগুলোকে ঋণ দেবে। কারণ পত্রিকাশিল্পকে ব্যাংকগুলো এখনও



www.pathagar.com

লাভজনক, স্থিতিশীল ও নির্ভরযোগ্য শিল্প মনে করে না। তবে পত্রিকার নিজস্ব ভবন কিংবা স্থাবর সম্পত্তির বিপরীতে তারা ঋণ দিয়ে থাকে। তবে এই মূলধন তৈরি হতে পারে ব্যাংক ঋণ থেকে, নিজের পকেট থেকে, অংশীদারদের কাছে থেকে অথবা পত্রিকা প্রকাশেচ্ছু ব্যক্তির অন্য ব্যবসায় খাত থেকে। বিদেশে পত্রিকার পুঁজি অনেক সময় পত্রিকার অ্যাসোসিয়েটস্‌রাই জুগিয়ে থাকে। দুর্ভাগ্য এখানে, পত্রিকা বা টিভি চ্যানেলের 'অ্যাসোসিয়েটস্' আমাদের দেশে এখনও তৈরি হয়নি। এ প্রেক্ষাপটে পুঁজির বিরাট অংশ সংগ্রহ করতে হবে এই ব্যবসা করতে ইচ্ছুক অংশীদারদের মাধ্যমে।

**গ.২. অংশীদারিত্ব :** বর্তমান জমানায় পত্রিকার মালিকানায় অংশীদারিত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আজকাল এককভাবে পত্রিকা প্রকাশ করা খুবই কঠিন। বড় বড় পত্রিকাতো আন্তমহাদেশীয় স্তরেও অংশীদারিত্ব ব্যবস্থার মাধ্যমেও প্রকাশ হয়ে চলছে। পত্রিকার মালিকানায় অংশীদারিত্ব শুধুমাত্র পুঁজি গঠনের ক্ষেত্রেই নয়, পত্রিকা পরিচালনার ক্ষেত্রেও অংশীদারিত্ব ব্যবস্থা চালু হয়ে গেছে। পুঁজির অংশীদার সবাই সমান হয়না। মুনাফার ভাগ কারো জন্য ৫০ শতাংশ, কারো ২৫ শতাংশ। আবার কেউ পুঁজির অংশীদার না হয়েও কাজের অংশীদার হয়ে মুনাফার ভাগীদার হতে পারে। বিদেশে অনেক পত্রিকা পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হয়ে যাচ্ছে, শেয়ার ছাড়া হচ্ছে, সাধারণ জনগণও মুনাফার ভাগীদার হচ্ছে। পুঁজি জোগাতে না পারলেও কেউ কাজের ভাগীদার হয়ে মুনাফার বিশ পঁচিশ শতাংশের ভাগীদার হতে পারেন। একজন টাকা দিতে পারেন। আরেকজন দিতে পারেন মাথা। ব্যবস্থাপনার সমস্যা দেখা দিলে দুই বা ততোধিক মাথার চিন্তা অনেক বেশি কার্যোপযোগী ও সুফলদায়ী হতে পারে।

**গ. ৩. ব্যবস্থাপনার অংশীদারিত্ব :** একজন পুঁজির অংশীদার হয়ে অথবা না হয়েও ব্যবস্থাপনার অংশীদার হতে পারেন। যিনি পুঁজির ৫০ শতাংশ জোগালেন তিনি হয়তো ব্যবস্থাপনাটা বোঝেন না। অথচ এমনও হতে পারে যে একজন মাত্র পাঁচ শতাংশ পুঁজি জোগালেন তিনি ব্যবস্থাপনাটা ভালো বেঝেন। অতএব তাঁকে ব্যবস্থাপনার গুরুদায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। পত্রিকার অনেক বিভাগের মধ্যে কতগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে প্রশাসন অন্যতম। কম পুঁজির অংশীদার হয়তো এ বিভাগটি দেখাশোনা করতে পারেন, যদি তাঁর সেই গুণটি থাকে। অপরদিকে আরেকজন হয়তো সংবাদ ও সংবাদ বিষয়গুলোর তদারকি ভালো বোঝেন। আরেকজন সংবাদপত্রের 'ডিসপ্যাচ এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন' ভালো বোঝেন। অংশীদারিত্ব অথবা মুনাফার ভিত্তিতে কাজের এই বিভাজন খুবই কার্যকর। সাম্প্রতিক সময়ে যৌথ অংশীদারিত্বের সংবাদপত্র অনেক বেশি করে সাফল্য লাভ করছে।



www.pathagar.com

**গ. ৪. লোকবল বা বিভাগের ব্যবস্থাপনা :** অংশীদারিত্বের একটি হচ্ছে কাজের সম্পর্ক। এই প্রক্রিয়ায় মালিক বা প্রকাশকেরা নিজে বা অন্য লোক লাগিয়ে বিভিন্ন বিভাগের ব্যবস্থাপনা করে থাকেন। প্রশাসন বা দু'একটি বিভাগের কথাতো আগেই বলেছি। মেকানিকাল বিভাগ হচ্ছে আরেকটি বিভাগ যেটির ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে করাটাই একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। মেকানিকাল সেকশনে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা সাংবাদিকদের মতো শিক্ষিত নাও হতে পারেন। রাতের পর রাত সেখানে কাজ করে তাঁদের মনের অবস্থা সব সময় ঠিক থাকে না। তাঁদের উৎফুল্ল রাখাটা একটি জরুরী বিষয়। এছাড়া এখানে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা টেকনিক্যালী খুবই সাউন্ড হবেন। তাই এ বিভাগে বেশি সংখ্যক লোকজন দরকার নেই, দরকার হলো লোকবল। এই লোকবল খুঁজে বের করতে হবে এবং সেই বলকে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে হবে; প্রযুক্তির দ্রুত আধুনিকায়ন হওয়ায় পত্রিকা শিল্পের লোকবল আর সংখ্যায় নয় বরং কাজের দক্ষতার নিরিখে তাঁদের বলের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। কেমনটা হওয়া উচিত মেশিনের বল?

**গ.৫. মেশিনের বল :** প্রযুক্তির দ্রুত উন্নয়নের ফলে সংবাদপত্রগুলো প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে নতুন নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করেছে। এটা করতে গিয়ে লাগসই লোকবল দরকার, বিশেষ করে মেকানিক্যাল সেকশনের। সেই লোকবল যাতে প্রযুক্তির প্রয়োগ ভালোভাবে করতে পারেন সেজন্য তারা আগে থেকেই দক্ষ হবেন, অথবা দক্ষ না হলে তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ বানাতে হবে। একটি প্রিন্টিং মেশিন ঘন্টায় কত কপি ছাপতে পারে সেটি যেমন একটি দিক, আর সেই মেশিন চালনার দক্ষ লোক আপনি জোগাড় করতে পারবেন নাকি প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে নিতে পারবেন কিনা সেটাও আরেকটি দিক। প্রিন্টিং সেকশনের মেশিন ও লোক বলের ওপর নির্ভর করে পত্রিকার 'ডেডলাইন' সমুন্নত রাখা এবং ডেডলাইন এগিয়ে আনার অথবা পিছিয়ে নেয়ার যৌক্তিকতা। মেশিন যদি কম্পিউটার চালিত হয় তাহলে কমসংখ্যক লোক লাগবে কিংবা সেই কাজ পরিচালনার জন্য দক্ষ লোকবল লাগবে। যদি এমন হয় ঘন্টায় ২০ পাতা ছাপতে পারে এমন মেশিনের তিনটি ইউনিট থাকে তবে সেটি ৬০ পাতা ছাপতে পারবে। এখন ৬০ পাতা ছাপার মেশিন আপনার থাকবে কিনা, থাকলে তা পরিচালনার দক্ষ লোকবল আপনার থাকবে কিনা। অপর দিকে পত্রিকা অফিসে ৬০ পাতা বের করার মতো বিষয়বস্তু শনাক্ত ও লেখার লোক আপনার আছে কিনা। এটাও ভাবতে হবে ৬০ পাতা পড়ার রিডারশীপও আপনার তৈরি হবে কিনা। আবার ৬০ পাতা হলে তার মুদ্রণ খরচ বেশি হবে পত্রিকার দামও একটু বেশি হবে; তা ক্রয়ের সামর্থ্য পাঠকের আছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা দরকার।

**ঘ.১. সম্পাদকীয় নীতি :** আমাদের দেশের পত্রপত্রিকাগুলোর লিখিত সম্পাদকীয় নীতি প্রায় নেই বললেই চলে। তবে ইদানিং তা আগের তুলনায় অনেকটা স্পষ্ট। রাজনীতি বা 'সরকার বিরোধিতা' হচ্ছে পত্রিকার একধরনের উপজীব্য বিষয়। তবে


www.pathagar.com

এটাকে 'সরকার বিরোধিতা' না বলে সরকারের কিছু কার্যক্রমের বিরোধিতা বলাটাই সমীচীন, কিন্তু যুক্তিহীন বিরোধিতা করা হবে কিনা সেই নীতি এখনও স্পষ্ট নয়। পুঁজিবাদী ও ভোগবাদী সমাজ ব্যবস্থায় নিজের স্বার্থ অর্জনের জন্য সরকারের লোকজনের ক্ষমতার অপব্যবহার, ন্যায়বিবর্জিত কর্মকান্ডের বিষয়গুলো পত্রিকার জন্য দারুণ পাঠোপযোগী বিষয়। সরকারের দুর্নীতি, অপরাধ, সরকারি লোকজনের কর্মে শৈথিল্য, অর্থ ও যৌন কেলেংকারী প্রভৃতি বিষয়গুলোর উন্মোচন সাধারণ পাঠক দারুণভাবেই চান। ঠিক আছে, সরকারের স্খলণগুলো আমি তুলে ধরবো; কিন্তু সেটা আমার নির্ভেজাল মুনাফার স্বার্থে নাকি সামাজিক কিছু অঙ্গীকারের প্রশ্নে? লক্ষ্য যদি হয় স্রেফ মুনাফা, তাহলে পত্রিকা না খুলে ভোগ্যপণ্যের ব্যবসা করাই ভালো।

'ইনফরমেশন টেকনোলজির' কল্যাণে তথ্য অনেক সহজলভ্য হওয়ায় ইদানিং সব টেলিভিশন চ্যানেলেতো বটেই, পরেরদিন পত্রিকাতেও প্রায় একই ধরনের খবর পাওয়া যাচ্ছে, পাঁচ সাত দশ বছর আগে বিভিন্ন পত্রিকায় যে হারে একান্ত খবর (Exclusive) পাওয়া যেতো, সেটা আর দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু 'Biting journalism'-এর জন্য একান্ত সংবাদ আরো বেশি করে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। এ সকল ব্যাপারে স্পষ্ট সম্পাদকীয় নীতি থাকা প্রয়োজন, গতানুগতিক হলে সার্কুলেশন ও রিডারশীপ বাড়বেনা।

**৬. বিজ্ঞাপনী নীতি :** আমাদের দেশের পত্রপত্রিকাগুলো একটা সময় সরকারি বিজ্ঞাপনের ওপর দারুণভাবে নির্ভরশীল ছিল। সংশ্লিষ্ট সব সরকারই তাই বিজ্ঞাপনকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতো। এখনও যে হয় না তা নয়। তবে সংবাদপত্রের পুঁজি এখন সরকারের হাত থেকে অনেকাংশে কর্পোরেট এজেন্সীর কাছে চলে গেছে। কর্পোরেট ও অন্যান্য বেসরকারি এজেন্সীগুলো এখন বিজ্ঞাপন দিয়ে এমনভাবে 'ডমিনেট' করছে যে পত্রিকাগুলো নিজেদের নয়, তাদের অধীন হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে পত্রিকাগুলোর প্রথম পাতা ওই এজেন্সীগুলোর বিজ্ঞাপনে এমনভাবে ঢেকে যাচ্ছে যে সত্যিকারের পাঠককূল আর তেমন সংবাদ পাচ্ছেন না, পাচ্ছেন ঢাউশ ঢাউশ ডিসপ্লে বিজ্ঞাপন। 'বাণিজ্য' প্রধান হয়ে যাওয়াতে পত্রিকার প্রথম পাতার চরিত্র এখন 'খবর পাতা' না হয়ে 'বিজ্ঞাপন পাতা' হয়ে যাচ্ছে। পত্রিকা প্রকাশে ইচ্ছুক একজন কি তাই করবেন নাকি প্রথম পাতাকে ফের সংবাদোপযোগী করবেন? প্রথম পাতার মোট মুদ্রণ এলাকার (Print area/ life area) কমপক্ষে ৪০ শতাংশ খবরের জন্য বরাদ্দ করতে হবে। আর বাকি ৬০ শতাংশ বিজ্ঞাপন, ছবি এবং নেমপ্লেটসহ বিভিন্ন স্ট্যান্ডিং ম্যাটারের জন্য বন্টন করে দেওয়া উচিত। কিন্তু আমরা দেখছি প্রথম পাতার ১৫, ২০ বা বড়জোর ৩০ শতাংশ খবরের জন্য বরাদ্দ করা হচ্ছে, এটি দেখে মনে হয় আমরা কি একুশ শতকে আছি নাকি ১৭৮০ সালে জেমস্ অগাস্টাস হিকির 'বেঙ্গল গেজেট'এর যুগে ফিরে গেছি, যে সময় প্রথম পাতা স্রেফ বিজ্ঞাপনের জন্যই বরাদ্দ ছিল। প্রথম পাতার সীমিত জায়গার কারণে স্থান সংকুলান না হওয়া সত্বেও অনেক বেশি



www.pathagar.com

আইটেম দিয়ে তা দ্বিতীয় পাতায় কিংবা শেষ পাতার আগের পাতায় জাম্প দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। জাম্পের ব্যাপারে পাঠকরা কতখানি যে বীতশ্রদ্ধ তা পত্রিকার প্রকাশকরা কখনও জরীপ করে দেখেছেন কি! নতুন প্রকাশকের এ ব্যাপারে একটা সম্পাদকীয় নীতি ও বিজ্ঞাপনী নীতি তৈরি করে নেয়া উচিত। পাঠককে বিজ্ঞাপনের ফাঁকে সংবাদ দেবার প্রতারনার কৌশল নিয়ে মাঠে না নামাই ভালো।

**চ. ম্যাস মিডিয়াম নাকি টার্গেট** (Target medium) : কিছু কিছু পত্রিকা আজকাল দিনের প্রথমভাগে দুই, তিন, বড়জোর পাঁচ টাকায় বিক্রি হচ্ছে এবং জনগণ তা কিনছেও। ওই পত্রিকাগুলোর দু'একটি Exclusive আইটেম বেশ ভালো। জনগণ রাতের বেলা টিভি চ্যানেলে অনেক কিছু দেখছে আর দিনের বেলা ১০ টাকার বদলে ২ টাকায় পেলে তাঁরা তা কেন কিনবেনা, কিন্তু প্রশ্ন হলো, ওই পত্রিকাগুলো কি ম্যাস মিডিয়াম নাকি 'টার্গেট মিডিয়াম'? বিদেশে কিন্তু এব্যবস্থা ইতোমধ্যেই চালু হয়ে গেছে। পত্রিকা বিক্রি করে কিন্তু তেমন রাজস্ব পাওয়া যায় না। তাই অনেক পত্রিকা কর্তৃপক্ষ পত্রিকা বিনামূল্যে বিতরন করে। কিন্তু তাঁদের লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের একটি টার্গেট গ্রুপকে পাঠক হিসেবে ধরা এবং সেই টার্গেট গ্রুপের কাছে যে সকল বিজ্ঞাপনদাতা তাঁদের দ্রব্য ও সেবার বার্তা পৌঁছে দিতে চান তাঁদের স্বার্থ প্রতিপালন করা। তবে এই শ্রেণীবদ্ধ গ্রুপটিকে খুবই সুক্ষ্মভাবে শনাক্ত করতে হবে। পশ্চিমা বিশ্বে এই রকম Highly classified গ্রুপ পাওয়া যায় যাঁরা শুধু বিনামূল্যে পত্রিকা পড়েন না, পত্রিকার উন্নতির জন্য অবদানও রাখেন। আমাদের দেশে এরকম ব্যবস্থা এখনও চালু হয়নি। তবে দু'একটি নামী পত্রিকার ধরন দেখে বোঝা যায়, তারা সংবাদ কভারেজে ততটা মনোযোগী নন, যতটা মনোযোগী একটি টার্গেট গ্রুপকে ধরে রাখতে পারে এমন 'রিডিং ম্যাটেরিয়াল' দেয়ার ক্ষেত্রে। তবে পত্রিকা বাড়ছে প্রতিযোগিতাও বাড়ছে অতএব বড় বড় পত্রিকাগুলো যদি ক্রয়মূল্য আরো কমিয়ে দেয় তাহলে আশ্চর্য হবার কারণ থাকবে না। একজন নতুন প্রকাশক এ বিষয়টি একটু খতিয়ে দেখতে পারেন। যদিও আমাদের দেশের পাঠক-কূল 'টার্গেট গ্রুপ' নন বরং তাঁদের একটি 'পপুলার ক্যারেক্টর (Popular Character) আছে, অর্থাৎ পত্রিকার বিষয়বস্তু ছেলেবুড়ো, নারী পুরুষ, ছাত্রছাত্রী সবাইকে সন্তুষ্ট করতে চায়। ফলে পত্রিকার বিষয়বস্তু অনেকাংশে একটা অদ্ভুত মিশ্রণের রূপ ধারণ করে। তাই আগেই ঠিক করে নেয়া ভালো আপনার পত্রিকা Mass medium নাকি Target medium হবে।

**পরিশেষ :** একজন নতুন প্রকাশকের জন্য কিছু প্রাকভাবনা দরকার। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে কিছু ভাবনা উস্‌কে দেওয়া হলো। চিন্তা করলে আরো ভাবনা তৈরি হবে। এই ভাবনাগুলোকে বিচারবিশ্লেষণ করে তার অনেকগুলোকেই একেকটি সিদ্ধান্তে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। আর এর ফলে একদিকে ব্যবসাও হবে, আর হবে সামাজিক অঙ্গীকার পালন। তাতে পত্রিকা আজ কাল পরশু প্রতিদিনই বাজারে বিকোবে।

*সূত্র : বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের জার্নাল 'নিরীক্ষা'য় প্রকাশিত।*



www.pathagar.com

# জাতীয় দৈনিকের মফস্বল পাতা

## পটভূমি

মাত্র ক'মাস আগেই আমরা নতুন শতাব্দী ও সহস্রাব্দে প্রবেশ করেছি। গত শতাব্দীর শেষভাগে বাংলাদেশের সংবাদপত্র শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার শুরু হয়েছে। বিশেষ করে গত দু'টি দশকে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের ফলে বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলোর সংবাদ ও ভাষ্যের বিষয়-বৈচিত্র্য ও পরিবেশনে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। প্রযুক্তিগত ও বিশ্বব্যাপী সামাজিক পরিবর্তন এবং একই সঙ্গে তৈরি হয়ে যাওয়া নতুন প্রজন্মের পাঠকের রুচি ও চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পত্রিকার সম্পাদকগণ তাঁদের পত্রিকায় নতুন নতুন বিভাগ খুলছেন। খবরের বিষয় নির্বাচনে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছেন। পাশাপাশি সংবাদ পরিবেশনেও পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছেন। কিন্তু লক্ষ করা গেছে যে, পত্রিকাগুলোর অন্যান্য পাতার তুলনায় মফস্বল পাতায় এখনও তেমন একটা পরিবর্তন আসে নি। অন্যান্য বিভাগের তুলনায় মফস্বল পাতার পাঠকও তেমন তৈরি হয়নি। পাঠক তৈরি না হওয়াতেই সম্ভবত এ পাতায় ডিসপ্লে ধরনের বিজ্ঞাপন দেয়ার মতো ইচ্ছা বা প্রবণতা বিজ্ঞাপনদাতাদের তৈরি হয় নি।

সে প্রেক্ষাপটে জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলোর মফস্বল পাতার স্বরূপ কি তা তুলে ধরে তার সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে পিআইবি'র প্রশিক্ষণ বিভাগ ঢাকা'র কয়েকটি নির্বাচিত জাতীয় দৈনিকের মফস্বল সম্পাদকদের জন্য একটি কর্মশালার আয়োজন করেছে। বিষয়বস্তু হচ্ছে জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলোর মফস্বল পাতা (বিষয়বস্তু, পাঠক ও পরিকল্পনা)। কর্মশালার অংশ হিসেবে পিআইবি ঢাকা'র সাতটি নির্বাচিত দৈনিকের মফস্বল পাতার বিষয়বস্তু বিশ্লেষণভিত্তিক একটি সমীক্ষা রিপোর্ট উপস্থাপন করছে।

## লক্ষ্য

সমীক্ষা-প্রকল্পের আওতায় ঢাকা'র কিছু নির্বাচিত দৈনিকের মফস্বল পাতা (বিষয়বস্তু, পাঠক ও পরিকল্পনা) সম্পর্কে উপলব্ধির চেষ্টা করা হয়েছে। সমীক্ষায়



www.pathagar.com

মূলত মফস্বল পাতার খবরের বিষয়বস্তু, এর ধরন-ধারণ ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানামাত্রিক দিকও তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি পাতায় শুধু খবরই থাকে না, বিজ্ঞাপন ও ছবির ব্যবহার থাকে, রঙের ব্যবহার থাকে। আরও অনেক কিছু থাকে। বস্তুত একটি পাতায় খবর ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উপাদান ব্যবহার করে পাতাটিকে পাঠকের রুচি ও চাহিদামাফিক সাজানো হয়। এ প্রেক্ষাপটে মফস্বল পাতার খবরের ধরন, খবরের বিষয় ও বৈচিত্র্য, ভাষা, সম্পাদনা, শিরোনামের ব্যবহার, ট্রিটমেন্ট, লে-আউট, ডিজাইন, ছবি ও রঙ প্রভৃতির ব্যবহার সম্পর্কে বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে গণযোগাযোগের ক্ষেত্রে সুষম তথ্য প্রবাহ নিশ্চিতকরণ ও বৈষম্য নিরসনের প্রশ্নটি বেশি করে আলোচিত হচ্ছে। বাংলাদেশে গণমাধ্যমকে কার্যকর এবং প্রকৃত অর্থেই গণমানুষের মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। শুধু আন্তর্জাতিক সংবাদ প্রবাহের ক্ষেত্রেই নয়, জাতীয় ও আঞ্চলিক সংবাদের সুষম প্রবাহের লক্ষ্যে গণমাধ্যমের বিকাশ ও উন্নয়নের প্রশ্নটিও বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে।

বাংলাদেশে ইলেকট্রনিক মাধ্যম বিশেষত টিভি'র দর্শকসংখ্যা জ্যামিতিক হারে বাড়লেও সংবাদপত্রের পাঠকের সংখ্যা সেই হারে বাড়ছে না। কিন্তু গ্রামীণ জনগণের সঙ্গে সরকারের যোগসূত্র স্থাপন কিংবা গ্রাম ও শহরের মধ্যে দ্বিমুখী যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে সংবাদপত্রগুলোর এখনও বড় ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে। জাতীয় সংবাদপত্রে মফস্বল শহর ও গ্রামসমূহের জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট খবর কতটুকু থাকে, গ্রামের জনগণের দৈনন্দিন জীবন, তাদের উন্নয়ন কার্যক্রম, তাদের সমস্যা, তাদের সংকট ও সম্ভাবনা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা কতটুকু থাকে তা বিশ্লেষণ করাই এই সমীক্ষার লক্ষ্য।

**উদ্দেশ্য**

আমাদের দেশের জাতীয় দৈনিকগুলোতে মফস্বলের খবর তেমন গুরুত্ব পায় না। খুব দায়সারাভাবে মফস্বলের খবরকে পত্রিকার কোনও সুনির্দিষ্ট পাতায় অথবা ছড়িয়ে ছিটিয়ে স্থান করে দেয়া হয়। ঢাকা'র ছোট্ট একটি খবরও পত্রিকার প্রথম পাতায় স্থান লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করে অথচ মফস্বলের অনেক গুরুত্বপূর্ণ খবর, যা জাতীয় জীবনেও প্রভাব ফেলে, সেগুলোর ঠাঁই প্রথম পাতায় হয় না।

নতুন শতাব্দীতে পৌঁছে পত্রিকাগুলো যেমন একে অপরের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতায় নিয়োজিত তেমনই সম্ভাবনাপূর্ণ পাঠক ধরা বা তৈরি করা এবং তাদের ধরে রাখার জন্য নতুন-নতুন আকর্ষণীয় বিষয় নির্বাচন ও পরিবেশনে সদা ব্যস্ত। একসময় যেমন প্রথম পাতাই কেবল গুরুত্ব পেত, এমনকি প্রথম পাতায় উপরে ফোল্ডের অংশই গুরুত্ব পেত এখন সেদিন চলে গেছে। এখন সব পাতার গুরুত্বই সমান।


www.pathagar.com

এমনকি চিঠিপত্রের পাতা বা কলামকেও আরও সুখপাঠযোগ্য ও আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা হচ্ছে। একইভাবে মফস্বল পাতাকেও আরও পাঠযোগ্য ও আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে।

সেজন্য মফস্বল পাতার সম্পাদকদের কাজের দৃষ্টিভঙ্গি যদি পাল্টায় তাহলে খবর সংক্রান্ত ব্যতিক্রমী বিষয় ও ছবি নির্বাচন, লে-আউট, ডিজাইন, ট্রিটমেন্ট ও পরিবেশন সম্পর্কেও ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবেন বলে আশা করা যায়। নিজেদের পাতা সম্পর্কে যদি মফস্বল সম্পাদকরা আরও সচেতন হন, পাঠকের চাহিদা অনুসারে যদি তাঁরা যথাযথ জিনিস সরবরাহ করতে সফল হন তাহলে মফস্বল পাতার পাঠকও হয়তো বাড়বে, এমনকি বিজ্ঞাপনদাতারাও মফস্বল পাতায় বিজ্ঞাপন দিতে কুণ্ঠাবোধ করবেন না। অন্যদিকে মফস্বল সম্পাদকদের কর্মদক্ষতা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মফস্বল সাংবাদিকরাও মফস্বল অঞ্চল থেকে যথাযথ সংবাদ ও ছবি সংগ্রহ, যথাযথ সংবাদ নির্বাচন ও কভারেজ করতে পারবেন।

## সমীক্ষাভুক্ত পত্রিকা ও কাজের ব্যাপ্তি

সমীক্ষা কাজটিকে যথাসম্ভব প্রতিনিধিত্বমূলক ও সাধারণভাবে গ্রহযোগ্য করার জন্য ঢাকা'র সাতটি জাতীয় দৈনিকের মফস্বল পাতা সমীক্ষা কাজের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। প্রচারসংখ্যা, পঠনোপযোগিতা ও বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠক সমাদৃতার দৃষ্টিকোণ থেকে যে পত্রিকাগুলো ঢাকা'র দৈনিকগুলোর মধ্যে নেতৃস্থানীয় সেগুলোকেই সমীক্ষার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচিত সাতটি দৈনিকের মধ্যে পাঁচটি বাংলা এবং দুটি ইংরেজি। নির্বাচিত পত্রিকাগুলো হচ্ছে দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক সংবাদ ও দৈনিক প্রথম আলো এবং দ্য বাংলাদেশ অবজারভার ও দ্য ডেইলি স্টার।

জরিপ কাজের জন্য ১৯৯৯ সালের নভেম্বর মাসের ১ থেকে ১৫ তারিখ পর্যন্ত প্রকাশিত সাতটি পত্রিকার ওপর সমীক্ষাকর্মটি পরিচালিত হয়েছে। যে বিবেচনায় এই সময়টাকে নির্ধারণ করা হয়েছে তা হলো এ সময়ে এমন কোনও বিশেষ ঘটনা ঘটেনি যার বিশেষ প্রভাব বা প্রতিফলন পত্রিকাগুলোর মফস্বল পাতার ওপর পড়েছে, অর্থাৎ নির্ধারিত ওই সময়ে বিশেষ কোনও ঝোঁক বা প্রবণতা পত্রিকাগুলোর মফস্বল পাতায় প্রভাব ফেলে নি।

## সমীক্ষা পদ্ধতি

যে পদ্ধতিতে সমীক্ষা কাজের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা হয়েছিল তার একটি হচ্ছে মফস্বল পাতার আধেয় বা বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ (Content analysis)। দ্বিতীয় যে পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ এবং সমীক্ষা সংক্রান্ত ধারণালাভের চেষ্টা হয়েছে তা হলো পর্যবেক্ষণ। কয়েকটি পত্রিকার মফস্বল সম্পাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমেও মফস্বল পাতা সম্পর্কে ধারণা লাভের চেষ্টা করা হয়েছে।



www.pathagar.com

পত্রিকার যে কোনও পাতায় বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার্য দৃশ্যেয় উপাদান (Visual elements) থাকে। এর মধ্যে নামফলক, খবর, শিরোনাম, ছবি, রঙ, বিজ্ঞাপন, গ্রে ম্যাটার, রুল এবং স্ক্রিন সহ অনেক কিছু থাকে। নির্বাচিত সাতটি পত্রিকার মফস্বল পাতায় প্রকাশিত বিভিন্ন খবরকে তার চরিত্র বিচার করে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করে তা কলাম ইঞ্চিতে পরিমাপ করা হয়েছে। পাশাপাশি পাতার অন্যান্য উপাদান যেমন নামফলক, ছবি, বিজ্ঞাপন প্রভৃতিও কলাম ইঞ্চিতে পরিমাপ করা হয়েছে। পরে সেগুলোর আনুপাতিক হার নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া মফস্বল পাতার সংবাদাংশকে পুরো পত্রিকার মোট প্রকাশিত এলাকার সঙ্গে আনুপাতিক হারে উপস্থাপনের চেষ্টা হয়েছে।

কলাম ইঞ্চি গুণে-গুণে আধেয় বিশ্লেষণের পর পত্রিকার পাতায় এমন কিছু বিষয় থেকে যায় তা স্কেলের মাধ্যমে পরিমাপযোগ্য নয়; যেগুলো শুধু উপলব্ধি ও বোঝার বিষয়। সে প্রেক্ষাপটে মফস্বল পাতাগুলোর বিভিন্ন দিক ও বিষয়সমূহ পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে উপলব্ধি ও বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে।

দুটো বিষয়কে একটি উদাহরণ সহযোগে বোঝানো যেতে পারে। যেমন, খবরের পাতায় প্রকাশিত একটি দুর্ঘটনাকে স্রেফ দুর্ঘটনা হিসেবেই দেখব নাকি তা মনুষ্যসৃষ্ট বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় তা খবরের উপাদান ও সংবাদমূল্য দিয়ে বিচার করে সঠিকভাবে শনাক্ত করে তা সুনির্দিষ্ট শ্রেণীভুক্ত করে কলাম-ইঞ্চিতে পরিমাপ করা হয়েছে। একই বিষয়ে হয়তো একটি ছবি ছাপা হয়েছে সেই ছবিটি পত্রিকার পাতায় একটি দৃশ্যেয় উপাদান (Visual elements) হিসেবে কলাম-ইঞ্চিতে পরিমাপ করা হয়েছে। কিন্তু ছবিটির আয়তন কেমন, সাদা-কালো নাকি রঙিন, টোন কেমন, তার গুণাগুণ কেমন, ছবির মূল ফোকাস (Focus) বা Centre of interest ঠিকমতো তুলে ধরা হয়েছে কিনা তা শনাক্ত করা সম্ভব শুধু পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে।

## মফস্বল বলতে কি বোঝায়

চেম্বার ডিকশনারি অনুসারে মফস্বল বলতে রাজধানী বা বড় মহানগরীর বাইরের শহর বা অঞ্চলকে বোঝায় বা জেলা শহরগুলোকেই বোঝায়। অপরদিকে মফস্বলকে অন্যভাবেও বিচার করা যায় যে, এ হচ্ছে এমন এক অঞ্চল যেখানে শহরের অনেক নাগরিক সুবিধাই নেই, বিশেষ করে প্রযুক্তিনির্ভর সহায়ক বিষয়গুলোর অভাব রয়েছে।

এই হিসেবে পত্রিকার যে পাতা ঢাকা বা রাজধানী নগরীর বাইরের যে অঞ্চলের সংবাদ ছাপায় এবং যে খবরগুলোকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে স্থানীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট কিংবা যে খবরগুলোর কদাচিৎ পত্রিকার পাতায় জায়গা লাভের সৌভাগ্য অর্জন হয় তাকেই মফস্বল খবর বলা যায়।



www.pathagar.com

## মফস্বল পাতাগুলোর নামকরণ

সমীক্ষাভুক্ত পত্রিকাগুলোর মফস্বল পাতার নামকরণের মধ্যে একটা বৈচিত্র্য রয়েছে এবং নিশ্চিতরূপেই সেগুলো অর্থবহ। তবে পুরোপুরি যৌক্তিকভাবে সেগুলোর নামকরণ করা হয়েছে নাকি তাতে কিছুটা আবেগ মিশ্রিত রয়েছে তা স্পষ্ট নয়। অবশ্য সংবাদ কভারেজ ও সংবাদ পরিবেশনের ওপরও নামকরণের বৈশিষ্ট্য বহন করে থাকতে পারে। যেমন দৈনিক ইনকিলাব-এর মফস্বল পাতার নাম 'গ্রাম বাংলা'; পাতা হিসেবে বেশ যুতসই নাম। নামটির মধ্যে যেন মফস্বলের চিত্র ফুটে উঠেছে। কিন্তু জনকণ্ঠের মফস্বল পাতা 'দেশের খবর' বলতে শুধু মফস্বল অঞ্চলের খবর নাও বোঝাতে পারে বরং তা পুরো দেশের খবরও বোঝা যেতে পারে।

অপরদিকে 'মফস্বল' কথাটির অর্থ ঢাকা সহ বড় নগরীর বাইরের জেলা শহর কিংবা মফস্বল শহর বা স্থানীয় অঞ্চল বোঝানো হলে দ্য বাংলাদেশ অবজারভারের মফস্বল পাতা 'District news' ঠিক আছে কিন্তু দ্য ডেইলি স্টার-এর মফস্বল পাতা যখন বলা হচ্ছে 'National' তখন তা শুধুমাত্র মফস্বল অঞ্চল বা জেলা শহর নাও বোঝাতে পারে। একইভাবে সংবাদ-এর মফস্বল পাতার নাম 'দেশ'। এই দেশ বলতে সাধারণ উপলব্ধিতে পুরো দেশ বলে গণ্য হতে পারে।

অন্যদিকে ইত্তেফাকের মফস্বল পাতার নাম 'শহর বন্দর গ্রাম'। এখানে 'শহর ও বন্দর' শব্দ দুটো সংযোজিত হওয়ায় মফস্বল পাতার কভারেজের সীমা দীর্ঘায়িত হয়ে গেছে। অপরদিকে প্রথম আলো'র মফস্বল পাতা 'বিশাল বাংলা'। বাংলাদেশ মাত্রই একটি বিশাল গ্রাম। সেই অর্থে বিশাল বাংলা পুরো বাংলাকে বুঝিয়ে থাকলেও 'বিশাল বাংলা' কথাটির অন্তর্নিহিত অর্থ প্রকৃতপক্ষে পুরো গ্রামবাংলা।

## সমীক্ষার সমস্যা

সমীক্ষা পরিচালনা করতে গিয়ে বেশকিছু, তবে জটিল নয়, সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে। প্রথমত সংবাদ উপাদান ও সংবাদমূল্য দিয়ে খবরের বিভিন্ন চরিত্র বিচার করে ও লক্ষণসমূহ শনাক্ত করে একেকটি খবরকে একেক শ্রেণীভুক্ত করতে অসুবিধা হয়েছে। যেমন, একটি খবরকে উন্নয়নমূলক খবর বলব নাকি অর্থনীতি বিষয়ক খবর বলব তা শনাক্ত ও শ্রেণীভুক্ত করা খুব কঠিন। কারণ, কোনও উন্নয়নমূলক খবরের সঙ্গে নিশ্চিতরূপেই অর্থনীতির সম্পর্ক রয়েছে। অপরদিকে প্রতিদিনের রুটিনমাফিক আবহাওয়া সংক্রান্ত বিষয়কে খবর হিসেবে বিবেচনা করব নাকি স্ট্যান্ডিং ম্যাটার হিসেবে বিবেচনা করব-এটাও জটিল ছিল।

নির্বাচিত পত্রিকাগুলো একটি ব্যতীত সবক'টির কলাম চিরাচরিতভাবে আটটি করে। শুধুমাত্র দৈনিক জনকণ্ঠের প্রথম ও শেষের পাতা ছয় কলামে বিভক্ত। ফলে আট কলামের প্রতি পাতা কলাম-ইঞ্চি হিসেবে গণনা করার যে সুবিধা, জনকণ্ঠের তা নেই। জনকণ্ঠের প্রথম ও শেষের পাতা পরিমাপ করতে তাই যথেষ্ট অসুবিধা



www.pathagar.com

হয়েছে। তবে সে সমস্যার একটা সমাধান করা হয়েছে। অর্থাৎ ছয় কলামকে আট কলামে বিভক্ত করে তারপর তা কলাম-ইঞ্চি হিসেবে গণনা করা হয়েছে।

কয়েকটি পত্রিকা সপ্তাহে সুনির্দিষ্ট ম্যাগাজিন বের করে থাকে। মোট প্রিন্টিং এলাকার হিসেবের মধ্যে সেগুলোকে বিবেচনা করা হয় নি।

নির্বাচিত পত্রিকাগুলোর সবক'টিরই মফস্বল খবর প্রতিদিন একই নামে বা পাতায় প্রকাশিত হয় না। যেমন ইত্তেফাকের 'শহর বন্দর গ্রাম' নামে মফস্বল পাতা প্রতিদিনই বের হয় না। যেদিন শহর বন্দর গ্রামে নামে মফস্বল পাতা বেরোচ্ছে না সেদিন পত্রিকার বিভিন্ন পাতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে মফস্বলের খবর ছাপা হচ্ছে প্রচুর। সেদিনের খবরগুলো হিসাবের মধ্যে আনা যেত; কিন্তু যেহেতু সমীক্ষার শিরোনাম ঢাকা'র দৈনিকের মফস্বল পাতা, তাই মফস্বল পাতার বাইরে মফস্বলীয় লক্ষণযুক্ত খবর হিসাবের আওতাভুক্ত হয়নি। যেদিন সুনির্দিষ্টভাবে কোনও মফস্বল পাতা বের হয়নি সেদিন মফস্বলের পাতা 'শূণ্য' হিসেবে গণনা করা হয়েছে। নিজের আইটেমগুলো হচ্ছে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

১. পানি সংকটে নারায়ণগঞ্জ হাসপাতাল প্রায় অচল (প্রথম আলো, ১২ নভেম্বর, ১৯৯৯)।

২. দেশে ৭ কোটি মানুষ মলমূত্র ত্যাগ করে খোলা আকাশের নিচে (সংবাদ, ১২ নভেম্বর, ১৯৯৯)।

৩. কুমিল্লা পারমাণবিক চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তার অভাবে কোনও কাজ হচ্ছে না।

এমন কতগুলো সংবাদ সমীক্ষাধীন পত্রিকার মফস্বল পাতায় ছাপা হয়েছে যেগুলো সংবাদমূল্যগুণে প্রথম পাতায় খবর হওয়ার দাবিদার। যেমন :

১. Deadly disease malaria increases in Rangamati (November 15, Observer).

২. Rich reserve of hard stones, silica-sands found in Panchagarh (November 6, Observer).

৩. London-Sylhet flight lands (Nov 6, 1999, Daily Star)

৪. চাঁদপুরে ১০ লাখ লোক আর্সেনিক আতঙ্কে (জনকণ্ঠ, ৬ নভেম্বর, ১৯৯৯)।

উপরের উদাহরণগুলো থেকে কয়েকটি বিষয় উপলব্ধির প্রয়োজন রয়েছে। অর্থাৎ মফস্বল সম্পাদক বিভিন্ন সংবাদের চরিত্র বিচারে ব্যর্থ হয়েছেন অথবা ডেডলাইনের চাপে পড়ে তাড়াহুড়ো করে নিজের পাতাতেই দিয়ে দিয়েছেন প্রথম পাতার সংবাদ; অথবা এব্যাপারে বার্তা সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেননি।



www.pathagar.com

নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আবার এমন কতগুলো খবর ছাপা হয়েছে যা বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি করতে পারে। যদিও পত্রিকার কর্তৃপক্ষ অবশ্য ব্যাখ্যা দিতে পারেন যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তারা এ ধরনের খবর ছাপছেন। যেমন :

১. লাফিয়ে দর বাড়ছে। কুড়িগ্রামে কাঁচা মরিচের কেজি ৬০ টাকা। মাত্র চারদিনের ব্যবধানে কুড়িগ্রামে মরিচের কেজি ২০ টাকা থেকে লাফিয়ে ৬০ টাকা দরে উঠেছে। দু'এক দিনের মধ্যে ৮০ টাকা থেকে ১০০ টাকায় উঠতে পারে বলে ব্যবসায়ীরা জানান। (প্রথম আলো, ৮ নভেম্বর, ১৯৯৯)।

২. কাঁচা মরিচেও আগুন (ইত্তেফাক, ১৩ নভেম্বর, '৯৯)।

**মফস্বল পাতার বৈশিষ্ট্য**

সমীক্ষাভুক্ত পত্রিকাগুলোর মফস্বল পাতার অন্যতম একটি দিক হলো রুচিসম্মত পৃষ্ঠাসজ্জার দিকে মনোযোগ না দেয়া। পৃষ্ঠাসজ্জার মাধ্যমে একটি পাতার তথা পত্রিকার বৈশিষ্ট্য বা Personality গড়ে ওঠে। রুচিসম্মত পৃষ্ঠাসজ্জার মাধ্যমে পাঠকের সামনে পত্রিকাটি বা পাতার একটা ভাবমূর্তি বা Image তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু সমীক্ষাধীন বেশকিছু পত্রিকার মফস্বল পাতা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে পৃষ্ঠাসজ্জা করা হয়নি। তবে বেশির ভাগ পাতায় এক ধরনের Contrast and Balance পৃষ্ঠাসজ্জা দেয়ার প্রবণতা লক্ষণীয়। সেটা সচেতন কিংবা অসচেতন যেভাবেই হোক।

আরেকটি দিক হলো যে, কয়েকটি পত্রিকার মফস্বল পাতার সংবাদগুলো লেখার সময় সংবাদ লেখার প্রচলিত নিয়ম-পদ্ধতি ও কাঠামো অনুসরণ করা হয় নি। অনেক ক্ষেত্রেই সূচনা (Intro) ও অবয়ব (Body) একত্র করে লেখা হয়েছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে Intro আলাদা করে লেখা হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা ছিল শব্দবহুল। ফলে সংবাদের মূল থিম কি তা পাঠোদ্ধার করা মুশকিল। এটা বাংলা পত্রিকায় বেশি লক্ষণীয়। সমীক্ষার অন্তর্ভুক্ত দুটো ইংরেজি পত্রিকার মফস্বল পাতার সংবাদগুলোতে অবশ্য সংবাদ লেখার প্রচলিত নিয়ম-পদ্ধতি ও কাঠামো অনুসরণ করার চেষ্টা হয়েছে। সংবাদগুলোর সম্পাদনার মানও ভাল। পৃষ্ঠাসজ্জায়ও একটি পরিকল্পনা ও চিন্তার ছাপ রয়েছে। সমীক্ষাধীন পত্রিকাগুলোর মফস্বল পাতায় সংবাদ, ছবি ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি মিলিয়ে বিভিন্ন আইটেমের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে তা থেকেই বোঝা যায় যে, এ পাতার সংবাদ, ছবি বিশেষত সংবাদবিবরণীর আকৃতি খুবই ছোট। একটা হিসাবে দেখা গেছে, সবকিছু মিলিয়ে আইটেমের সর্বোচ্চ সংখ্যা ছিল ৫৩। সবচেয়ে কম আইটেমের সংখ্যা ছিল ১৯। গড়ে ২৫-৩০টি আইটেম কোনও ব্যাপারই নয়। এতে একটা ধারণা তৈরি হয় যে মফস্বলের সংবাদ মানেই ছোট-ছোট সংবাদ। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে পাঠকের মনোসংযোগ ও চোখের আয়েশের জন্য একটি পাতায় ১০/১২টি আইটেমের বেশি থাকা উচিত নয়।



www.pathagar.com

বাংলাদেশের পত্রিকাগুলোকে প্রায়শই Media trial করতে দেখা যায়। অন্যান্য পাতার ন্যায় এই প্রবণতা মফস্বলের পাতাতেও আছে। এছাড়া সংবাদবিবরণীতে মন্তব্য করার প্রবণতাও লক্ষণীয়।

মফস্বল পাতার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো সংবাদমূল্যের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ খবর ছবিসহ প্রকাশ করা।

তবে অন্য একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, মফস্বল সংবাদগুলো সাধারণত কয়েকদিনের সংবাদ একত্রিত করে প্রকাশ করা হয়েছে। কখনও-কখনও দেখা গেছে যে আজকে এক পত্রিকায় যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তার তিনদিন পর অপর পত্রিকায় একই সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। আবার এমনও লক্ষ্য করা গেছে একইদিন একাধিক পত্রিকায় প্রায় একই ল্যাংগুয়েজে একই সংবাদ ছাপা হয়েছে।

আরেকটি দিক হলো যে, নামের দিক থেকে অনেক পত্রিকাই তাদের মফস্বল পাতাকে মফস্বল বলে নি, তবু তারা মফস্বলের সংবাদই কভার করে। তবে কভার করা মফস্বল সংবাদের অনেকগুলোই শহরপ্রবণ মফস্বল সংবাদ বিশেষ করে ইউনিয়ন বা গ্রাম পর্যায়ের সংবাদ যতটা না আছে তার চেয়ে বেশি জেলা সদর দফতরভিত্তিক সংবাদ।

আরও কতগুলো লক্ষণীয় দিক হলো যে, মফস্বল পাতার সংবাদগুলোর অনেক শিরোনাম অসম্পূর্ণ। এছাড়া ভাষাগত ভুল, তথ্যগত বিভ্রান্তি কিংবা এ সংক্রান্ত অবহেলা রয়েছে। ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সব ক'টি পত্রিকার কোনও নীতিগত সাদৃশ্য নেই। বিষয়টি ভেবে দেখার যোগ্য। সংবাদবিষয়ক আইন ও নীতিমালা না মেনে চলার প্রবণতাও লক্ষণীয়।

**বিষয়বস্তু বিশ্লেষণে প্রাপ্ত ফলাফল**

সমীক্ষাভুক্ত সাতটি পত্রিকার ১৫ দিনের আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কলাম-ইঞ্চিতে এই ১০৫টি পত্রিকার মোট প্রকাশিত এলাকা (Total print area) ২৩৫৯৩৭.৬ কলাম-ইঞ্চি। অর্থাৎ গড় প্রকাশিত এলাকার (Average print area) পরিমাণ হচ্ছে ২২৪৭.০২ কলাম-ইঞ্চি। মোট প্রকাশিত ২৩৫৯৩৭.৬ কলাম-ইঞ্চির মধ্যে মফস্বল পাতার জন্য মোট প্রকাশিত এলাকার পরিমাণ হচ্ছে ১৮৩৭৬ কলাম-ইঞ্চি। শতকরা হিসাব অনুযায়ী প্রতিটি পত্রিকায় মফস্বল পাতার জন্য গড় বরাদ্দ হচ্ছে মাত্র ৭.৭৯ ভাগ জায়গা। অন্যদিকে সাতটি পত্রিকার মফস্বল পাতায় সংবাদ হিসেবে যতটুকু প্রকাশিত হয়েছে তা মোট প্রকাশিত এলাকার মাত্র ৪.৮১%।

সাতটি পত্রিকার মধ্যে ডেইলি স্টারের মফস্বল পাতায় সংবাদ সবচেয়ে কম জায়গা পেয়েছে। অপরদিকে মফস্বল পাতায় সংবাদ সবচেয়ে বেশি জায়গা দিয়েছে দৈনিক সংবাদ। ডেইলি স্টারে ১৫ দিনের মোট প্রকাশিত এলাকার পরিমাণ হচ্ছে ৪১৯৬৮ কলাম-ইঞ্চি। ডেইলি স্টারে গড় প্রকাশিত এলাকা হচ্ছে ২৭৯৭.৮৬ কলাম-ইঞ্চি।



www.pathagar.com

ডেইলি স্টারে মফস্বল পাতার সংবাদের জন্য গড় বরাদ্দ হচ্ছে মাত্র ৯৪.৭ কলাম-ইঞ্চি। শতকরা হিসাব অনুযায়ী মোট প্রকাশিত এলাকার ৩.৩৮ ভাগ মাত্র মফস্বল পাতার সংবাদ হিসেবে ব্যয় হয়েছে ডেইলি স্টারে।

দৈনিক ইনকিলাবে ১৫ দিনে মোট প্রকাশিত এলাকার পরিমাণ হচ্ছে ২২৭০৪ কলাম-ইঞ্চি। গড় বরাদ্দ হচ্ছে ১৫১৩.৬ কলাম-ইঞ্চি। মোট প্রকাশিত এলাকার মধ্যে মফস্বল পাতার জন্য সংবাদ হিসেবে ব্যয় হয়েছে গড়ে ৭৩.৬৭ কলাম-ইঞ্চি অর্থাৎ শতকরা হিসাবে গড় বরাদ্দ মাত্র ৪.৮৭ ভাগ। দৈনিক ইনকিলাবে মফস্বল পাতার জন্য বরাদ্দ এত কম থাকার অন্যতম কারণ হলো যে, এই পত্রিকায় প্রতিদিন নিয়মিত মফস্বল পাতা বের হয়না। ১৫ দিনের মধ্যে মাত্র আট দিন নিয়মিত মফস্বল পাতা বের হয়েছে। বাকি সাত দিন মফস্বল সংবাদ এখানে সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছাপা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাকে ১৫ দিনে মোট প্রকাশিত এলাকার পরিমাণ ১৪৯৬০ কলাম-ইঞ্চি। গড় বরাদ্দ ছিল ৯৯৭.৩৩ কলাম-ইঞ্চি। মফস্বল পাতার সংবাদের জন্য মোট গড় বরাদ্দ ছিল ৪৫.৫৩ কলাম-ইঞ্চি। ইত্তেফাকেও ১৫ দিনের মধ্যে দশদিন মফস্বলের নিয়মিত পাতা বের হয় নি। 'চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম' বা অন্যান্য শিরোনামের অধীনে বিচ্ছিন্নভাবে মফস্বল অঞ্চলের সংবাদ প্রকাশিত হয়।

বাংলাদেশ অবজারভারে ১৫ দিনে মোট প্রকাশিত এলাকার পরিমাণ ৪৪৩৫২ কলাম-ইঞ্চি। প্রতিদিনের গড় বরাদ্দ ২৯৫৬.৮ কলাম-ইঞ্চি। মোট প্রকাশিত এলাকার মধ্যে প্রতিদিনের মফস্বল পাতার সংবাদ হিসেবে জায়গা পেয়েছে গড়ে ১২৭.৬ কলাম-ইঞ্চি। শতকরা হিসাবে মোট প্রকাশিত এলাকার মাত্র ৪.৩১ ভাগ মফস্বল পাতার সংবাদের জন্য ব্যয় হয়েছে। সমীক্ষাভুক্ত ১৫ দিনের প্রতিদিনই অবজারভারের মফস্বল পাতা বের হয়েছে।

প্রথম আলো'তে ১৫ দিনের মোট প্রকাশিত এলাকা ৩৭৮৪৮ কলাম-ইঞ্চি। প্রতিদিনের গড় বরাদ্দ ২৫২৩.২ কলাম-ইঞ্চি। মোট প্রকাশিত এলাকার মধ্যে মফস্বল পাতার সংবাদের জন্য গড় বরাদ্দ ছিল ১৩০.৮৫ কলাম-ইঞ্চি। অর্থাৎ শতকরা হিসাবে প্রতিদিনের গড় বরাদ্দ ৫.১৯ ভাগ। প্রথম আলো'তে প্রায় দুই পাতার মফস্বল পাতা বের হয় এবং সমীক্ষাভুক্ত সময়ে প্রতিদিনই এই পাতা বের হয়েছে। তবে একটি পাতার বেশির ভাগ স্থান জুড়ে ব্যক্তিগত ও ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন থাকে।

দৈনিক সংবাদে ১৫ দিন মোট প্রকাশিত এলাকার পরিমাণ হচ্ছে ৩১৪৪৯.৬ কলাম-ইঞ্চি। প্রতিদিনের গড় প্রকাশিত এলাকা ২০৯৬.৬৪ কলাম-ইঞ্চি। মোট প্রকাশিত এলাকার মধ্যে মফস্বল পাতার সংবাদ হিসেবে বরাদ্দ ১৬৬.০৩ কলাম-ইঞ্চি এবং শতকরা হিসাবে এর হার ৭.৯২ ভাগ। দৈনিক সংবাদেও সমীক্ষাধীন ১৫ দিনের প্রতিদিনই মফস্বল পাতা বেরিয়েছে।



www.pathagar.com

দৈনিক জনকণ্ঠে ১৫ দিনে মোট প্রকাশিত এলাকার পরিমাণ হচ্ছে ৪২৬৫৬ কলাম-ইঞ্চি বা গড় এলাকা হচ্ছে ২৮৪৩.৭৩ কলাম-ইঞ্চি। মোট প্রকাশিত এলাকার মধ্যে মফস্বল পাতার সংবাদের জন্য ব্যয় হয়েছে ৯৮.১২ কলাম-ইঞ্চি। শতকরা হিসাবে এ পরিমাণ ৩.৪৫ ভাগ।

একটি লক্ষণীয় দিক হচ্ছে যে, সমীক্ষাধীন পত্রিকাগুলোর মফস্বল পাতার প্রতিদিনের জন্য গড় বরাদ্দ হচ্ছে ১৭৫.০১ কলাম-ইঞ্চি। অর্থাৎ এক পাতার থেকে সামান্য বেশি। এক পাতায় সাধারণত গড়ে ১৬৮ কলাম-ইঞ্চি থাকে। কিন্তু অনেক পত্রিকার জন্য দু'পাতার মফস্বল পাতা থাকলেও কতগুলো নিয়মিত বের হয় না। আবার কতগুলোর বরাদ্দ মাত্র এক পাতা। ফলে পত্রিকাগুলোর গড় বরাদ্দ মাত্র এক পাতার থেকে সামান্য বেশি।

## মফস্বল পাতার সংবাদের শ্রেণী বিশ্লেষণ

সমীক্ষাভুক্ত পত্রিকাগুলোর মফস্বল পাতার আধেয় বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, পাতায় সংবাদাংশের স্থান ৬০ শতাংশের বেশি। অর্থাৎ ৬০.১১%। সেখানে বিজ্ঞাপনের পরিমাণ ২১.১৫% এবং ছবির পরিমাণ ১৪.৫৫%। পরিসংখ্যানেই বোঝা যায় ছবির পরিমাণ যথেষ্ট কম। সংবাদের পরিমাণ যথেষ্টই।

তবে যে বিষয়টি লক্ষণীয় এবং গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় আনার যোগ্য তা হলো যে, সংবাদাংশের মধ্যে ৩০.২১% সংবাদ হচ্ছে অপরাধ বিষয়ক। বিপর্যয় বিষয়ক সংবাদের হার ১৩.০৮%। সেই তুলনায় উন্নয়নমূলক সংবাদের হার ৭.৪৪%, অর্থনীতি বিষয়ক সংবাদের হার ৭.৬৫% এবং রাজনীতি বিষয়ক সংবাদের হার ৬.০৮%, স্বাস্থ্য বিষয়ক সংবাদের হার ৪.৬৮%, কৃষি বিষয়ক সংবাদের হার ৬.৫৩%, যে কোনও বিষয়ে ফিচার বা ফিচারধর্মী সংবাদের হার ১২.৭৮%। অন্যদিকে খেলাধুলা বিষয়ক সংবাদের হার ০.৭৪% মাত্র।

এখানে দু'টি বিষয় লক্ষণীয় যে, মফস্বলের পাতায় অপরাধবিষয়ক সংবাদের পরিমাণ বেশি। বিপর্যয় সংক্রান্ত সংবাদের হারও কম নয়। সেখানে খেলাধুলার সংবাদ একেবারেই কম আসছে। উন্নয়নমূলক, স্বাস্থ্য, কৃষি প্রভৃতি বিষয়ের সংবাদও কম। তার মানে মফস্বলের পাতাগুলো অপরাধ বিষয়ে কভার করার ক্ষেত্রে বেশি মনোযোগ দিচ্ছে। তবে অন্য একটি দিক লক্ষণীয় যে, রাজনীতি পত্রিকাগুলোর প্রধান উপজীব্য হলেও মফস্বলের পাতায় তার কভারেজ অনেকটাই কম। সম্ভবত, মফস্বলের রাজনীতির খবরও পত্রিকার প্রথম কিংবা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পাতায় স্থান করে নিচ্ছে।

মফস্বল পাতায় স্বাস্থ্য বিষয়ে কভারেজের পরিমাণ অনেকটাই কম। তবে ঢাকা'র বাইরে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার যে অতি বেহাল অবস্থা বিশেষ করে দু'হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য কর্মসূচী সংক্রান্ত লক্ষ্য অর্জনের ঘোষণা সত্ত্বেও মফস্বল পাতায় স্বাস্থ্য বিষয়ে অতি ক্ষুদ্র পরিসরেও ভাল আলোকপাত করার চেষ্টা হয়েছে।



www.pathagar.com

## পূর্ববর্তী দুই সমীক্ষার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা

বর্তমান সমীক্ষার প্রায় কাছাকাছি দুটো সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছিল এর আগে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের উদ্‌যোগে। তবে বর্তমান সমীক্ষার সঙ্গে যে মৌলিক পার্থক্য তা হলো সেই দুটো সমীক্ষায় শুধুমাত্র মফস্বল পাতা নিয়ে নয় বরং পুরো পত্রিকায় প্রকাশিত মফস্বল সংবাদাংশের পরিমাণ শনাক্ত করার চেষ্টা হয়েছিল। বর্তমান সমীক্ষায় শুধুমাত্র মফস্বল পাতার সংবাদের ওপরই মনোনিবেশ করা হয়েছে। তবে সেই দুটো সমীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল সর্বাংশে না হলেও এই সমীক্ষার সঙ্গে কিছুটা তুলনায় আনা যেতে পারে।

১৯৮১ সালে পিআইবি পরিচালিত সমীক্ষায় দেশের পাঁচটি প্রধান দৈনিকের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে পত্রিকার মোট মুদ্রণাংশের (Total print area) অতি সামান্যই মফস্বল সংবাদের জন্য বরাদ্দ থাকে। কাগজওয়ারী মফস্বল সংবাদের হিসাবে দৈনিক ইত্তেফাকের ক্ষেত্রে ৫.৪৪%, দৈনিক সংবাদের ক্ষেত্রে ৮.৯৩%, দৈনিক বাংলার ক্ষেত্রে ৫.০১%, বাংলাদেশ অবজারভারের ক্ষেত্রে ৪.০৪% এবং বাংলাদেশ টাইমসের ক্ষেত্রে ৪.৬৯%। পাঁচটি পত্রিকায় গড় মফস্বল সংবাদের হিস্যা ছিল ৫.৬২%। এরমধ্যে সবটুকু সংবাদই নিরেট গ্রামাঞ্চলের নয়। তার বড় অংশ মফস্বল শহরের, জেলা, উপজেলা ও থানার প্রশাসনিক কেন্দ্রের।

অপরদিকে ১৯৮৭ সালে পরিচালিত একই ধরনের আরেকটি সমীক্ষায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত চারটি দৈনিকের মফস্বল সংবাদাংশের পরিমাণ নির্ধারণের চেষ্টা হয়েছিল। ওই চারটি পত্রিকা ছিল দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংবাদ, অধুনালুপ্ত দৈনিক বাংলা ও বাংলাদেশ অবজারভার। সেই সমীক্ষায় দেখা যায় যে, দৈনিক সংবাদে সর্বাপেক্ষা বেশি স্থান ব্যয় করা হয় মফস্বল সংবাদের জন্য। এই পরিমাণটা ছিল ১৫.৮৭%। সংবাদের পরের স্থানগুলো যথাক্রমে ইত্তেফাকের ৯.৯৫%, অবজারভারের ৬.০৪% এবং দৈনিক বাংলার ৫.৮২%। অর্থাৎ মফস্বল সংবাদের গড় হিস্যা ছিল ৯.৪২%। আগের সমীক্ষার থেকে এটা বেশ বাড়ন্ত।

বর্তমান সমীক্ষায় মফস্বল পাতার সংবাদের হিস্যা ৪.৮১%। যদিও এই হিসাবের মধ্যে পুরো পত্রিকায় প্রকাশিত মফস্বল সংবাদাংশ গণ্য করা হয় নি। তবে গণ্য করা হলে তা খুব বেশি বাড়ত বলে ধারণা করা কঠিন। অর্থাৎ মফস্বল সংবাদের হিস্যা এখনও তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়েনি।

## মফস্বল পাতার উন্নয়নের জন্য সুপারিশ

১. মফস্বলের সংবাদের জন্য কাগজে আরও বেশি জায়গা (Space) বরাদ্দ করা প্রয়োজন;
২. মফস্বল পাতায় টাটকা ও সুসম্পাদিত খবর পরিবেশন করতে হবে;
৩. মফস্বলের খবর বলে তা উপেক্ষা করার মানসিকতা বর্জন করতে হবে;
৪. মফস্বল ডেস্কে আরও দক্ষ বিভাগীয় সম্পাদক ও তার কয়েকজন যোগ্য সহকারী থাকতে হবে। এজন্য তাঁদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে;



www.pathagar.com

৫. মফস্বল ডেস্ককে মফস্বল ডেস্ক হিসেবে গণ্য না করে ন্যাশনাল ডেস্কের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করতে হবে;
৬. মফস্বল বা স্থানীয় সংবাদদাতাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে আরও বেশি সতর্ক হতে হবে যাতে সত্যিকারের ন্যায়নিষ্ঠ ও পেশাজীবী সাংবাদিক নিয়োগ করা যায়;
৭. মফস্বল পাতার জন্য সুনির্দিষ্ট ও পুরো দু'টি পৃষ্ঠা বরাদ্দ করতে হবে;
৮. মফস্বল পাতায় অন্যান্য পাঁচমিশালী জিনিস স্থান করে দেয়ার ডাম্পিং কেন্দ্র বানানোর প্রবণতা বাদ দিতে হবে;
৯. মফস্বল সাংবাদিকদের ভাল ছবি তোলার জন্য দক্ষ করে তুলতে স্থানীয় প্রতিনিধিদের জন্য ভাল ক্যামেরার ব্যবস্থা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে;
১০. সুনির্দিষ্ট পাতাতেই মফস্বল পাতাকে বরাদ্দ করতে হবে। যেমন করে ক্রীড়া বা অন্যান্য বিভাগের জন্য আলাদা পাতা বরাদ্দ থাকে;
১১. মফস্বল পাতায় পরিবেশনের জন্য ভাল সংবাদের অন্বেষণ করতে হবে;
১২. মফস্বল পাতায় গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যেয় উপাদান ও রঙের ব্যবহার বাড়াতে হবে;
১৩. অন্য কোনও আইটেমকে জায়গা করে দেয়ার জন্য মফস্বল পাতা ব্যবহার করা যাবে না। অর্থাৎ প্রতিদিনই নিয়মিতভাবে মফস্বল পাতা বের করতে হবে;
১৪. মফস্বল পাতায় দায়সারাগোছের রিপোর্টিংয়ের বদলে অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং বেশি করে ছাপতে হবে;
১৫. ফলো-আপ রিপোর্টিংয়ের দিকে মনোযোগ দিতে হবে;
১৬. নেতিবাচক সংবাদের বদলে ইতিবাচক খবরের জায়গা বেশি করে দিতে হবে। অর্থাৎ অপরাধমূলক রিপোর্টের বদলে উন্নয়নমূলক তথা ইতিবাচক সংবাদকে প্রাধান্য দিতে হবে;
১৭. ডেডলাইনের চাপকে পরাস্ত করার জন্য মফস্বল সাংবাদিকদের জন্য প্রযুক্তি সহযোগিতা বাড়াতে হবে;
১৮. বড়-বড় ছবি ব্যবহার করতে হবে;
১৯. মফস্বল পাতাকে ব্যক্তিগত বা যে কোনও ধরনের বিজ্ঞাপনের ডাম্পিং কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের প্রবণতা কমাতে হবে;
২০. মফস্বল পাতায় আইটেমের সংখ্যা কমাতে হবে এবং খণ্ডিত বা অপূর্ণাঙ্গ কোনও সংবাদ আইটেম প্রকাশের প্রবণতা পরিহার করতে হবে;
২১. সংশ্লিষ্ট পত্রিকাগুলো তাদের মফস্বল পাতার উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের নিজস্ব মফস্বল সংবাদদাতাদের নিয়ে সময়ে-সময়ে সেমিনার বা বৈঠক করতে পারে;
২২. মফস্বল সাংবাদিকদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাঁদের উৎসাহিত করার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে।

*সূত্র : এই গবেষণা কর্মটি বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের জার্নাল 'নিরীক্ষা'র সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০০০ সংখ্যায় প্রকাশিত।*



www.pathagar.com

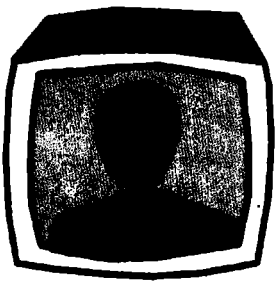

# টেলিভিশন : পরিবেশনা, প্রভাব

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# টিভি মাধ্যমের সামাজিক প্রভাব : প্রেক্ষিত নির্বাচন, '৯৬

যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় প্রেসিডেন্ট টমাস জেফারসন একদা বলেছিলেন, ...And were it left me to decide whether we should have government without newspaper or the newspaper without government I should not hesitate a moment to prefer the latter.[১]

আধুনিক সমাজে সংবাদপত্র ছাড়া যে সরকার অচল এই নিদারুণ সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন বলেই হয়ত জেফারসন এধরনের একটি কালজয়ী উক্তি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। শুধু সরকার কিংবা সরকারের লোকজন নয়, নিরন্তর তথ্যপ্রত্যাশী আধুনিক মানুষের জন্য সংবাদপত্র তথা সংবাদমাধ্যম অতি জরুরি।

সভ্য দুনিয়ায় সংবাদপত্র ছাড়া যে সরকার অচল তা আমরা আরো দুটো দৃষ্টান্ত থেকে ভালোভাবেই বুঝতে পারি। এইচ.জি.ওয়েলস্ একদা বলেছিলেন, The Roman Empire could not endure because there were no newspapers- no methods of apprising the outlying people of the behavior of the center.[২]

অনেকেই মনে করে থাকেন বাংলাদেশে নব্বই-এর গণআন্দোলনের শেষপ্রান্তে সংবাদপত্রগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলেই এরশাদের পতন তরান্বিত হয়েছিল। কারণ জনগণ সেসময় নিয়ন্ত্রিত রেডিও টিভির সংবাদ একবিন্দুও বিশ্বাস করেনি। ফলে সংবাদপত্র ব্ল্যাক আউট হয়ে যাওয়ায় এরশাদের পতন তরান্বিত হয়েছিল।

এই যে এত শক্তিশালি গণমাধ্যম তার কিন্তু সমাজের ওপর বিরাট একটি যাদুকরী প্রভাব রয়েছে। পৃথিবীর সূচনাপর্বে ছিল শব্দ বা কথা। পর্যায়ক্রমে মানুষ বই বা সংবাদপত্র তথা মুদ্রণ মাধ্যমে তাদের মনের কথা বলতে চেয়েছে, জানাতে চেয়েছে। এতে বোধহয় মানুষের মধ্যকার আত্মিক যোগাযোগের দুরত্ব বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু একটা পর্যায়ে গিয়ে ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে মানুষ রেডিও ও টিভির মতো গণমাধ্যমের আবিষ্কার করেছে এবং সম্ভবত আত্মিক বন্ধনটাও ফের জোড়া লেগেছে। ফলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথার মাধ্যমে মানুষ



www.pathagar.com

যেমন একে অপরকে তার মনের কথা, বিশ্বাসের কথা, ভালোবাসার কথা বলতে চেয়েছে বা পেরেছে, এখন রেডিও টিভির মাধ্যমেও সেই কাজটি সে অনায়াসে সারতে পারছে। কথার যে যাদুকরী প্রভাব রয়েছে তা জার্মানীর নাৎসীবাদী একনায়ক হিটলারও বুঝতে পেরেছিলেন। হিটলার তার মেইন কাম্‌ফ (Mein Kamph) গ্রন্থে বলেছেন : The power which set sliding the greatest historical avalanches of political and religious nature was from the beginning of time, the magic force of spoken word alone.[৩]

প্রকৃতপক্ষে শ্রোতা বা দর্শকের কাছে রেডিও বা টিভি থেকে উচ্চারিত শব্দমালা প্রায় ঈশ্বরে বিশ্বাসের নামান্তর। গণমাধ্যমের অতিরঞ্জিকা ভূমিকার (Exaggerated notion) কারণেই এমনটা ঘটে। অর্থাৎ গণমাধ্যম থেকে বিশেষ করে রেডিও টিভি থেকে যা কিছু প্রচারিত হয় তা সবই সত্য ও বিশ্বাসযোগ্য।[৪]

যদিও গত পনের বছর বাংলাদেশ টিভি থেকে যা কিছু বলা হয়েছে, প্রচার হয়েছে তা থেকে জনগণ এক সময় বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছিল যে বিটিভি থেকে যা কিছু প্রচারিত হয় তা বোধহয় সবই মিথ্যা। এখন এমন বিশ্বাসও জন্মেছে যে এথেকে সত্য কথা বললেও তা বিশ্বাস করতে মানুষের আরো কিছু সময় লাগবে। যেমন করে বৃটিশ সাংবাদিক ও চিন্তাবিদ ম্যালকম মুগরিজ বলেছিলেন, Television is bound to deceive. Even if you put the truth into it, it comes out a deception (অর্থাৎ টেলিভিশন প্রতারণা করতে বাধ্য। এর মধ্যে সত্য দিলেও সেটা মিথ্যা হয়ে বেরিয়ে আসবে)।[৫]

অবশ্য বর্তমান সময়ের সচেতন ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠী সত্য ও মিথ্যার ভেদরেখাটা যে নির্ধারণ করতে পারে না তাও নয়। তবে হিটলারের প্রচারণা কর্মকর্তা জোসেফ গোয়েবল্‌সের সেই তত্ত্বানুযায়ী একটি মিথ্যাকে নিরানব্বই বার সত্য বলে প্রচার করলে শততম সময়ে তা সত্য বলেই প্রতীয়মান হয়।

সত্যমিথ্যার এইরকম একটা দীর্ঘ প্রহেলিকার ভেতর দিয়ে চলার পর 'এপ্রিল, মে, জুন, '৯৬' এই তিনটি মাস যেন বাংলাদেশ টেলিভিশনের মোহমুক্তি ঘটেছিল। এবারের অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ এবং সর্বজনগ্রাহ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানে বিটিভির যে ভূমিকা, তা বাংলাদেশের প্রাপ্তবয়স্কদের সত্তর শতাংশের ওপর ভোটারকে ভোটদানে উৎসাহিত করেছিল। টিভি যে কতবড় সামাজিক ভূমিকা রাখতে পারে তা এবারের সংসদ নির্বাচনে বোঝা গেছে। এ বিষয়টি বিস্তৃত করার আগে আরো দুয়েকটি প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করা জরুরি।

যোগাযোগের একজন দিকপাল ও পণ্ডিত উইলবার শ্র্যাম তার Television in the lives of our children -এ একবার বলেছিলেন :

...শিশুর জীবনে একটা কোন কিছুর কারণে তারা টিভির পর্দায় একটি বিশেষ অভিজ্ঞতার স্বাদ নিতে চায়। এই অভিজ্ঞতা এর পর তাদের জীবনের গভীরে



www.pathagar.com

প্রবেশ করে ও সঞ্চিত জ্ঞান, সংকেতবদ্ধ মূল্যবোধ, সামাজিক সম্পর্ক এবং ইতিমধ্যে তাদের জীবনের অঙ্গ এমন সব জরুরি প্রয়োজনের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়। ফলে তাদের মূল অভিজ্ঞতায় কিছু একটা ঘটে, কিছু বাতিল হয়, কিছু সঞ্চয় হয়। সম্ভবতঃ কিছু বাহ্য আচরণের প্রকাশ ঘটে। এই হচ্ছে টিভির ক্রিয়া (Effect of Television)।[৬]

এই পরিবর্তনটা শুধু শিশু নয়। বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, বিশেষ করে যে মানুষটি নতুন নতুন টিভি দেখছে। কারণ 'যোগাযোগ মাধ্যম রুচির পরিবর্তন ঘটায়, প্রতিবিম্বিত করে। এ পরিবর্তন শিশু ও পূর্ণবয়স্ক উভয়ের ক্ষেত্রেই ঘটে।[৭] ...যোগাযোগ মাধ্যমে একনাগাড়ে লেবেল আঁটা অনুষ্ঠান প্রচার চলতে থাকলে, বিভিন্ন মানুষ ও ঘটনা সম্পর্কে দর্শক শ্রোতার একটা মনোভাব গড়ে উঠবে এবং ঐ মনোভাব একবার দানা বেঁধে গেলে অভিজ্ঞতায় অর্জিত মূল্যবোধের মতই তা কায়েমী হয়ে বসবে, সেটাকে সরিয়ে দেয়া সহজ হবেনা।[৮]

এ থেকে একটা ধারণা হতে পারে যে টিভি নিজেই বুঝি এক অদৃশ্য মানবের মতো কলকাঠি নাড়ছে। কিন্তু টিভি প্রযুক্তি সম্পূর্ণভাবেই একটি যান্ত্রিক প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তির পিছনে অবশ্য মানুষের শ্রম, চিন্তা ও মেধা নিয়োজিত। কিন্তু টিভিকে এমনভাবে উপস্থাপিত করা হয় যে তা অদৃশ্য এক অতিমানবিক রূপে আবির্ভূত হয়। অথচ এ চিরসত্য, টিভির 'মধ্যাবর্তন' (Intervention) সম্পূর্ণরূপেই মানুষের, যন্ত্রের নয়। হয়তো একারণেই যোগাযোগের আরেক পণ্ডিত মার্শাল ম্যাকলুহান টিভিকে Extension of senses অর্থাৎ 'ইন্দ্রিয়ের সম্প্রসারিত রূপ'[৯] বলে অভিহিত করেছেন। ম্যাকলুহানের গুরু হ্যারল্ড ই. ইনিস তার উদ্ভাবিত 'প্রযুক্তি নির্ধারণবাদ' (Technological Determinism) সম্পর্কে যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে বলেছেন—

...কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে সমাজে যে প্রকৃতির প্রযুক্তি প্রচলিত থাকে সেই প্রযুক্তি ওই সমাজে লোকজনের চিন্তাধারা ও আচরণকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করে।[১০] ইনিস যেখানে প্রযুক্তিকে স্রেফ প্রযুক্তি হিসেবেই দেখেছেন, ম্যাকলুহান সেখানে সেই প্রযুক্তিকে একটি মানবিক রূপ হিসেবেই দেখেছেন। আর তাই তিনি টিভি প্রযুক্তিকে মানুষের ইন্দ্রিয়ের সম্প্রসারিত রূপ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। ম্যাকলুহান ইনিসের বক্তব্যের ধারণাকে আরো বিস্তৃত করে টিভিকে 'শীতল'[১১] যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেছেন :

...টিভি শ্রবণ-দর্শন উদ্দীপকগুলোকে নানাভাবে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে বিপুল সামর্থ্যের অধিকারী যা খুব বেশি মাত্রায় অথচ পরোক্ষভাবে শ্রোতা-দর্শকের অংশগ্রহণ সম্ভব করে তোলে।[১২]

১২ জুনের নির্বাচনে বাংলাদেশের সাধারণ জনগণের বিপুল সংখ্যায় অংশগ্রহণ টিভির সেই বিপুল সামর্থ্যকেই তুলে ধরেছে। সামাজিক ক্ষেত্রে টিভির কি সর্বগ্রাসী



www.pathagar.com

ভূমিকা তা '৯২ এর মার্কিন নির্বাচনের সময়ও বোঝা গিয়েছিল। বিল ক্লিনটন, জর্জ বুশ ও রস পেরোকে নিয়ে সেবার মার্কিন টিভি নেটওয়ার্কগুলো যে বিতর্কানুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল জনগণের ওপর। সেই নির্বাচনের সময় যারা ছিল কোন দল বা প্রার্থীর অন্ধ সমর্থক তাদের মধ্যেও একটা নাড়া দিয়েছিল ওই বিতর্কানুষ্ঠান। আর যারা ছিল অস্থিতিশীল ভোটার তারা বিতর্কানুষ্ঠানে ক্লিনটনকেই ভোট দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল।

১৯৪০ সালের গোড়ার দিকে টিভি গণমাধ্যম হিসেবে গড়ে ওঠার আগে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় পল ল্যাজার্সফেল্ড, বার্নাড বেরেলসন ও হেজেল গডেট ভোটারদের ওপর গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে একটি সমীক্ষা চালিয়েছিলেন। ওই সমীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল নির্বাচন উপলক্ষে গণমাধ্যমগুলোতে যে প্রচারণা অভিযান চলে ভোটারদের ওপর তার ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা।

সমীক্ষায় প্রস্তুত ফলাফলের ভাষ্য ছিল 'সমীক্ষাধীন কিছু ব্যক্তি (রেসপণ্ডেন্ট) গণমাধ্যমগুলো থেকে প্রাপ্ত উপাদান দ্বারা 'সক্রিয়' হয়ে ওঠেন। অর্থাৎ একটা নির্ধারিত ধারায় ভোটদানের সুপ্ত মানসিকতা তাঁদের ছিল কিন্তু সেই প্রাকমনোভাবকে এমন একটা মাত্রায় দানা বাঁধানোর প্রয়োজন থেকে যায়, যে মাত্রায় সেই মনোভাব বলিষ্ঠ ও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।[১৩]

গত ১২ জুন সমাপ্ত জাতীয় সংসদের নির্বাচনের সময় ঢাকার মতিঝিল সবুজবাগ আসনের আরামবাগ হাইস্কুল কেন্দ্রে আগত একটি মেসের কাজের মেয়ে বিভাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল সে কিভাবে ভোট দিতে এসেছে। জবাবে সে বলেছে ভোট দেয়ার ব্যাপারে তার কোন আগ্রহই ছিল না। কিন্তু মেসের বাসিন্দাদের টিভিতে ভোট দেয়ার ব্যাপারে প্রচারণা বারবার দেখতে দেখতে তার ভোটদানের সুপ্ত মানসিকতা আরো জাগ্রত হয়ে ওঠে। সে কোনমতে তার নাম সই করতে পারে। কিন্তু সে তার পছন্দসই প্রার্থীর মার্কা চেনে। অতএব সেই মার্কাকে আশ্রয় করেই সে ভোট দিতে যায়। অবশ্য ভোট দেয়ার নাগরিক অধিকার সম্পর্কে সে মেসের একাধিক শিক্ষিত বাসিন্দার কাছ থেকে জানতে পেরেছিল। নির্বাচনের দিন মতিঝিল, আরামবাগ, ফকিরেরপুল, কমলাপুর ও গোপীবাগ এলাকার মেসের ২১ জন কাজের মেয়ের সাক্ষাৎকার নিয়ে জানা গেছে তাদের ১৭ জনই টিভিতে ভোটের কথা দেখতে পেয়ে এবং মেসের লোকদের অনুপ্রেরণায় ভোট দিতে এসেছে। অর্থাৎ যোগাযোগের 'দ্বিধাপ প্রবাহ'[১৪] তত্ত্বটি এক্ষেত্রে দারুণভাবে কার্যকর হয়েছে।

...এমন অনেক লোক রয়েছেন যাঁরা প্রথমে গণমাধ্যমে উপস্থাপিত উপাদানগুলি দেখেনি বা শোনেনি। এ ধরনের লোকেরা বরং নির্বাচনী অভিযান সংক্রান্ত খবরা-খবর পেয়েছেন এমনসব লোকের কাছ থেকে যাঁরা ওই খবর বা বার্তা সবার আগে সর্বপ্রথম গণমাধ্যম থেকেই পেয়েছেন। ...দুটি মূল পর্যায় হয়ে তথ্য অগ্রসর হয়। প্রথমত : তথ্যমাধ্যম থেকে অপেক্ষাকৃত তথ্যসমৃদ্ধ ব্যক্তিদের কাছে যাঁরা ঘন ঘন


www.pathagar.com

গণযোগাযোগের মুখোমুখি হয়ে থাকে, দ্বিতীয়ত : আন্তর্ব্যক্তিক চ্যানেলের মধ্য দিয়ে তথা একদল লোকের কাছ থেকে আরেক দল লোকের কাছে যায়; শেষোক্ত দলের লোকেরা অপেক্ষাকৃত কম গণযোগাযোগর মুখোমুখি হয়ে থাকেন বা হওয়ার সুযোগ পান এবং তথ্যের জন্য অন্যের ওপর নির্ভর করেন। ...যাঁরা মাধ্যমগুলোর অপেক্ষাকৃত বেশি সংস্পর্শে থাকেন তাঁদের বলা হয় 'অভিমত নেতা'।[১৫] কারণ অচিরেই দেখা যায় যে তাঁরা যাঁদের কাছে তথ্য পৌছে দিচ্ছেন তাঁরা শেষোক্তদের ভোটদান সংক্রান্ত মনোভাব স্থির করার ব্যাপারে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন...।[১৬]

বাংলাদেশের '৯৬ এর নির্বাচনেও টিভির প্রভাব ছিল সীমাহীন। প্রথম থেকেই নির্বাচন কমিশন ভোটারদের শিক্ষাদানের ওপর বেশ কিছু কমার্শিয়াল প্রচারের ব্যবস্থা করেছিল। নির্বাচন কমিশন ১৪টি রেডিও স্পট ও ২২টি টিভি স্পট তৈরি করেছিল। এই সমস্ত কমার্শিয়ালে ভোটারদের নির্ভয়ে ভোটদান, যাকে খুশি তাকে ভোটদান কিংবা ভোটদানের সাংবিধানিক ও নাগরিক অধিকার রক্ষার কথা বারবার ব্যক্ত হয়েছে। ভোট কিভাবে দিতে হয় এসব ব্যাপারেও নির্বাচন কমিশন টিভি মারফত ব্যাপক প্রচার চালিয়েছে। এই কমার্শিয়ালগুলোর ভাষা 'ওভারল্যাপিং' ছিল না। কমার্শিয়ালের বার্তা অতি সাধারণ মানুষের 'জ্ঞানস্তরের' মধ্যে ছিল বলেই হয়তোবা সাধারণ মানুষজনের বিশেষ করে অশিক্ষিতা বা অল্পশিক্ষিতা গৃহবধু বা মহিলাদের ভোটদানই মোট ভোটদানের শতকরা হিসেবটাকে ৭৩.১৯%[১৭]—এ উন্নীত করতে সাহায্য করেছিল।

ভোটারদের শিক্ষাদানের একটি দিক ছাড়াও টিভিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর মেনিফেস্টো সম্পর্কে প্রচারণাও ভোটারদের মনস্থির করতে সাহায্য করেছে তাঁরা কাকে ও কোন দলকে ভোট দেবে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের নিয়ে বিতর্কানুষ্ঠানের অনেকটা কাছাকাছি ছিল বিটিভির 'সবিনয়ে জানতে চাই' অনুষ্ঠানটি। তবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীদের নিয়ে সেখানকার টিভি নেটওয়ার্কগুলো যেভাবে অনুষ্ঠান করতে পারে বাংলাদেশ কিংবা তৃতীয় বিশ্বের বহুদলীয় গণতন্ত্রের দেশের পার্লামেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের বা দলীয় নেতাদের নিয়ে তা করা খুব সহজ নয়। তবু 'সবিনয়ে জানতে চাই' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন বড় দলের কাছে তাদের নির্বাচনী কর্মকাণ্ড, অতীতের কার্যাবলী এবং ভবিষ্যতের দিক নির্দেশনা বা কর্মকাণ্ডের রূপরেখা সম্পর্কে প্রশ্ন রেখে প্রকৃতপক্ষে তাদের কথাবার্তা তথা বার্তা জনগণের কাছে পৌছে দেয়া হয়েছে।

আমাদের দেশের অশিক্ষিত জনগণের কাছে দলের কর্মসূচী, কর্মকাণ্ড বা বার্তা পৌছে দেয়ার জন্য যেভাবে নির্বাচনী প্রচারণা চালানো হয় অর্থাৎ ঢাক-ঢোল পিটিয়ে শহর-নগরের বাড়ি-ঘরের গাত্রে লেখাজোখা করে, মাইকিং করে ও যানবাহনের মাধ্যমে দূষণের মতো ঘটনা ঘটানোর যে ফন্দিফিকির আঁটা হয় তার অনেকগুলো থেকেই আমরা এবার মুক্ত ছিলাম। এবার দেয়াল লিখনের ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল,



www.pathagar.com

মাইক বাজানো সীমিত ছিল, যানবাহন ও মশাল মিছিল নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু টিভি প্রযুক্তির কল্যাণে দলের কর্মসূচী যখন ভোটাররা জানতে পেরেছে তখন তাঁরা মনে মনে স্থির করে নিয়েছিল তাঁরা কাকে বা কোন দলকে ভোট দেবে।

১২ জুনের নির্বাচনে শতকরা হিসেবে কিংবা আসনের দিক দিয়েও বিএনপি আওয়ামী লীগের থেকে বিশাল ব্যবধানে পিছিয়ে নেই। কিন্তু জনগণের একটা অংশ এমনকি বিএনপির ভেতরের লোকজনই মনে করেন 'সবিনয়ে জানতে চাই' অনুষ্ঠানের পর ভোটারদের কাছে বিএনপির ইমপ্রেশান খারাপ হয়ে গিয়েছিল। উল্টোদিকে এই অনুষ্ঠানের পর আওয়ামী লীগ ভোটারদের মন জয় করতে পেরেছিল। অবশ্য এটা ঠিক, 'সবিনয়ে জানতে চাই' অনুষ্ঠানটি অথবা 'যাকে খুশি তাকে ভোট দেবো' থীমের ওপর তৈরি স্পট না হলেও হয়তো আওয়ামী লীগ জিতে যেতো কিন্তু ওই দুটো বিষয় আওয়ামী লীগকে জয়লাভে সাহায্য করেছে। পূর্বাভিজ্ঞতাকে স্মরণে এনে বলা যায়, '৯১ এর নির্বাচনের সময় টিভি মাধ্যমে শেখ হাসিনার নির্বাচনী ভাষণ ভোটারদের মন জয় নয়, বরং দূরে সরিয়ে দিয়েছিল বলেই অনেকের ধারণা।

১৯৫২ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোয়াইট আইজেনহাওয়ার তার প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে বেশ কৌশলেই জিতেছিলেন এবং সম্ভবত বিজ্ঞাপনী প্রচার ছাড়াই নির্বাচনে জিততে পারতেন। কিন্তু নির্বাচনী বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন, বিজ্ঞাপনী প্রচার তার বিজয়লাভে সাহায্য করেছিল।[১৮]

চল্লিশের দশকের শেষভাগে যুক্তরাষ্ট্রে টিভি সেট বিক্রির পরিমাণ যখন তরঙ্গমালার মতো স্ফীত হয়ে উঠেছিল তখন থেকেই মার্কিন নির্বাচনে টেলিভিশন একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে। পশ্চিমা বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, 'প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এবং নির্বাচনী প্রচারণায় এই মাধ্যমটির উদ্ভাবনী প্রয়োগের ফলে টিভির ভূমিকা আরো বাড়ছে'।[১৯]

১৯৫২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে টেলিভিশন বড় ধরনের ভূমিকা পালন করেছিল। সেসময় রিপাবলিকান প্রার্থী আইজেনহাওয়ার ও তার ডেমোক্র্যাট প্রতিদ্বন্দ্বী আদলাই স্টিভেনসন ভোটারদের কাছে পৌঁছার জন্য টিভিতে সময় কিনে কমার্শিয়াল প্রচার করেছিলেন। সে সময়টা টিভি সংবাদ ও জনগণের কার্যক্রম সম্পর্কে প্রচার প্রচারণার শৈশবকাল। অতএব বিজ্ঞাপন জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল ভালোমত।[২০]

১৯৯২ সালের নির্বাচনের সময় প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন 'ডোনাহিউ শো' নামে সেখানকার একটি টিভি নেটওয়ার্কের ট্যাবলয়েড টিভি টক শো'তে হাজির হয়েছিলেন। এই টিভি শো'টি আমেরিকার দিনের বেলাকার টিভি শো'গুলোতে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। তিনি ছিলেন সেই প্রোগ্রামের এক ঘন্টার অতিথি। এই প্রোগ্রামের জনপ্রিয়তা ছিল। ক্লিনটনের প্রচারণা কর্মীরা সন্দেহাতীত ভাবেই চিন্তা



www.pathagar.com

করেছিলেন যে এই প্রোগ্রামে হাজির হলে প্রার্থী হিসেবে ক্লিনটন এমন সব ভোটারদের কাছে পৌঁছুতে পারবেন যারা কখনই সংবাদ শোনেনি কিংবা গণকার্যক্রম সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়না।[২১]

আরেকটি উদ্ভাবনী দিক হিসেবে ক্লিনটন 'এমটিভি' নামক চব্বিশ ঘন্টার মিউজিক ভিডিও কেবল নেটওয়ার্কে আবির্ভূত হতেন। এখানেও ক্লিনটন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভোটারের কাছে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন যাঁরা খবর দেখেন না বা গণবিষয়ক প্রোগ্রাম দেখেন না।[২২]

সে সময়ের নির্দলীয় প্রার্থী রস পেরো পৃথিবীর প্রথম গ্লোবাল নিউজ টিভি নেটওয়ার্ক সিএনএন-এ 'ল্যারী কিং লাইভ শো' ও অন্যান্য বিনোদনমূলক প্রোগ্রামে বারবার হাজির হয়েছেন। অপরদিকে প্রেসিডেন্ট বুশ 'ল্যারী কিং শো' তে একবার হাজির হলেও অপ্রচলিত প্রোগ্রামগুলো এড়িয়ে গেছেন।[২৩]

বাস্তব দিক হলো যে সিএনএন-এ প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীদের বারবার আবির্ভাব তাদের শুধুমাত্র আমেরিকান টিভি দর্শকদের কাছেই পৌঁছে দেয়নি বরং তা বিশ্বজুড়ে সকল দর্শকের কাছেই পৌঁছে দিয়েছিল। উল্লেখ্য, সেবার সিএনএন-এর প্রোগ্রামগুলো বাংলাদেশের জনগণের মাঝেও দারুণ সাড়া ফেলেছিল। আর এজন্যেই হয়তোবা ঢাকায় ক্লিনটন সমর্থক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল এবং তারা ক্লিনটনের বিজয়ে ঢাকায় বিজয় মিছিলও করেছে।

সিএনএন-এর কল্যাণে '৯২ সালের নির্বাচন বিতর্ক সম্পর্কে আমরা জানলেও কিংবা তা উপভোগ করলেও নির্বাচনী প্রচারণায় টেলিভিশনের ব্যবহার পুরোপুরি নতুন নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, 'মধ্যরাতের বিনোদনমূলক প্রোগ্রাম 'জ্যাক পার শো'তে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী জন এফ কেনেডী হাজির হতেন। '৫০ এর দশকের শেষভাগে এবং '৬০ এর দশকের প্রথমভাগে এই প্রোগামটি খুব জনপ্রিয় ছিল। এখন সেখানে সকল ধরনের টেলিভিশন স্টেশন ও সকল ধরনের টিভি শো হচ্ছে নির্বাচনেচ্ছু প্রার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্লাটফর্ম।[২৪]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তরকালে মার্কিন প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনের সংবাদ কভার করেছেন এমন একজন সাংবাদিক থেওডোর হোয়াইট বলেছিলেন, Television is the political process. It's the playing field of politics[২৫]

দেশে বিদেশের অভিজ্ঞতার আলোকে একটা সিদ্ধান্তে আসা যায়। সেটা হলো '৯৬ এর নির্বাচনে একটা সীমিত পর্যায়ে টিভির কার্যকর ব্যবহারের প্রেক্ষিতে বলা যায়, আগামী দিনের নির্বাচনগুলোকেও নিয়ন্ত্রণ করবে টিভি। বাংলাদেশের মানুষ আরো বেশি শিক্ষিত ও সচেতন হলে নির্বাচনের সময় বিভিন্ন দলীয় ও নির্দলীয় প্রার্থীদের রাস্তাঘাটে মিছিল, মিটিং, বাড়ি ঘরে দেয়াল লিখন কিংবা পোস্টার লাগানোর দরকার হবে না। বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনসংযোগ করার পাশাপাশি সংবাদ মাধ্যমে বিশেষ করে টিভি মাধ্যমে প্রার্থীরা তাঁদের নীতি, আদর্শ বা কর্মকাণ্ডের কথা জানাতে পারবেন।



www.pathagar.com

উল্টোভাবে বলা যায় গণমাধ্যম বিশেষ করে টিভি নির্বাচনের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড, পরিবেশ ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে একটি চমৎকার ক্ষেত্র তৈরি করে দিতে পারলে নির্বাচনেচ্ছু দলীয় বা নির্দলীয় প্রার্থীরা নির্বাচনী প্রচারণার ভৌত ও বাহ্যিক উপকরণসমূহ পরিত্যাগ করে ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে জনসংযোগ করতে পারবেন। কারণ 'The mass media can focus attention... in countries where the media are common, a political candidate has little chance unless the people have become well acquainted with him through the media.'[২৬]

তবে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন উন্নত দেশে টিভির প্রক্ষেপণের যে সুবিধা ও সুযোগ রয়েছে তা আমাদের দেশে সম্ভব নয়। বিটিভি এখন পর্যন্ত রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত। বিএনপি আমলে একবার বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টিভিতে সময় কিনে তার দলের কর্মকাণ্ডের কথা জানাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অনুমতি পাননি। কিন্তু এখন বিটিভির স্বায়ত্ত্বশাসন প্রদানের একটা চিন্তা করা হচ্ছে। পাশাপাশি পুরোপুরি বেসরকারী খাতে আরেকটি টিভি চ্যানেল খোলার অনুমতি দানের চিন্তাভাবনা চলছে। কিন্তু তারপরেও অদূর ভবিষ্যতের নির্বাচনেও দলীয় বা নির্দলীয় প্রার্থীরা সময় কিনে টিভিতে কথা বলার সুযোগ তেমন হয়তো পাবেন না। যুক্তরাষ্ট্রে অবশ্য প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীরা টিভির সময় কিনতে পারেন। কিন্তু অনেক দেশেই তা নিষিদ্ধ। অনেক বিশেষজ্ঞ অবশ্য বলেন, টিভির সময় ক্রয়ে প্রচুর পয়সার দরকার তাই এ ধরনের প্রচারণায় অর্থ হয়ে উঠবে সবচেয়ে প্রভাবশালী চলক। কালো টাকার প্রভাবও তাতে বাড়বে যা নিয়ে এবারের নির্বাচনে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। অবশ্য একথা ঠিক, নির্বাচন কমিশনের বেঁধে দেয়া তিন লাখ টাকা ব্যয়সীমা যে একটি অবাস্তব বিধিনিষেধ তা নির্বাচন পরবর্তীকালে অনেক বিশেষজ্ঞই মন্তব্য করেছেন। '৯৬ এর নির্বাচনে বড় দলের অনেক প্রার্থী আট-দশ লাখের কমে নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে পারেননি। অতএব তিন লাখের ব্যয়সীমাটা না বাড়ালে এই বিধিনিষেধ মান্য করার নির্দেশটি অকার্যকর হয়ে পড়বে।

যাই হোক, ইলেকট্রনিক প্রযুক্তি যেভাবে ধেয়ে আসছে তাতে করে আগামী নির্বাচনগুলোতে টিভি, কেবল্ টিভি বা স্যাটেলাইট স্টেশনগুলোর প্রোগ্রাম বা শো'কে আর কোনমতেই এড়ানোর উপায় নেই। আমাদের দেশে শিক্ষিতের সংখ্যাটা গাণিতিক হারে বাড়লেও সংবাদপত্র বা রেডিওর তুলনায় টিভি দর্শকের সংখ্যা জ্যামিতিক হারেই বাড়ছে। যদিও সারাদেশে টিভি সেটের সংখ্যা এখন পর্যন্ত সাড়ে তিনি লাখের বেশি নয়।[২৭] কিন্তু বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর ৪৫% এখন টিভি দেখে থাকে। অবশ্য তাদের সবাই টিভি থেকে প্রচারিত সংবাদ দেখে না।[২৮] তবু টিভির মতো গণমাধ্যমের মারফতেই ভোটারদের কাছে নির্বাচন প্রার্থীদের পৌঁছা সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে, ভোটারের সঙ্গে আন্তর্ব্যক্তিক যোগাযোগের চমৎকার ক্ষেত্রটি এবার তৈরি করে দিয়েছিল টিভি। 'The mass media can feed the interpersonal channels. The influential persons whose



www.pathagar.com

advice and viewpoints bulk large in the interpersonal decision process of society are typically heavy users of mass media'[২৯]

গণমাধ্যমের বিশেষ করে টিভির প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে ভোটারের সঙ্গে প্রার্থীদের আন্তর্ব্যক্তিক যোগাযোগের (জনসংযোগ) অপূর্ব সংমিশ্রণ হয়েছিল বলেই এবারের নির্বাচন ঈদের মতো উৎসবের রূপ নিয়েছিল এবং বিপুল সংখ্যক মহিলাসহ ভোটাররা দলবলে ভোটকেন্দ্রে হাজির হয়েছিল সেই কাকডাকা ভোর থেকেই।

**তথ্যসূত্র :**


১. ইমপ্যাক্ট অব ম্যাস মিডিয়া (২য় সংস্করণ)-রে এলডন হাইবার্ট ও ক্যারল রিউস সম্পাদিত; পৃষ্ঠা-৬৩

২. অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু জার্নালিজম (২য় সংস্করণ)-এফ. ফ্রেজার বন্ড, পৃষ্ঠা-৬

৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৬

৪. শিল্প ও যোগাযোগ, -সুধাংশু শেখর রায়, প্যারাগণ পাবলিশার্স, ১৯৯৩; পৃষ্ঠা-৫৪

৫. যায়যায় দিন, বর্ষ-৪, সংখ্যা-২৩, ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩; পৃষ্ঠা-৩

৬. যোগাযোগ গবেষণা/ অর্ধশতাব্দীর মূল্যায়ন-ডানিয়েল লার্ণার ও লাইল এম, নেলসন; সরদার অমজাদ হোসেন অনূদিত; পৃষ্ঠা-৭

৭. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৯

৮. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-১৪

৯. আন্ডারস্ট্যান্ডিং মিডিয়া-মার্শাল ম্যাকলুহান, পৃষ্ঠা-১৯

১০. গণযোগাযোগ তত্ত্বাবলী-মেলভিন এল ডিফ্লোর ও স্যান্ড্রা জে বল রাকেশ-আফতাব হোসেন অনূদিত; পৃষ্ঠা-২২৩

১১. আন্ডারস্ট্যান্ডিং মিডিয়া-মার্শাল ম্যাকলুহান, পৃষ্ঠা-২২ ও ২৩। এখানে লেখক বলেছেন A hot medium is one that extends one single sense in the state of being well filled with data. ...Hot media are, low in participation, and cool media are high in participation or completion by the audience.

১২. গণযোগাযোগ তত্ত্বাবলী-মেলভিন ডি ফ্লোর ও স্যান্ড্রা জে বল রাকেশ; আফতাব হোসেন অনূদিত; পৃষ্ঠা-২২৩

১৩. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-২৩১

১৪. দ্য ইফেক্টস্ অব ম্যাস কমিউকিেশন-জোসেফ টি, ক্ল্যাপার; পৃষ্ঠা ৩২। এখানে লেখক এক জায়গায় বলেছেন : ...ideas often flow from radio and print to the opiniom leaders and from them to the less active sections of the population, দ্বিধাপ প্রবাহ (Two step flow) তত্ত্বটির




www.pathagar.com

ধারণা দিয়েছিলেন ল্যাজার্সফেল্ড, বেরেলসন ও গডেট নামের তিন গবেষক। তাঁদের গবেষণা কর্মটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ সালে।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ৩২ ও ৩৩। লেখক একই পৃষ্ঠার আরেক জায়গায় opinion leaders বা 'অভিমত নেতা'র সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, Compared with the rest of the population, [however] opinion leaders were found to be considerabley more exposed to the radio, to the newspapers and to magazines, that is, to the formal media of communication.
সে সময় টিভির প্রচলন তেমন হয়নি তাই অভিমত নেতারা টিভির সঙ্গে সংস্পর্শে ছিলেন কিনা তা বলা হয়নি। তবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে বলা যায় তাঁরা টিভির সঙ্গেও সম্পর্কিত।

১৬. গণযোগাযোগ তত্ত্বাবলী- মেলভিন এল. ডিফ্লোর ও স্যান্ড্রা জে বল রাকেশ; আফতাব হোসেন অনূদিত; পৃষ্ঠা- ২৩৩, ২৩৪

১৭. পার্লামেন্টারী ইলেকশন '৯৬ অবজারভেশন রিপোর্ট, সিসিএইচআরবি; পৃষ্ঠা-২৬

১৮. টেলিভিশন গো'জ ডিপার ইন ইউএস ইলেকশন; দ্য ডেইলী স্টার, জুন ৯৬

১৯. প্রাগুক্ত

২০. প্রাগুক্ত

২১. প্রাগুক্ত

২২. প্রাগুক্ত

২৩. প্রাগুক্ত

২৪. প্রাগুক্ত

২৫. প্রাগুক্ত

২৬. ম্যাস মিডিয়া এন্ড ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট- উইলবার শ্র্যাম; পৃষ্ঠা-১২৯

২৭. বাংলাদেশ বেতারের জনপ্রিয়তা বাড়ছে না যে কারণে/ দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩০ জুন, ১৯৯৬

২৮. রিপোর্টার্স স্যানস্ ফ্রন্টিয়ার্স, ১৯৯৬ রিপোর্ট, পৃষ্ঠা-২১৪

২৯. ম্যাস মিডিয়া এন্ড ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট- উইলবার শ্র্যাম; পৃষ্ঠা-১৩৪

**পাদটীকা :** ১৯৯৬ এর পর বাংলাদেশে আরো দুটো সাধারণ নির্বাচন হয়েছে-২০০১ ও ২০০৮ সালে। তবে বিশেষ করে ২০০৮ সালের নির্বাচন ছিল টিভি মাধ্যমের দ্বারা প্রায় নিয়ন্ত্রিত। মিডিয়ার উপস্থাপন এমন ছিল যে দলগুলোর রাস্তাঘাটে মাঠে বক্তৃতার দিকে মানুষের দৃষ্টি ছিল না। ফলে মিডিয়ার মাধ্যমে জেনেশুনেই ভোটাররা ভোট দিতে গেছে।
*সূত্র : যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়ক জার্নাল 'যোগাযোগ'-এর ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় (জুন ১৯৯৭) প্রকাশিত।*



www.pathagar.com

# টিভি সংবাদের পরিবেশনা : পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ

এখন থেকে আট-দশ বছর আগের কথা। বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি)-এর প্রাইম টাইম বুলেটিনে (অর্থাৎ রাত আটটার বাংলা বুলেটিন-যে সময় বেশিরভাগ শ্রোতাদর্শক বা অডিয়েন্স সংবাদ দেখা-শোনার জন্য টিভি সেটের সামনে বসে যান) একজন নিউজ কাস্টার (প্রকৃত পক্ষে নিউজ রিডার) তাঁর খবর পরিবেশনের সময় ক্রীড়া বিষয়ক একটি খবর ভুলভালসহ এমন অবলীলায় পড়ে গেলেন যে তাতে বোঝা গেলো ওই খবরের অন্তর্নিহিত অর্থটি সম্পর্কে তাঁর কোনও প্রকার ধারণাই নেই। দোষটা শুধু তাঁর একার নয়। দোষটা ছিল সংশ্লিষ্ট পুরো টিমের। খবরটি ছিল ক্রিকেট খেলার ফলাফল নিয়ে। খবরটির নিখুঁত বিবরণটি এখন আর পুরো মনে নেই। তবে খবর পাঠিকা সেদিন যা পড়েছিলেন তা ছিল নিম্নরূপ :

'নিউজিল্যান্ড ও জিম্বাবুয়ের মধ্যকার দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিনের খেলার শেষে জিম্বাবুয়ে তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে ৭ উইকেটে ৩২৭ রান করেছে। দলের অধিনায়ক ডেভিড হাউটন দিনশেষে ১২৭ রান করে অপরাজিত রয়েছেন। গতকাল তিনি ৫৫ রান করার পর 'হৃদযন্ত্রের গোলযোগের' জন্য প্যাভিলিয়নে ফেরত যেতে বাধ্য হয়েছিলেন'।

যে ইংরেজি শব্দগুচ্ছের (Phrase) বঙ্গার্থ 'হৃদযন্ত্রের গোলযোগ' বলা হয়েছে সেটি সম্পর্কে পূর্ব থেকেই আমার ভালো ধারণা রয়েছে। তারপরেও নিশ্চিত হতে পারছিলাম না। কারণ ভাষাতো গতিময়। কখন কোনটা তৈরি হয়। তারপরেও শব্দগুচ্ছটির ইরেজি রূপটি জানার জন্য রাত দশটার ইংরেজি বুলেটিন দেখার জন্য অপেক্ষায় রইলাম। ইংরেজিতে ওই শব্দগুচ্ছটি ছিল 'Retired hurt'- এর অর্থ হচ্ছে খেলায় (প্রধানত ক্রিকেটে) আহত (বা অসুস্থ) হয়ে খেলা থেকে সাময়িক অথবা দীর্ঘ মেয়াদে অবসর গ্রহণ। ওই খবরাংশটুকু যিনি ইংরেজি থেকে বাংলা করেছিলেন তিনি এর অর্থ না বুঝেই কিছু একটা করে চালিয়ে দিয়েছেন। সম্ভবত তিনি কারো সঙ্গে পরামর্শ করেননি। Dictionary consult করেননি। খবরটি তিনি বাদ দিতে পারতেন, তাও করেননি। তাঁর লেখার পর কোনও এক জন দায়িত্ববান কর্তার স্ক্রিপটি দেখার কথা ছিল তাও হয়নি। আর খবর পাঠিকার এ



www.pathagar.com

সম্পর্কে কোনও ধারণা না থাকায় তিনি অবলীলায় তা পড়ে গেলেন। যিনি তাঁর ভ্রান্ত ধারণায় অনুমানের ওপর (Specualation) ভিত্তি করে ইংরেজি থেকে বাংলা করলেন 'হৃদযন্ত্রের গোলযোগ' হিসেবে, আর যিনি সেটি পড়লেন তাঁদের কারো মাথায় কি এলো না যে হৃদযন্ত্রের গোলযোগের পর একজন মানুষের পক্ষে ব্যাট হাতে সেঞ্চুরী হাকানো অসম্ভব একটি ব্যাপার।

যাঁরা খবর পরিবেশন করেন (শুধুমাত্র পড়েন না) নিয়মানুযায়ী খবর পরিবেশনের আগে তাঁদের একটু রিহার্সাল করে নিতে হয়। এটি একটি দিক। আর পড়ার সময় যদি ভুলভ্রান্তি চোখে পড়ে তবে তা সংশোধন করেই সঠিকভাবে পড়া উচিত, অথবা সেটি পড়াই উচিত নয়। কারণ টেলিভিশন একটি গতিময় মাধ্যম। যা বলবেন তা ফিরিয়ে আনার সম্ভাবনা খুবই কম। অন্যদিকে একটি ভ্রান্তি টেলিভিশন মাধ্যমের চরিত্রের কারণেই দ্রুত প্রচার হয়ে যায় এবং তা সংশয়, গুজব এমনকি সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে। এখন একজন খবর পাঠকের চোখে ভুল ভ্রান্তি যদি ধরা না পরে, তাহলে ধরে নেয়া যাবে যে তিনি সত্যিকারের News Caster নন বরং স্রেফ নিউজ রিডার। তাঁকে যা পড়তে বলা হয় তিনি তা সেজেগুজে এসে শুধু পড়ে যান। অন্যদিকে প্রকৃত News Caster হচ্ছেন তিনি, যাঁর সাংবাদিকতা বিষয়ক দক্ষতা ও দায়দায়িত্ব (Journalistic competence and authority) উভয়ই রয়েছে। নিউজ কাস্টারের দায়িত্ব শুধুমাত্র খবর পাঠ করা নয়, তিনি সেই খবর দক্ষতার সঙ্গে এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সহকারে পাঠ করেন। পড়তে গিয়ে কোনও কিছু ভুল মনে হতে পারে। তিনি সেটি সংশোধন করে পড়েন। প্রয়োজনে পড়া বন্ধ করে দিতে পারেন। কোন খবরাংশ সংশোধন করে দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কারো প্রতি ইঙ্গিত করতে পারেন। কোনও গুরুত্বপূর্ণ খবর সম্পর্কে বিশ্লেষণ ও মন্ত ব্য জানার জন্য তাঁর পাশে বসা কোনও বিশেষজ্ঞকে তাঁর নিজের মতো করে প্রশ্ন করতে পারেন অথবা স্যাটেলাইট বা অন্য কোনও সংযোগের মাধ্যমে স্পটে কর্তব্যরত রিপোর্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। বলার অপেক্ষা রাখেনা বেশির ভাগ বেসরকারি চ্যানেল একাজটি বেশ সুচারুরূপেই সম্পন্ন করছে।

ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের টেলিভিশন সাংবাদিকতা বলতে গেলে এখনও কৈশোরত্বের সন্ধিক্ষণে রয়েছে। অনেক উন্নতি ঘটেছে এর। টেরেস্ট্রিয়াল সুবিধা না পেয়েও অনেকগুলো চ্যানেল সুন্দর সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে বড় একটি ভিউয়ারশীপ (Viewership) ইতোমধ্যেই তৈরি করে ফেলেছে। একুশে টিভি দিয়ে এ যাত্রা শুরু। এখন বাজারে অনেক চ্যানেল। তারা সংবাদ পরিবেশনে একটি নতুনত্ব এনেছে। পুরো না হোক, প্রায় বস্তুনিষ্ঠভাবে অথবা বলা যায় একটু ব্যালেন্স (Balauce) এনে সংবাদের পার্শ্ব প্রতিপার্শ্ব নিয়ে তথ্য পরিবেশন করছে। খবরের মেধা (Merit) অনুসারে সংবাদের গ্রেডেশন ও ট্রিটমেন্ট দিচ্ছে। এতে করেই ভালো একটা ভিউয়ারশীপ তৈরি হয়ে গেছে। বাংলাদেশের টেলিভিশন



www.pathagar.com

চ্যানেলগুলোর প্রাইম টাইম বুলেটিনের সময় বিজ্ঞাপনের মাত্রা (Volume) কেমন এ সম্পর্কে জানতে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের পরিচালিত এক একাডেমিক জরীপে দেখা গেছে চ্যানেল আই, এটিএন-এ বিজ্ঞাপনের পরিমাণ এখন ব্যাপক। এর পরের স্থানটি এনটিভি'র। সাম্প্রতিক সময়ে কিছু ঝামেলা এবং কয়েকদিনের জন্য অনিয়মিত হয়ে পড়ায় এনটিভি'র বিজ্ঞাপনে হয়তোবা একটু ভাটা পড়েছে। অন্যদিকে ইটিভি নতুন করে পরীক্ষা দিচ্ছে সেজন্যে তাদের বিজ্ঞাপনের পরিমাণ এখনও অনেকটা কম। কিন্তু তারপরেও বিটিভির তুলনায় বেসরকারি চ্যানেলগুলোর বিপুল সংখ্যক বিজ্ঞাপন পাবার বিষয়টি প্রমাণ করে এই চ্যানেলগুলোর ব্যাপক ভিউয়ারশীপ তৈরি হয়েছে। আর বিজ্ঞাপনদাতারা সেই টিভি নেটওয়ার্কগুলোই শনাক্ত করে তাঁদের বিজ্ঞাপনী বার্তা পৌছে দেয়ার জন্য, যাদের ভিউয়ারশীপ ব্যাপক। ভালো ভিউয়ারশীপ মানে হলো, সংশ্লিষ্ট সেই চ্যানেল (গুলো) চমৎকারভাবে খবর নির্বাচন ও পরিবেশন করেন। তার জন্যই প্রচুর সংখ্যক শ্রোতাদর্শক সংশ্লিষ্ট চ্যানেলের খবর দেখে থাকে।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ টেলিভিশনও তাদের পরিবেশনায় নতুনত্ব এনেছে। তবে বেসরকারি চ্যানেলগুলোর মধ্যে চলছে ব্যাপক প্রতিযোগিতা। তারপরও একদিকে যেমন ব্যবসা, অন্যদিকে সামাজিক অঙ্গীকার পালন, সব মিলিয়ে অনেক সময় পরিবেশনে এখনও অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটছে। র‍্যাবের 'ক্রসফায়ারে' পড়ে নিহত হওয়া কোনও অপরাধীর বুলেটবিদ্ধ বাঁশের তালাইয়ে মোড়ানো লাশ থেকে রক্ত ঝরা বা মাছি ওড়ার ছবি দেখানো কি চ্যানেলগুলোর অনৈতিক প্রতিযোগিতার ফল নাকি বস্তুনিষ্ঠতা? টিভির মনিটরের Telep (মনিটরের নিচে 'মুভিংবার বা স্ক্রলবার')-এ খবরের যে শিরোনামগুলো দেখানো হয় তার অনেকগুলোই থাকে পুরোনো, বাসী, ভুলে ভরা তথ্য, ত্রুটিপূর্ণ বাক্য, নামের বিকৃত বানান এবং আরো অনেক ভুল। আবার দেখা যায় স্পট থেকে রিপোর্টার খবর পরিবেশনের শেষ প্রান্তে প্রায় সবসময় মন্তব্যধর্মী কথা বলছেন যেটি সাংবাদিকতার নীতির পরিপন্থী। তাঁরা প্রায়শই বলছেন, 'সংশ্লিষ্ট জনগণ মনে করেন এটা হওয়া উচিত (বা উচিত নয়)'। মাইক্রোফোন হাতে তিনি এসব কথা বলছেন বটে কিন্তু ক্যামেরায় ধারণকৃত ছবিতে প্রায়শই আমরা সেই সংশ্লিষ্ট জনগণকে দেখতে পাইনা, তাঁদের কথাও শুনতে পাইনা। কোনও কোনও সময় মনে হয়, সময় বা গতির (Time and speed) চাপের কারণে রিপোর্টার দায়সারা গোছের সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন অথবা এমন সকল মানুষের (Source) সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন যাঁরা (Source) কোনক্রমেই Competent source অথবা Authoritative source নন। Competent source হচ্ছেন তিনি বা তাঁরা যাঁরা কোনও বিষয়ে কথা বলার জন্য পেশাগত যোগ্যতা ও দক্ষতা রাখেন, যেমন ডাক্তার, পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট, উকিল, শিক্ষক, প্রকৌশলী প্রমুখ। অন্যদিকে Authoritative source হচ্ছেন তিনি, যিনি কিছু বলার মতো দায়িত্বপ্রাপ্ত অথবা কোনও প্রত্যক্ষদর্শী। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের



www.pathagar.com

কোনও ঘটনা সম্পর্কে ভাইস চ্যান্সেলর, রেজিস্ট্রার, জনসংযোগ কর্মকর্তা, বিভাগীয় প্রধান দায়িত্ব নিয়ে কিছু বলতে পারেন। একজন প্রত্যক্ষদর্শীও 'কিছু দেখেছেন' বলেই দায়িত্ব নিয়ে কিছু কথা বলতে পারেন। কোনও রোগীর এটেন্ডেন্টও দায়িত্ব নিয়ে সংশ্লিষ্ট রোগীকে চিকিৎসা দেয়া না দেয়ার কথা বলতে পারেন।

টেলিভিশন হচ্ছে মূলত Off-text medium. সংবাদপত্রে ছবির অনেক ব্যবহার হলেও কথাই হলো প্রধান। অর্থাৎ সংবাদপত্র হচ্ছে Text-based medium কিন্তু টিভিতে কথা কম, ছবির ব্যবহার বেশি, কথা ও ছবির পাশাপাশি ধ্বনিরও সমন্বয় ঘটাতে হয় টিভি মাধ্যমে। বাংলাদেশ টেলিভিশনের সাবেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও টিভি সাংবাদিকতার শিক্ষক ফারুক আলমগীর টেলিভিশনকে 'চলমান দৃশ্য ও ধ্বণির লাবণ্য' বলে অভিহিত করেছেন। ব্রডকাস্টিং সাংবাদিকদের মনে রাখতে হবে তিনি কথার সঙ্গে ধ্বনি ও চলমান ছবির (Movie picture) মেলবন্ধন করছেন। তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে কথা (Words) যতটা সম্ভব কম বলে ক্যামেরার সর্বোত্তম ব্যবহারই ভালো। আমেরিকার টিভি চ্যানেল এনবিসি (National Broadcasting Company)-র টিভি নিউজ অপারেশনস্-এর সাবেক কর্মাধ্যক্ষ এড শ্লীডার বলেছিলেন, 'যখনই তুমি পারো তখনই খবরকে ক্যামেরার সামনে নিয়ে আসো'। ক্যামেরা যদি হাতে থাকে (এবং তাই থাকার কথা) তাহলে দৃশ্যসহযোগী (Visual aids) দিয়েই মূলত খবর পরিবেশন করাই ভালো। সাধারণত দৃশ্যসহযোগীর মধ্যে রয়েছে চার্ট (Chart), রেখাচিত্র (Diagram বা Graph), স্থিরচিত্র (Stil picturs), সংখ্যা (Figer), চলচ্চিত্র (Film), ভিডিও টেপ (Video tape), স্যাটেলাইটে গৃহীত চলমান ছবি (Satellite-generated running picture) প্রভৃতি। সংবাদপত্রে সাধারণত কথার পিঠে কথা সাজিয়ে সংবাদ পরিবেশন হয়। আর টিভিতে ছবির পিঠে ছবি সাজিয়ে। একটি মুহূর্তের ছবি ধারণের টেকনিক্যাল নাম হচ্ছে Shot. একটিমাত্র Shot দিয়ে অনেক সময় অর্থপূর্ণ কিছু তৈরি হয়না। কিন্তু একাধিক শট্ যখন একের পর এক সাজিয়ে যাই তখন তা একটি অর্থ প্রকাশ করে। আর সেজন্যেই বলা হয় Shot is the langnase of TV medium। এখন কথা যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু বলে বাকিটা হরেক রকমের শটের মাধ্যমে যখন কোনও কিছু পরিবেশন করা হয় তখন তা অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য ও প্রাণবন্ত হয়। অনেকগুলো শট মিলিয়ে একটি Sequence তৈরি হয়; অনেকগুলো সিকোয়েন্স মিলিয়ে একটি পর্ব বা এপিসোড (Episode) তৈরি হয় আর অনেকগুলো এপিসোড মিলিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রোগ্রাম, সেটা একটি নিউজ বুলেটিনও হতে পারে অথবা একটি বিনোদন প্রোগ্রাম।

সংবাদপত্রে একটি সংবাদশীর্ষ (Intro) লিখতে আমাদের একটি সনাতনী ফরমূলা অর্থাৎ Five W's and one H রয়েছে। টেলিভিশনের খবরে এর প্রথম চারটি অর্থাৎ Who, What, When, Where (কে কি কখন ও কোথায়) মুখের কথায়



www.pathagar.com

বর্ণনা করা যেতে পারে কিন্তু Why and How (কেন ও কিভাবে) ক্যামেরার মাধ্যমে দেখানোই ভালো, কথা দিয়ে এই দুটোকে অনেক সময় ব্যাখ্যা করা যায় না, বোঝানো যায় না। তাই ক্যামেরার শটের মাধ্যমে তা সহজেই বোঝানো যায়। মাঝে মাঝে 'What'ও ক্যামেরায় দেখানো যেতে পারে। তখন স্বাভাবিকভাবে Whoও এসে যাবে।

কথা, ছবি ও ধ্বনির অর্থবহ সমাহার ঘটিয়ে টিভিসংবাদের পরিবেশনের জন্য ১০-পয়েন্টের একটি গাইডলাইন মেনে চলা ভালো। এই গাইডলাইন রেডিও মাধ্যমের জন্যও প্রযোজ্য। ১০-পয়েন্টের গাইডলাইন হলো :

১. **টেলিভিশনের সংবাদ পরিবেশন যেন দু'জনের কথোপকথন** (TV news presentatoin is to be very conversational)। মনে রাখতে হবে টেলিভিশনের সংবাদ পরিবেশন এমন হবে যেন একজন নিউজ কাস্টার আপনার সঙ্গে আপনার ড্রয়িং রুমে বসে কথা বলছেন। সেজন্য বলাটা যেন এমন না হয় একজন রোবট আপনার সামনে ভাবলেশহীন ভাবে কিছু একটা করছে যার ভেতর কোন আবেগ নেই, প্রাণের স্পর্শ নেই, মুখে হাসি নেই। যা আপনি পরিবেশন করছেন তার মধ্যে অবশ্যই অর্থ থাকবে, তথ্য থাকবে, তবে কিছুটা Showmanshipও থাকবে। সেজন্য পোশাক পরিপাটি, ধোপদূরস্থ হতে হবে; ভাষা হবে স্বচ্ছ, সরল সোজা, একটি কথোপকথনযোগ্য পরিবেশ তৈরির জন্যই সার্বজনীনভাবে গৃহীত কথ্য ভাষার ব্যবহার করতে হবে। তবে সেই কথ্যভাষা কোনও সুনির্দিষ্ট অঞ্চলের জন্য নয়। যেমন চট্টগ্রাম ও সিলেটের মানুষ যে ভাষায় কথা বলে। তবে কেউ যদি মনে করে যে সে চট্টগ্রাম অঞ্চলের জন্য একটি কমিউনিটি টেলিভিশন চালু করবে তবে চাঁটিগাঁর ভাষা ব্যবহার করা চলবে। পশ্চিম বাংলার চ্যানেলগুলোও বাংলা ভাষায়ই বলে, তারপরও সে ভাষা বাংলাদেশের সার্বজনীন কথ্য ভাষার মতো নয়। আবার ইদানিং কালের উঠতি ছেলেমেয়েরা যে ভাষায় কথা বলছে, যা কিছু ফ্যান্টাসী ও নীতিবিবর্জিত চলচ্চিত্রের মাধ্যমে আমদানি হচ্ছে, তাও সার্বজনীন টেলিভিশন চ্যানেলের সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে অযোগ্য। মূল কথা হচ্ছে সহজ সরল ও বোধগম্য ভাষায় বেশ সাধারণ ভঙ্গিতে (Informally) সংবাদ পরিবেশন করতে হবে। মনে হবে যেন কোনও পরিচিতজন আমার সঙ্গে কথা বলছে।

২. **টেলিভিশনের খবর সমাজের সর্বশ্রেণীর জন্য** (TV news for all walks of life). লেখাপড়া যিনি জানেন না, তাঁর পক্ষে সংবাদপত্র পড়া সম্ভব নয়; তবে টিভির খবর যেহেতু কানে শুনেই বোঝা যায় আর ভালোভাবে বোঝার জন্য ছবিও থাকে সেজন্য একজন লেখাপড়া না জানা লোকও টিভির খবর বুঝতে পারেন। তবে একটা দিক হলো সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের দক্ষতা ও বোঝার ক্ষমতা সমান নয়। টিভি অডিয়েন্সের কেউ Slow of mind, অর্থাৎ যারা ধীরে বোঝেন। অনেকে আবার



www.pathagar.com

Quick of mind, অর্থাৎ খুব দ্রুত বোঝেন। যিনি জ্ঞানীগুণী, শিক্ষিত এবং মোটামুটি ২০ থেকে ৫০ এর কোটায় যাঁদের বয়স তাঁরা খুব দ্রুত বোঝেন। আবার যারা বয়সে ছোট, শিশুকিশোর তারা কিছু বিষয় দ্রুত বোঝে, আবার কিছু বিষয় আছে যা অনাগ্রহের কারণে ভালো বোঝে না। অপরদিকে যাঁদের বয়স ৬০ এর ওপরে, তাঁদের অনেকে প্রধানত বয়সের কারণেই কম বোঝেন। অপরদিকে আমাদের দেশের বিপুল সংখ্যক মায়েরা খবরের সময় প্রায়ই প্রশ্ন করে থাকেন এটা কি হলো? ওটার মানে কি? এটা তাঁদের সহজাত দোষ নয়। রান্নাবান্না, ঘরগেরস্থালি ও সন্তান লালন পালনের কাজে ব্যস্ত থাকায় টিভির খবরে তাঁদের মনোসংযোগ খুব কম থাকে। তবে শুধু মায়েরা নন, প্রকৃতপক্ষ বেশিরভাগ শ্রোতাই টিভির খবর পূর্ণ মনোসংযোগ নিয়ে শোনেননা। এ জন্য এঁদের বলা হয় Half-way listeners বা অর্ধমনোসংযোগী শ্রোতা। আর সেজনেই টিভির খবর এমন সহজ সরল হবে যে খুব সহসাই বুঝতে পারে সমাজের যে কোনও শ্রেণী বা বয়সের লোক। অন্য একটা কাজ করতে করতেও খবরের অর্থটা যাতে বোঝা যায় পরিবেশনটা হবে সেভাবেই।

৩. **KISS ফরমুলার প্রয়োগ** (KISS formula applied). KISS হচ্ছে টিভি সাংবাদিকতার মূলমন্ত্র। এর পুরো মানে হচ্ছে Keep it short and simple. অর্থাৎ টিভির খবর সবসময়ই খুবই সংক্ষিপ্ত, সরল ও স্পষ্ট হবে। সংবাদপত্রে যাঁরা লেখেন তাঁদের জন্য পরামর্শ হচ্ছে বাক্যের দৈর্ঘ্যের স্ট্যান্ডার্ড ১৭ শব্দের মধ্যে সীমিত রাখার চেষ্টা করা। কম শব্দের বাক্যের অর্থ বুঝতে খুবই সুবিধে হয়। দু'চারটি বেশি হলে খুব একটা অসুবিধা নেই। কিন্তু সম্প্রচার সাংবাদিকতায় এটা হবে আরো কম। সেই শব্দ ও বাক্য প্রয়োগ করবো যার অর্থ খুবই স্পষ্ট ও পরিচিত। ইংরেজি 'Endeavour' পদটি অনেকেই হয়তো নাও বুঝতে পারেন। অতএব এর বদলে 'Effort' অথবা আরো সরল করে 'Try' শব্দটি ব্যবহার করা যেতে পারে। আমরা নিচে দু'টো বাক্যের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করতে পারি কোনটি কঠিন, কোনটি সরল।

'Even in rainy season, the nature is not with us' 'বর্ষাকালেও প্রকৃতি আমাদের সাথে নেই'।

ওপরের বাক্য দুটোতে ব্যকরণগত সমস্যা নেই। কিন্তু একটু যেন ভাববাচক, স্পষ্ট নয়। সাহিত্যের অনুষঙ্গ আছে যেন এতে। বরং এটা লেখা যেতে পারতো এই ভাবে-

'Even in rainy season, there is no rain' আর বাংলায় হতে পারতো-

'বর্ষাকালেও বৃষ্টির দেখা নেই'

অথবা

'বর্ষাকালেও বৃষ্টি নেই'

এবার আমরা একটি রিপোর্টকে কিভাবে সহজ সরল করে তোলা যায় তার একটি নমুনা দেখবো।



www.pathagar.com

মূল রিপোর্ট : A confidential report has just arrived that confirmed us a news of whereabonts of ousted Iraqi President Saddam Hossain, who has been spotted claimed by a civlian at Bosra today.

বাক্যটি টেলিভিশনের প্রেক্ষাপটে দীর্ঘ, জটিল; স্পষ্টতা নেই। তাই একজন সহ-সম্পাদক এটি পুনরায় লিখলেন এভাবে :

A report has just arrived confirming the whereabouts of ousted Iraqi President Saddam Hossain said he has been seen at Bosra today.

বাক্যটি অনেকটা স্পষ্ট; তবে একে আরো সহজ সরল করা যেতে পারে।

A report confirming the whereabouts of ousted Iraqi President Saddam Hossain said he has been seen at Bosra today.

ওপরের খবরটি অনেকাংশেই স্পষ্ট, সহজ সরল। চেষ্টা করলে এটাকেও আরো ছোট সহজ সরল করা যাবে।

৪. **তাৎক্ষণিকতার আবহ তৈরি করা** (Sense of immediacy created).

টিভির খবর এমন ভাবে লেখা ও পরিবেশন হওয়া উচিত যে শ্রোতাদর্শক যেন ভাবতে থাকে কোনও ঘটনা তাঁর সামনেই ঘটছে। আমরা যদি বলি Prime Minister leaves for Mecca to perfom umrah তবে তা দুটো অর্থ প্রকাশ করে। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী হয় উমরাহ পালনের জন্য মক্কা চলে গেছেন অথবা খুব শিগগিরই যাবেন। সদ্য অতীত অথবা নিকট ভবিষ্যত বিষয়ক লেখা বর্তমান কালে লিখলে মনে হয় যেনো তা এখনই ঘটছে, টিভির সংবাদ কলাকারদের দায়িত্ব হচ্ছে শ্রোতাদর্শককে দৃশ্যত চলমান ঘটনার মধ্যে সম্পৃক্ত করা। এজন্য কর্তৃব্যাচ্যে, বর্তমান কালকে আশ্রয় করে লেখা ভালো।

৫. **সূত্র প্রথমে, তথ্য পরে** (Attribution at the begining). সংবাদপত্রে সাধারণত দেখা যায় যে খবরের তথ্যগুলো প্রথমে বলা হচ্ছে এবং তথ্যের সূত্রের পরিচয় পরে দেয়া হচ্ছে। কিন্তু টিভি সংবাদে এটা হবে তার বিপরীত। যদি কোনও চ্যানেল বলে, 'অবরোধ চলবেই, বলেছেন শেখ হাসিনা' তাহলে মনে হতে পারে ওই সংশ্লিষ্ট চ্যানেলটিই যেন অবরোধের পক্ষে বলছে। এভাবে বললে খবরটির ওপর চ্যানেলের বাড়তি ঝোঁক (Stress) আছে বলে মনে হবে। কিন্তু যদি বলা হয়, 'শেখ হাসিনা বলেছেন, 'অবরোধ চলবেই' তাহলে ওই খবরটির বিশ্বাসযোগ্যতা ও সত্যতা (Credibility and authenticity) প্রমাণীত হবে। মূল তথ্য দেয়ার আগে সূত্র উল্লেখ করার এই ধরনটাকে টিভির ভাষায় বলা হচ্ছে attribution. আমাদের দেশের টিভি নেটওয়ার্কগুলোর প্রবণতা হচ্ছে attribution পরে দেয়া। এটার কারণ হলো যে সূত্র প্রথমে না বলে তথ্য আগে দিয়ে তারা একটু বাড়তি চাঞ্চল্য (Sensation) ও রহস্য (Suspense) তৈরি করতে চান। নীতির দিক থেকে তা সঠিক নয়।



www.pathagar.com

৬. **তাজা তথ্যের সাথে সামান্য পটভূমি** (Latest informatoin with little background). আমাদের বেশিরভাগ চ্যানেল অনেক সময় ধরে পুরোনো খবরই বারবার প্রচার করে। এ বিষয়ে পরে একটু বিস্তারিত আলোচনা হবে। আমাদের চ্যানেলগুলোর কয়েকটি ২৪ ঘন্টা ধরে সম্প্রচার করছে। কেউ কেউ দিনের বেশির ভাগ ঘন্টায় ঘন্টায় খবর প্রচার করছে। তার মানে হচ্ছে তাজা তথ্য (Fresh informatoin) দেয়ার সুযোগ তাদের রয়েছে, কিন্তু তাদের অনেকেই তা করছে না বা করতে পারছে না। যেমন কোনও খেলার খবরে কোনও চ্যানেল বলছে 'শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত খেলা চলছে'। এই Vague কথার কোনও মানে নেই। মাঠে মারামারি না হলে, বৃষ্টি না হলে, ভূমিকম্প না হলে খেলাতো চলতেই থাকবে। যাঁরা খেলার খবরে আগ্রহী তাঁরা জানতে চান খেলার সর্বশেষ পরিস্থিতির খবর। আরেকদিন দেখলাম একটি খবরে বলছে 'ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে ১৯৮ রানের জবাবে ভারত এখন ব্যাট করছে'। এরও কোনও মানে হয়না। যেসময় এই তথ্য দেয়া হলো তখন ভারতের স্কোর বিনা উইকেটে ৮০। চ্যানেলগুলোর Telop-এ পুরোনো বাসী খবর আমাদের চ্যানেলে দেখানো হচ্ছে অহরহ। ৩৬ ঘন্টা আগে কোনও ঘটনা ঘটেছে তাও দেখানো হচ্ছে Telop-এ।

তার মানে হচ্ছে হচ্ছে সর্বশেষ তথ্য দেয়ার চেষ্টা করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট খবরের স্পষ্টতা আনতে তার সামান্য পটভূমি (Background) দিতে হবে। যেমন একটি হত্যাকান্ডের বিচারের যে রায় বিচারক আজ দিলেন তা হলো তাজা তথ্য। কিন্তু কোন প্রেক্ষাপটে এই হত্যাকান্ডটি সংঘটিত হয়েছিল তার সামান্য পটভূমি দিলে নতুন শ্রোতার জন্য বুঝতে সুবিধা হয়। পটভূমি সংবাদপত্রের মতো ঠেসে দেয়ার সুযোগ ও সময় টিভিসংবাদে নেই। তাই খুব সামান্যই পটভূমি দিতে হবে।

৭. **বার্তার বারবার উপস্থাপন** (Repetition of message). টেলিভিশনের বার্তা খুব দ্রুত চলে যায় আর সেটা খবরেই হোক কিংবা বিজ্ঞাপনে। একজন হয়তো খবরের শুরুতে বসতে পারেননি বা মনোসংযোগ দেননি। অতএব খবরের শেষদিকে শিরোনামগুলো অবশ্যই আবার বলতে হবে। অনুষ্ঠানের সময় একই বার্তা বারবার প্রচার করলে শ্রোতাদর্শকের তা মনে থাকে বেশি (Recalling and retensioning)। বিজ্ঞাপনে যেমন মূল বার্তাটি মনে গেঁথে রাখার জন্য বারবার ফোকাস করা হয়। তবে খবরের বার্তা যদি সময়ের প্রেক্ষাপটে তার প্রাসঙ্গিকতা হারায় তবে সে বার্তা বারবার প্রচারের কোনও যৌক্তিকতা নেই।

৮. **করা যাবে না কোনও সংশয়ের সৃষ্টি** (Don't confuse). 'হৃদযন্ত্রের গোলযোগ' প্রসঙ্গটি এখানে পুনরায় প্রয়োগযোগ্য। এমন কিছু বলা যাবে না যা সংশয়, সন্দেহ, বিভ্রান্তি, গুজব তৈরি করে। টিভি হচ্ছে একটি Exciting medium. এটা বিদ্যুৎ গতিতে তথ্য বিকিরণ করে এবং তাৎক্ষণিকভাবে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে, অতএব এমন কিছু বলা উচিত নয় যা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মতো ঘটনাও ঘটিয়ে ফেলতে পারে। টিভি সাংবাদিকদের জন্য একটা আপ্তবাক্য হচ্ছে 'When you are in



www.pathagar.com

doubt, find it out'। অর্থাৎ সন্দেহ বা সংশয় হলে তা বাদ দিয়ে দেয়াই ভালো। কিন্তু আজকাল এই ধারণার একটা রূপান্তর ঘটেছে, এখন বলা হচ্ছে 'When you are in doubt, try to find it out' অর্থাৎ সন্দেহ দেখা দিলে ফেলে দেয়াও ঠিক না, আবার চালিয়ে দেয়াও ঠিক না। সন্দেহটা কোথায় তা খুঁজে বের করে তারপর তা প্রচার করাই উচিত।

৯. **স্টাইল রুল অনুসরন** (Follow the style rules). প্রতিটি টিভি নেটওয়ার্কই একটি সুনির্দিষ্ট স্টাইল রুল অনুসরন করে থাকে। প্রতিটি নেটওর্য়াকেরই নিজস্ব পলিসি থাকে। তবে তার মানে এই নয় যে তারা এমন স্টাইল অনুসরন করবে যা কারো সম্মানহানি করে। যেমন আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বিকৃত করে রনা ঠাকুর বললাম অথবা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে দ্বিলা রায় কিংবা সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীকে নির্বিচারে সাকা চৌধুরী বললাম। এরকম প্রচুর আছে যেটা করা অনুচিত। অন্যান্য কিছু স্টাইলের ক্ষেত্রেও স্পষ্টতা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা উচিত। যেমন 'বাংলাদেশে ১৪০ মিলিয়ন মানুষের বাস' না বলে এখানে '১৪ কোটি লোকের বাস' একথা বলাই ভালো। শুধুমাত্র 'সিআইএ' না বলে বলা উচিত 'মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ' প্রভৃতি।

১০. **খবরের শীর্ষ লেখার সঠিক টেকনিক ব্যবহার** (Use right techniques of writing lead). টিভির খবর অনেকাংশে শীর্ষভিত্তিক (Intro-based)। অনেক বড় করে বলার সুযোগ কম বরং বড় করে দেখানোর সুযোগ বেশি। তিনটি টেকনিক বা কৌশল রয়েছে টিভির সংবাদশীর্ষ লেখার। এগুলো হলো Specific, Generic & Chronological. এর মধ্যে তৃতীয় যেটি অর্থাৎ Chronological সেটি প্রকৃত অর্থে সঠিক শীর্ষ নয় বরং এটি কোন ঘটনার ধারাবাহিক বর্ণনা। তবে প্রথম দুটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ এবং এ দুটির একটা দুটো করে উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। কোনও সংবাদ বিবরণীর শুরুতেই সংবাদ ঘটনার মূল বা সুনির্দিষ্ট পয়েন্টটি দিয়ে তথ্যদানের মোক্ষম কাজটি সম্পন্ন করাই হচ্ছে Specific পদ্ধতির কাজ। Specific পদ্ধতির একটি নমুনা হতে পারে নিম্নরূপ :

'সড়ক পরিবহন কর্তারা বলছেন, আজ সকালে প্রবল বর্ষনের সময় ঢাকা বিমানবন্দরের কাছে একটি যাত্রীবাহী বাস উল্টে গেলে ৬ জন নিহত এবং ৩৫ জন আহত হয়'। এবার দেখি একটি ইংরেজি রিপোর্ট।

'Mayor Mr. X of Dhaka city Corporation says he will not seek reelection. He makes it clear today at a press conference and intends to go back to his family business'.

দুটো সংবাদশীর্ষই অনেকাংশে সংবাদপত্রের ধাচেই লেখা। শুধুমাত্র Attribution টা প্রথমে। যে ঘটনা ঘটেছে তার সংক্ষিপ্তরূপ সরল সোজা ভাবে বর্ণনাই Specific পদ্ধতি। তবে Generic পদ্ধতি সম্পূর্ণই আলাদা। কোনও ঘটনা, যে



www.pathagar.com

ঘটনার ব্যাপ্তি ও তেজ (Magnitude and intensity) খুব বেশি, সে ঘটনাটির খবর Specific স্টাইলে সারমর্ম না বলে ঘটনাটি সম্পর্কে একটি ব্যাপক ধারণা দেয়াই হচ্ছে Generic পদ্ধতির কাজ। উদাহরণ দেয়া যাক।

'এইমাত্র দুটো ভয়াবহ দুর্ঘটনার খবর পাওয়া গেলো'...।

অথবা

'Here is big news of Gulf war.'

অথবা

'Breaking news! Saddan Hossain is executed.'

এ ধরনের শীর্ষ দিয়ে উপস্থাপক শ্রোতাদর্শকদের মাঝে একটা Sensation তৈরি করে। তাঁদেরকে alert করে। একটি Climax এর আবহ তৈরি করে। এ ধরনের খবর আচমকা শুনে শ্রোতাদর্শক তাঁদের মনোসংযোগ আরো সুদৃঢ় করে খবরের মূল অংশ শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। এভাবে উপস্থাপনের একটা অন্যতম একটা কারণ হচ্ছে যে ঘটনার পরিমিতি এত ব্যাপক যে স্পেসিফিক স্টাইলে বর্ণনায় সম্পন্ন করা অনেক সময় সম্ভব হয় না। এ ধরনের মূল ঘটনার সঙ্গে আরো কিছু পার্শ্ব ঘটনাও থাকে। তাই সেগুলো একটি একক ঘটনার মধ্যে সন্নিবেশ করা কঠিন হয়। তবে এ ধরনের উপস্থাপনা সব সময়ই হয় এমন নয় কারণ এ ধরনের ঘটনা সবসময় ঘটেনা। অতএব চরিত্র বুঝে এটা করতে হয়।

শেষ কথা : টেলিভিশনের সংবাদ উপস্থাপন একটি যৌথ ও টেকনিক্যাল বিষয়। নিউজ কাস্টারের উপস্থাপনটাই শেষ কথা নয়। সংশ্লিষ্ট লোকজন নিউজ কাস্টারের জন্য বুলেটিনটি কিভাবে তৈরি করে দিলেন তার ওপরই নির্ভর করে নিউজ কাস্টারের উপস্থাপন। তবে নিউজ কাস্টার যদি যথেষ্ট যোগ্য হন তবে দুর্বল প্রস্তুতিতে তৈরি বুলেটিনেও প্রাণ সঞ্চার করতে পারেন। সবশেষ পরামর্শ তাই, আপনি শুধু আবেগরর্জিত একজন স্রেফ খবর পাঠক নন, আপনি একজন চমৎকার 'ফিনিশার ও সেলার' (Finisher and seller)। আপনার চমৎকার সেলিংয়ে আপনার চ্যানেলের লক্ষ্মীর ঝাঁপি আরও স্ফীত হবে।

*সূত্র : বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের জার্নাল 'নিরীক্ষা'র জুন-২০০৭ সংখ্যায় প্রকাশিত।*



www.pathagar.com

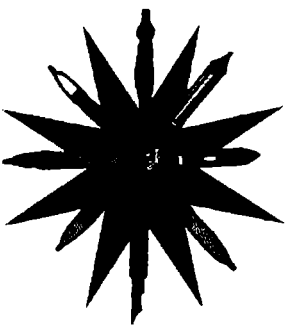

# নীতি ও আইন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

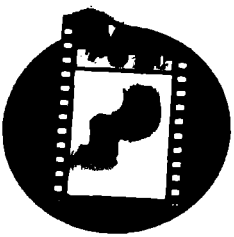

# মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও চলচ্চিত্র : আইনি পরিপ্রেক্ষিত

প্রতিটি মানুষই স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করে।[১] জন্ম নেয়ার পর তাঁর যেমন বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে, তেমনি রয়েছে স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার।[২] সাধারণভাবে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের অধিকার মানুষের আদি ও মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হলেও সভ্যতার বিকাশের এই পর্যায়ে এসে স্বাধীন মত বা ভাব প্রকাশের অধিকারকে মানুষের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মানুষের অন্যান্য মৌলিক অধিকারের মত ভাব বা মত প্রকাশের অধিকারকেও যুগে-যুগে অস্বীকার করার চেষ্টা হয়েছে। মত বা ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে সেই সপ্তদশ শতকেই ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মেতে উঠেছিলেন ইংরেজ কবি জন মিল্টন (১৬০৮-১৬৭৪)। কবি চেয়েছিলেন বিবেকের স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা। তিনি বলেছিলেন, দাও আমায় জ্ঞানের স্বাধীনতা দাও, কথা বলার স্বাধীনতা দাও, মুক্তভাবে বিতর্ক করার স্বাধীনতা দাও। সবার উপরে আমাকে দাও মুক্তি।[৩] মিল্টন যে লড়াই শুরু করেছিলেন তা আজও অব্যাহত। সেই লড়াই আরো বিস্তৃত হয়েছে দেশ থেকে দেশান্তরে। বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়।

## মত বা ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা ও চলচ্চিত্র

মানুষের মুক্তবুদ্ধি, চিন্তা, বিবেক, বাক, মত ও ভাব প্রকাশের অন্যতম বাহন হলো গণমাধ্যম। এই গণমাধ্যমসমূহের মধ্যে রয়েছে সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, বই-পুস্তক, চলচ্চিত্র প্রভৃতি। গণমাধ্যমের একেকটির প্রকৃতি, কার্যধারা ও রূপরেখা ভিন্ন হলেও লক্ষ কম-বেশি এক আর তা হলো দর্শক, শ্রোতা, তথা জনগণের সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং তাদের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত বার্তা পৌঁছে দেওয়া। কিন্তু চাইলেই যে কোন বক্তব্য, তা যত হিতকরই হোক-না কেন, জনগণের কাছে পৌঁছানো যায় না। বিভিন্ন দল, মত, গোষ্ঠী প্রতিবন্ধকতার দেয়াল তো তৈরি করেই উপরন্তু রাষ্ট্রও এর প্রতিকূলে অবস্থান নেয়। রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকার রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, শান্তি-শৃঙ্খলা আর সার্বভৌমত্বের দোহাই তুলে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বাকস্বাধীনতাকে প্রতিহত করার অশুভ প্রয়াস চালিয়ে আসছে। পাশ্চাত্যেও এই


www.pathagar.com

প্রয়াস ছিল, তবে তা রেখে ঢেকে এবং সীমিত আকারে। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ জনগণের বাকস্বাধীনতার মত চিরন্তন ও মৌলিক মানবাধিকারের লঙ্ঘন করা হয় নগ্ন ও নির্লজ্জভাবে, কোনরূপ রাখঢাকের বালাই না রেখে।[৪]

মত বা ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা বলতে শুধু নিজের ভাব প্রকাশের স্বাধীনতাকেই বোঝায় না। অন্যের ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতাকেও বোঝায়।[৫] অর্থাৎ গণমাধ্যমগুলো অন্যের ভাব প্রকাশের কাজে নিয়োজিত।[৬]

'ভাবপ্রকাশের মধ্যে ভাবপ্রচারও অন্তর্ভুক্ত। প্রচারিত না হলে ভাবপ্রকাশ মূল্যহীন হয়ে পড়ে। রেডিও, গ্রামোফোন ও লাউডস্পীকারের মাধ্যমে ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে নিজের ভাবপ্রকাশের কিংবা অন্যের ভাবপ্রকাশের অন্যতম মাধ্যম বা বাহন চলচ্চিত্র।[৭] এছাড়াও টেলিভিশন, ভিডিও তথা দৃশ্য-রূপের যেকোন মাধ্যমেরই ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে রয়েছে অসীম সম্ভাবনা।[৮]

## মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সাংবিধানিক স্বীকৃতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে মত বা ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা ও চিন্তার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। সংবিধানের ৩৯ নম্বর অনুচ্ছেদে এ-স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে :

৩৯। (১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।

(২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংগঠনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত বিধিনিষেধ সাপেক্ষে-

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের এবং

(খ) সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।[৯]

সংবিধানের উল্লিখিত অনুচ্ছেদে আইনের দ্বারা আরোপিত বিধিনিষেধ সাপেক্ষে যে ক'টি স্বাধীনতার অধিকারের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার এলাকা এবং পরিধি বাকস্বাধীনতার এলাকা ও পরিধি হতে বহুগুণ বিস্তৃত। ধ্বনি, লেখনী, চিত্র, অভিনয়, ভঙ্গিমা, ব্যানার, ফেস্টুন অথবা এই শ্রেণীর অন্য মাধ্যম ভাবপ্রকাশের এই স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত।[১০]

বাংলাদেশের সংবিধানে আরোপিত বিধিনিষেধ সাপেক্ষে অন্যান্য অধিকারের সঙ্গে ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের কথা বলা হলেও মানবাধিকার সংক্রান্ত সার্বজনীন ঘোষণার ১৯ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে : Everyone has the



www.pathagar.com

right to freedom of opinion and expression, this right includes freedom to hold opinion without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.[১১] এখানে যেকোন মাধ্যম এবং রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে মত প্রকাশের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আর যে কোন মাধ্যমের মধ্যে চলচ্চিত্রও যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। চলচ্চিত্র এমন একটি মাধ্যম যা রাষ্ট্রীয় সীমানা ও সাংবিধানিক গণ্ডি অতিক্রম করে সমগ্র মানবজাতির জন্য বার্তা পৌঁছে দিতে পারে।

সাধারণ অর্থে ফিল্ম হচ্ছে অভিব্যক্তির মাধ্যম এবং সে-হিসেবেই ভারতীয় সংবিধানে এই মাধ্যমের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। তৎসত্ত্বেও (সে-দেশের সংবিধানের) ১৯ নম্বর ধারার ২ নম্বর সূত্রে এই অভিব্যক্তির স্বাধীনতাকে কিছু যুক্তিগ্রাহ্য আইনকানুনে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।[১২] এসব সাংবিধানিক নিয়মাবলির উপর ভিত্তি করে অন্যান্য অনেক দেশের মতো বাংলাদেশ ও ভারতে সিনেমা সংক্রান্ত আইন তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারতের সংবিধানে যে যুক্তিগ্রাহ্য আইনকানুনে ভাব ও বাক প্রকাশের এবং চিন্তার স্বাধীনতা সীমিত করা হয়েছে তার প্রায় অনুরূপ চিত্র পাওয়া যায় জার্মানিতে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা বিষয়ে জার্মান সংবিধানের ভাষ্য এ-রকম :

The constitutional basis of the freedom of expression, information, and the press in the Federal Republic is laid down in the first two sections of Article 5 of Basic Law :

(1) Everyone has the right to express and disseminate his opinion freely in speech, writing and images and to inform himself without let or hindrance from generally accessible sources. Freedom of the press and the freedom to report by radio and film are guaranteed. There shall be no censorship.

(2) These rights are limited by the provivions of general laws, legal requirements governing the protection of young people and the right to personal honour.[১৩]

ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের কথা এখানে লেখা হয়েছে এবং সেন্সরশিপ থাকবে না এ-কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। তবে তার পরও দুটি ক্ষেত্রে সেই অধিকারকে সীমিত করা হয়েছে।

যে কোন পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের মাধ্যমে নিজের কিংবা অন্যের ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকার বাংলাদেশের সংবিধানের ৪০ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লিখিত রয়েছে। এতে বলা হয়েছে : "আইনের দ্বারা আরোপিত বিধিনিষেধ সাপেক্ষে কোন



www.pathagar.com

পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসায় পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা কোন যোগ্যতা নির্ধারিত হইয়া থাকিলে অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের অধিকার রহিয়াছে।" অতএব কেউ চলচ্চিত্রকে তার পেশা বা বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন এবং এই বৃত্তির মাধ্যমে তিনি তার নিজের অথবা অন্যের ভাব প্রকাশ করতে পারেন। তবে সে সমাজের কোন শ্রেণীর ভাব প্রকাশ করে, সেটাই বিবেচ্য বিষয়। মানবাধিকার বিষয়ক সার্বজনীন ঘোষণার ২৩ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে : Everyone has the right to work, free choice of employment, to just and favourable condition of work and to protection against unemployment.[১৫] অর্থাৎ, সবার কাজ করার এবং আপন ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ পাবার অধিকার রয়েছে। মিল্টন তাঁর *অ্যারিওপ্যাজিটিকায়* Free market place of ideas[১৬]-এর পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। তাঁর মতে, জনগণের সমস্ত তথ্য ও যুক্তি জানার ও শোনার অধিকার রয়েছে। পরোক্ষে তিনি যেকোন বৃত্তি বা পেশা গ্রহণের স্বাধীনতা ও ভাবপ্রকাশের কথাই বলেছেন। আর আধুনিক বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী গণমাধ্যম হলো চলচ্চিত্র।[১৭] বিশ শতকের প্রথম দিকে চলচ্চিত্র একটি শক্তিশালী গণমাধ্যম, স্বতন্ত্র শিল্প ও বিনোদন মাধ্যম হিসেবে আর্বিভূত হওয়ার সময় থেকেই চলচ্চিত্রের অসাধারণ ও অভাবনীয় জনপ্রিয়তায় শাসক শ্রেণী হয়ে পড়ে ভীত ও বিচলিত।[১৮] কারণ সাহিত্য চিত্রকলা ও সংগীতের চেয়ে চলচ্চিত্রের সঙ্গে দর্শকের যোগাযোগ অনেক বেশি প্রত্যক্ষ এবং দর্শকদের প্রভাবিত করার ক্ষমতাও এর প্রবল।[১৯]

চিত্রকলার মতো এই শিল্প ক্রয়সূত্রে কোন মালিকের গৃহবন্দি হয় না। পিকাসোর চিত্রকর্মের মতো কোন বিত্তবানের সংগ্রহে চলচ্চিত্র বন্দি থাকে না।[২০] চলচ্চিত্রের এ-ক্ষমতার কারণেই বিত্তবাণরা, ক্ষমতাবানরা তাকে বারবার গৃহবন্দি না হলেও মুঠোবন্দি-করার চেষ্টা চালিয়েছে। লেনিন (১৮৭০-১৯২৪) এই চলচ্চিত্রকে অন্য শিল্পের তুলনায় প্রধান ও প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন।[২১] তাঁর বক্তব্য ছিল, চলচ্চিত্র হচ্ছে প্রলেতারিয়েতদের সর্বশ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক অস্ত্র।[২২] চলচ্চিত্র মানুষকে সংগঠিত এবং প্রভাবিত করতে পারে এ-ভয়ে ব্রিটেনসহ কয়েকটি ইউরোপীয় দেশে সোভিয়েত পরিচালক আইজেনস্টাইন (১৮৯৮-১৯৪৮)-এর বিখ্যাত ছবি *ব্যাটেলশীপ পটেমেকিন* (১৯২৫) নিষিদ্ধ ছিল। কারণ ছবিটি সমাজতান্ত্রিক আদর্শে নির্মিত। চলচ্চিত্রের এই প্রভাবন ক্ষমতা সম্পর্কে পোপ পায়াস বলেন, বর্তমানে জনসাধারণকে প্রভাবিত করতে চলচ্চিত্রের চেয়ে শক্তিশালী কোন মাধ্যম নেই।[২৩] এ-জন্যই রাজনৈতিক ভাবাদর্শমণ্ডিত চলচ্চিত্র পৃথিবীর বহু দেশেই নির্মিত হয়েছে এবং হচ্ছে।[২৪]

সমাজ ও জাতি গঠনে চলচ্চিত্রের অমোঘ শক্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে জার্মান প্রচারণা বিশেষজ্ঞ জোসেফ গোয়েবল্‌স বলেন, চলচ্চিত্র হচ্ছে জনসাধারণকে প্রভাবিত



www.pathagar.com

করার সর্বাধুনিক মাধ্যম এবং কোন সরকারই এই মাধ্যমের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করতে পারে না।[২৫] বুর্জোয়া সভ্যতা যখন চূড়ান্ত বিকাশের পর্যায়ে তখনই চলচ্চিত্র শিল্পের জন্ম। ইউরোপ এর আদিভূমি। শক্তিশালী শিল্পমাধ্যম হিসেবে সমাজে চলচ্চিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সে-ভূমিকা চলচ্চিত্র ঠিকই পালন করে কিংবা উল্টোভাবে বললে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে চলচ্চিত্র শ্রেণীবিশেষের স্বার্থ ও লক্ষ্যের সেবা করে চলে।

## চলচ্চিত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ

জাতীয়তাবাদের উত্থান পর্বে বিশেষত প্রথম মহাযুদ্ধের পরপরই চলচ্চিত্রের প্রতিক্রিয়া নিয়ে ক্ষমতাসীনেরা ব্যাপক চিন্তা-ভাবনা আরম্ভ করেন। সে-সময়ের ব্রিটিশ সরকার চলচ্চিত্রের দৃশ্যগ্রাহ্য সম্ভাবনাময় ক্ষমতা সম্পর্কে মোটেও উদাসীন ছিলেন না। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় ছবি সম্পর্কে সর্বদাই নেতিবাচক মনোভাব দেখাতেন এবং ভারতীয় জনমতের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য বিষয়টিকে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে গণ্য করতেন। এ-কথা সত্য, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে উপমহাদেশের ব্যাপক গণআন্দোলন ব্রিটিশ শক্তিকে ভীত করে তোলে। এ-আন্দোলনের প্রভাব থেকে চলচ্চিত্র মুক্ত হতে পারেনি। অন্যান্য শিল্প ও গণমাধ্যমের মত চলচ্চিত্রও হয়ে ওঠে রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচারের অন্যতম প্রধান মাধ্যম।[২৭]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পূর্ব-ইউরোপের চলচ্চিত্রে পরাধীনতা, যুদ্ধ ও মুক্তি আন্দোলন প্রধান বিষয় হিসেবে স্থান লাভ করে।[২৮] ষাটের দশকে বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক চলচ্চিত্র নির্মাণ বেড়ে যায়। রাজনীতি সরাসরি চলচ্চিত্রের বিষয়ে পরিণত হয়। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে এ-প্রবণতা ব্যাপকভাবে দেখা যায়।[২৯]

চলচ্চিত্রের বিপুল প্রভাবনক্ষমতা প্রথম উপলব্ধি করে মার্কিন সরকার। ফলে চলতি শতাব্দীর গোড়ার দিকে চলচ্চিত্রের বিভিন্ন দৃশ্য ও বক্তব্যের উপর নেমে আসে প্রথম বিধিনিষেধ, নীতিমালার কঠোর শৃঙ্খলে বন্দি হয় চলচ্চিত্র।[৩০] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো রাজ্য সরকার ১৯০৭ সালে চলচ্চিত্র নিয়ন্ত্রণাদেশ জারি করে। ১৯০৯ সালে ব্রিটেনে সিনেমাটোগ্রাফ অ্যাক্ট চালু করে সেন্সর বা নিয়ন্ত্রণের পথ তৈরি করা হয়।[৩১] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেন্সর প্রথা প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এ-প্রথা কার্যকর হয়। ১৯২১ সালের মধ্যে ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, স্পেন, ইটালি, সুইডেন, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, জাপান ও ভারতে চলচ্চিত্রে সেন্সরপ্রথা আরোপ করা হয়।[৩২]

১৯১৮ সালে ভারতে প্রথম সিনেমাটোগ্রাফ অ্যাক্ট তথা সেন্সরশিপের আইনগত ব্যবস্থা চালু হয়।[৩৩] সিনেমাটোগ্রাফ অ্যাক্ট পাস করে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে ভারতীয় চলচ্চিত্রকে নিয়ন্ত্রণের অধিকার অর্জন করেছিল ব্রিটিশ সরকার। সেদিনের কয়েকটি


www.pathagar.com

সেন্সরের নিয়মনীতি উল্লেখ করলেই তা স্পষ্ট বোঝা যাবে। যেমন; (১) রাষ্ট্রপতি, বিচার, পুলিশ, ধর্মীয় যাজক, সরকারি কর্মচারীদের অপমান করা চলবে না, (২) বিদেশী রাষ্ট্র বা কোন ধর্মীয় গোষ্ঠীর অনুভূতিতে আঘাত দেওয়া চলবে না, (৩) সামাজিক অসন্তোষ ও বিক্ষোভ ধূমায়িত হতে পারে এ-রকম ছবি চলবে না, (৪) বিতর্কিত রাজনীতির উল্লেখ করা চলবে না, (৫) পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্ব দেখানো চলবে না, (৬) সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি, রাজবেশধারী ব্যক্তির অবমাননা, তাঁকে উপহাস করা যাবে না, (৭) ভারত সম্পর্কিত চিত্রায়নে ব্রিটিশ বা ভারতীয় কর্মচারীদের দুর্নীতিপরায়ণ দেখানো বা অন্য কোনভাবে ব্রিটিশ মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা চলবে না।[৩৪]

১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরেই পাকিস্তান সরকার চলচ্চিত্রের প্রদর্শন নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে ১৯১৮ সালে অবিভক্ত সেন্সরবিধি সংশোধন করে চলচ্চিত্র সেন্সরশিপ আইন করা হয় (অ্যাক্ট নং ১৮, ১৯৬৩)।[৩৫] ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক পরিবর্তনের ফলে সংগত কারণে ও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে চলচ্চিত্র সংক্রান্ত আইনের সংশোধন প্রয়োজন হয়। এ-প্রেক্ষাপটে ১৯৭২ সালে প্রেসিডেন্টের আদেশ (নং-৪১) মোতাবেক সেন্সর নীতিমালা সংশোধিত হয়। ১৯৭৬ সালে সরকার পুনরায় সেন্সর বিধি সংশোধন করে। এ-বিধিকে অভিহিত করা হয়, সেন্সরশিপ অফ ফিল্ম (অ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৬। ১৯৭৭ সালে চলচ্চিত্র সেন্সর নীতি ১৯৬৩-এর ১০ নম্বর ধারা মতে এবং ১৯৭২ সালের চলচ্চিত্র সেন্সরনীতি রহিত করে ঘোষণা করা হয় নতুন নীতিমালা।[৩৬] ১৯৮২ সালের ডিসেম্বরে পুনরায় ফিল্ম সেন্সরশিপ অ্যাক্ট, ১৯১৮-এর সংশোধনী অধ্যাদেশ জারি করা হয়।[৩৭] আইনটি চলচ্চিত্র সেন্সরশিপ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ নামে অভিহিত। অন্যদিকে ১৯০৭ সালে শিকাগোতে চলচ্চিত্র নিয়ন্ত্রণাদেশ জারির পর ১৯১১ সালে আরো ব্যাখ্যা সহযোগে পেনসিলভেনিয়াতে আইনটি জারি করা হয়। এরপর ১৯১৩ সালে ওহাইও আর ক্যানসাস রাজ্যে এ-আইন প্রবর্তিত হয়। ১৯১২ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ৩৭টি রাজ্য সরকার এই আইন চালু করে।[৩৮] প্রথম চারটি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ১৯১৫ সালে মামলা করা হয়েছিল। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বাক-স্বাধীনতা হরণ এবং আইনের স্বাভাবিক ধারার বিরোধিতার অভিযোগ আনা হয়েছিল।[৩৯]

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যে প্রশ্ন তোলা যায়, তা হলো ঔপনিবেশিক ভারতে ব্রিটিশ সরকার নিজের কায়েমি স্বার্থে যে সেন্সর নীতিমালা তৈরি করেছিল একটি স্বাধীন দেশ কেন সেই নীতিমালার উত্তরাধিকারী হবে? সেন্সর নীতিমালা স্বাধীন দেশের নতুন পরিস্থিতির আলোকে নতুন করে তৈরি করা উচিত ছিল। কিন্তু ১৯৭২-৮৩ পর্যন্ত সেন্সর নীতিমালার কিছুটা সংশোধনীর পরও নীতিমালায় ঔপনিবেশিক চিন্তাচেতনা ছিল স্পষ্ট। এই নীতিমালার মাধ্যমে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং মুক্তবুদ্ধির চর্চা রহিত করা হয়েছে।[৪০]



www.pathagar.com

## বাংলাদেশে চলচ্চিত্র নিয়ন্ত্রণ আইন

বাংলাদেশে ১৯৮২ সালের ৫৮ নম্বর অধ্যাদেশটি চলচ্চিত্র সেন্সরশিপ (সংশোধন) অধ্যাদেশ ১৯৮২ নামে অভিহিত। এটি মূলত পাকিস্তান আমলে প্রণীত চলচ্চিত্র সেন্সরশিপ আইন, ১৯৬৩-এর অধিকতর সংশোধিত অধ্যাদেশ।[৪১] ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগরে জারিকৃত এক অর্ডার[৪২]-এর মারফত বাংলাদেশে ১৯৬৩ সালের চলচ্চিত্র সেন্সরশিপ আইনটি মূলত চলচ্চিত্র সেন্সরশিপের এবং সুনির্দিষ্ট কারণে চলচ্চিত্রের ছাড়পত্র বাতিলের আইন।[৪৩] এ-আইনের ২ (গ) ধারায় বলা হয়েছে : 'ছাড়পত্র প্রাপ্ত চলচ্চিত্র অর্থ এমন একটি চলচ্চিত্র যার ছাড়পত্র ৪ ধারায় (২) উপধারার অধীনে প্রদর্শনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।'[৪৪] (২) উপধারায় আরো বলা হয়েছে, কোন চলচ্চিত্র পরীক্ষার পর যদি কর্তৃপক্ষ মনে করে যে, সেটি প্রকাশ্যে প্রদর্শনের উপযোগী, তবে ঐ কর্তৃপক্ষ দরখাস্তকারী ব্যক্তিকে একটি ছাড়পত্র দেবে এবং সেখানে যেভাবে বর্ণিত হবে সেভাবে চলচ্চিত্রটি চিহ্নিত হবে।[৪৫]

বাংলাদেশে বলবত ১৯১৮ সালের চলচ্চিত্র প্রদর্শন যন্ত্র আইনের ৫(২) ধারায় বলা হয়েছে : 'প্রতিটি অনুমতিপত্রের সঙ্গে একটি শর্তযুক্ত থাকবে যে, অনুমতিপত্রধারী ব্যক্তি নির্ধারিত স্থানে ১৯৬৩ সালের ফিল্ম সেন্সরশিপ আইনের অধীনে গঠিত কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রকাশ্যে প্রদর্শনের যোগ্য বলে অনুমোদনপ্রাপ্ত কোনও চলচ্চিত্র ছাড়া অন্য কোন চলচ্চিত্র প্রদর্শন করবে না এবং প্রদর্শনকালে ওই কর্তৃপক্ষের বর্ণিত ছাড়পত্র প্রদর্শন করতে হবে এবং এ-ধরনের ছাড়পত্র পাওয়ার পর সেখানে কোন পরিবর্তন বা বিকৃতি সাধন করা যাবে না।[৪৬] ১৯৬৩ সালের চলচ্চিত্র সেন্সরশিপ আইনের ৪ ধারার সংশোধন করে ১৯৮২ সালের চলচ্চিত্র সেন্সরশিপ (সংশোধন) অধ্যাদেশে বলা হয়, কোনও ব্যক্তি প্রকাশ্যে প্রদর্শনের উপযোগী কোন চলচ্চিত্রের ছাড়পত্রের জন্য নির্ধারিত ফরমে দরখাস্তসহ কর্তৃপক্ষের কাছে চলচ্চিত্র জমা দিতে পারবে; তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ দেশে তৈরি কাহিনীভিত্তিক কোন চলচ্চিত্রের (বিদেশী চলচ্চিত্র নয়) মোট দৈর্ঘ্য চৌদ্দ হাজার ফুটের বেশি হলে সেটার প্রকাশ্যে প্রদর্শনের উপযোগিতা যাচাইয়ের জন্য গ্রহণ করবেন না যদি না চলচ্চিত্র প্রযোজকের অনুরোধে সরকার কোন বিশেষ কারণে উক্ত সীমা শিথিল করতে আগে থেকে সম্মত হয়।[৪৭] একই অধ্যাদেশের ৬ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, যদি কেউ ছাড়পত্রবিহীন চলচ্চিত্র অথবা কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত চিহ্ন নেই এমন ছাড়পত্র পাওয়া চলচ্চিত্র অথবা এ-ধরনের চিহ্ন দেওয়ার পর পরিবর্তন বা বিকৃত করা হয়েছে এমন চলচ্চিত্র প্রদর্শন করে অথবা এই আইনের অন্য কোন বিধান বা এর অধীনে প্রণীত নিয়ম লঙ্ঘন করে তবে সে সর্বোচ্চ তিন বছর কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ দশ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিতে হবে।[৪৮]

১৯৬৩ সালের চলচ্চিত্র সেন্সরশিপ আইনের মুখবন্ধে বলা হয়েছে : 'আইন শৃঙ্খলার স্বার্থে অথবা স্থানীয় চলচ্চিত্র শিল্পের স্বার্থে অথবা তার সঙ্গে প্রসঙ্গত



www.pathagar.com

উত্থাপিত অথবা তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অথবা জাতীয় স্বার্থে প্রদর্শনের জন্য প্রণীত চলচ্চিত্র নির্বাচন এবং ছাড়পত্রপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রসমূহের ছাড়পত্র বাতিল করার উদ্দেশ্যেই এই আইন প্রণীত হয়েছে। আইনটি প্রণয়নের উদ্দেশ্য দুটি। প্রথমত, স্থানীয় চলচ্চিত্র শিল্পের সংরক্ষণ এবং দ্বিতীয়ত, চলচ্চিত্র নির্বাচন বোর্ডের কাছে সরকারবিরোধী প্রতীয়মান হবে অথবা অন্য কোন কারণে কর্তৃপক্ষ পছন্দ করবেন না এমন সব চলচ্চিত্র প্রদর্শন বন্ধ করা। কোন চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ছাড়পত্র দেওয়া অথবা না দেওয়ার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষকে প্রদান করা হয়েছে এই আইনের চতুর্থ ধারায়। আর স্থানীয় এলাকার মধ্যে একটি ছাড়পত্রপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হওয়া উচিত নয় বলে যদি একজন ম্যাজিস্ট্রেট মনে করেন, তাহলে তিনি উক্ত চলচ্চিত্রের প্রদর্শন স্থগিত করে দিতে পারবেন। এ-ধরনের ব্যাপক ক্ষমতা তাকে প্রদান করা হয়েছে। জনস্বার্থে এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কারণে একটি ছাড়পত্রপ্রাপ্ত ছবির ছাড়পত্র রদ করার ক্ষমতা এই আইনের ৭ম ধারার মাধ্যমে সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। এ-আইনের কারণে, কোন চলচ্চিত্র নির্মাতাই প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে সরকারের কোন ব্যর্থতা অথবা অন্যায়ের সমালোচনা করে কোন চলচ্চিত্র তৈরি করতে পারবেন না। এ-আইনের মাধ্যমে চলচ্চিত্র নির্মাণের স্বাধীনতায় বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। সরকারের পছন্দের সঙ্গে খাপ খায় না এমন কোন চলচ্চিত্র যদি কেউ তৈরি করেন তাহলে সেই চলচ্চিত্রটি ছাড়পত্র নাও পেতে পারে এবং যদিও-বা ছাড়পত্র পায় তারপরও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা তার প্রদর্শন স্থগিত হওয়ার ঝুঁকি থেকে যায় এবং পরিণামে ছবিটির ছাড়পত্র সরকারের দ্বারা প্রত্যাহৃত হতে পারে।[৪৯] ১৯৮৫ সালের ১৬ নভেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে একটি নোটিফিকেশন জারি করা হয়। এ-নোটিফিকেশন সাতটি শিরোনামার অধীনে সর্বমোট পঁয়তাল্লিশটি নিষেধাজ্ঞা স্থান পেয়েছে। এই পঁয়তাল্লিশটি নিষেধাজ্ঞার যেকোন একটি নির্মিত চলচ্চিত্রে পরিলক্ষিত বা প্রতীয়িমান হলে সেন্সর বোর্ড সেই চলচ্চিত্রের ছাড়পত্র প্রদান করবে না। Government Instructions for Examining and Certifying Films শীর্ষক এই গেজেট নোটিফিকেশনটি বহু অগণতান্ত্রিক ও কঠোর নিয়ন্ত্রণমূলক কালাকানুনে পরিপূর্ণ। মুক্তবুদ্ধি বা স্বাধীনতা কিংবা নাগরিক অধিকার ইত্যাদি কোন কিছুরই তোয়াক্কা এখানে করা হয়নি। আরেকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো অধিকাংশ বিধানই এমন যার প্রয়োগ, প্রয়োগকারীর রাজনৈতিক আদর্শ, ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে।[৫০] অবশ্য সংবিধানের ৩৯ নম্বর অনুচ্ছেদের ভাষ্য নির্দেশ করে যে, সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণসমূহ কোন আইনের দ্বারাই চাপানো যায় না। সংসদীয় কর্তৃত্ব ছাড়া কোন নির্বাহী কর্তৃপক্ষ কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দিতে পারে না এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বাক ও ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা কোনভাবে সীমিত করতে পারে না। অতএব কোন নিয়ন্ত্রণ চাপাতে হলে কেবল ওই উদ্দেশ্যেই সংসদে একটি আইন প্রণীত হতে হবে।[৫১]



www.pathagar.com

## চলচ্চিত্র ও সেন্সরশিপ

চলচ্চিত্রের শক্তিকে কেউই অস্বীকার করতে পারে না। কোন দেশের রাষ্ট্রীয় সীমানা অতিক্রম করে একটি চলচ্চিত্র অপর দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে প্রভাব বিস্তার এবং অনুকূল কিংবা প্রতিকূল জনমত গড়ে তুলতে পারে। সে-হিসেবে চলচ্চিত্র খুবই ক্ষমতাধর গণমাধ্যম। তাই এ-মাধ্যমের উপর প্রতিনিয়ত খবরদারি করা বা নজর রাখা দরকার— এ-রকম একটি বোধ শাসকশ্রেণীর মধ্যে সবসময় কাজ করে। চলচ্চিত্রের উপর এই খবরদারির নামই সেন্সরশিপ।[৫২] সেন্সরপ্রথা মানবসভ্যতার মতই প্রাচীন। নাগরিকের আচরণ ও অভিমতের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়নি, মানব-ইতিহাসের এমন সমাজব্যবস্থা প্রায় অস্তিত্বহীন।[৫৩]

সেন্সরশিপ ব্যবস্থায় একটি দেশের সরকার কোন কিছু প্রকাশের আগে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার অধিকার রাখে এবং প্রয়োজন মনে করলে তা থেকে 'আপত্তিকর' অংশ বাদ দিতে পারে। Harold D. Lasswell-এর মতে, Censorship is the policy of restricting the public expression of ideas, opinions, conceptions, and impulses which have or are believed to have the capacity to undermine the governing authority or the social and moral order which that authority considers itself bound to protect.[৫৪]

Columbia Encyclopedia সেন্সরশিপ সংজ্ঞার্থ নির্ধারণ করেছে এভাবে : 'সেন্সরশিপ হচ্ছে যেকোন ধরনের রাজনৈতিক, সামাজিক অথবা নৈতিক আদেশের ব্যাপারে দেয়া হুমকি, মতামত এবং বিশ্বাসের প্রতিবন্ধকতা বা নিষেধাজ্ঞা।'[৫৫] সেন্সর সম্পর্কে আলেকজান্ডার বলেন, নৈতিক বিধি ও রাজনৈতিক ক্ষমতাপরিপন্থী কোন রীতি, ধারণা, মত ও প্রত্যয় নিয়ন্ত্রণ সেন্সরের অন্তর্গত।[৫৬]

## বিভিন্ন দেশে সেন্সরব্যবস্থা

আমাদের দেশে সরকার নিয়ন্ত্রিত সেন্সর বোর্ড মূলত সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী চলচ্চিত্র সেন্সর করে।[৫৭] কিন্তু বিভিন্ন দেশের চলচ্চিত্র সেন্সরব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এমন বহু দেশ রয়েছে যেখানে সেন্সরবোর্ডের কোন অস্তিত্বই নেই। যুক্তরাষ্ট্রে ছবির মান ও রেটিং নির্ধারণ করে মোশন পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশন। ব্রিটেনে চলচ্চিত্র সেন্সরব্যবস্থা সরকারি প্রভাবমুক্ত। 'ব্রিটিশ বোর্ড অব সেন্সরজ' সেখানে এ-দায়িত্ব পালন করে। বেলজিয়ামে চলচ্চিত্রের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ নেই। এমনকি ইউরোপীয় দেশ ডেনমার্কে পর্নো ছবি পর্যন্ত সেন্সর হয় না। ফ্রান্সে একই অবস্থা, সেখানে চলচ্চিত্র সেন্সরব্যবস্থা পুরোপুরি বেসরকারি সংস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আলোচিত দেশগুলিতে সেন্সরব্যবস্থা অত্যন্ত উদার এবং



www.pathagar.com

প্রচলিত সেন্সরবিধি মানুষের রুচি, চাহিদা এবং ব্যক্তি ও সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে রচিত। অপরদিকে সেন্সরদের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নেওয়ার ক্ষেত্রে এসব দেশের প্রযোজকদের রয়েছে পর্যাপ্ত স্বাধীনতা।[৫৮] ভারতে গঠিত 'খোশলা কমিশন' নিয়ন্ত্রণমুক্ত একটি সেন্সর বোর্ড সুপারিশ করে এবং এসব চলচ্চিত্রে প্রয়োজনে নগ্নতা ও ভায়োলেন্সকে অনুমতি প্রদানের সুপারিশ করে। বস্তুত, কালের পরিবর্তনে মানুষের মূল্যবোধ, ধারণা এবং সমাজব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তনের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশে সেন্সরবিধি পরিবর্তিত হয়েছে। আমাদের দেশেও তা হওয়া বাঞ্ছনীয়।[৫৯] এ-কথা ঠিক, সেন্সরশিপের পদ্ধতি সর্বত্রই এক, কেবলমাত্র তার আইনগত চরিত্রেই যা কিছু ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।[৬০]

## সেন্সরবিধির উপযোগিতা ও অনুপযোগিতা

চলচ্চিত্র সমাজের যেমন উপকার করত পারে, তেমনি ক্ষতিও করতে পারে। এ-মাধ্যমে দর্শকদেরকে গভীরভাবে প্রভাবিত করা যায়। সিনেমা ব্যবসায়ীদের অনেকেরই যেহেতু নন্দনতত্ত্ব বা জীবনের ভালোমন্দ সম্পর্কে মাথা ব্যথা নেই, তাদের মুনাফার নেশারও যেহেতু লাগাম নেই, তাই স্থূল প্রবৃত্তির সুড়সুড়ি দিয়ে এসব সিনে ব্যবসায়ীরা মানুষের রুচি নষ্ট করে। ফিল্মের সেন্সরব্যবস্থা থাকা ভালো এবং তা সমাজের পক্ষে কল্যাণকর। সেন্সরশিপের পক্ষে এ-রকম যুক্তি প্রায়ই শোনা যায়। কিছু বলার এবং আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা সংবিধানসম্মত। সংবিধানেই এই স্বাধীনতার সীমারেখা নির্দেশ করা হয়েছে। সমাজের অমঙ্গল ও ক্ষতি হয় মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে এমন চলচ্চিত্র দেখানো যাবে না। সেন্সরব্যবস্থা তাই আমাদের দেশে সংবিধানসম্মত এবং জনস্বার্থেরই পক্ষে।[৬১] -এরকম পাল্টা যুক্তিও শোনা যায়।

আধুনিককালে সেন্সর বিভিন্নমুখী। সেন্সর প্রথা বহুলাংশে নির্ভরশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং সামাজিক ধারা ও পদ্ধতির উপর। সেন্সরের মাত্রা এবং প্রয়োগ পদ্ধতি তাই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের।[৬২] তথাকথিত 'স্বাধীন দুনিয়ায়' চলচ্চিত্র সেন্সরশিপের মূল লক্ষ্য আপাতদৃষ্টিতে অশ্লীলতা তথা যৌন উত্তেজনার বিভীষিকা থেকে জনসাধারণের নৈতিক স্বাস্থ্য রক্ষা করা।[৬৩] বলা হয়, দায়িত্বজ্ঞানহীন ছবির ধনী ব্যবসায়ীদের কবল থেকে সিনেমা মাধ্যমকে রুচিপূর্ণ ও সুস্থ রাখার জন্য সেন্সর ব্যবস্থার প্রয়োজন।[৬৪] সেন্সর বিধির কঠোরতা এবং এর রাজনৈতিক ভিত্তি নিয়ে গত কয়েক দশক ধরে এ-ধরনের আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। চলচ্চিত্র ঐতিহাসিক টেরি র‍্যামজি বরেছেন, সেন্সর বিধি সম্পূর্ণরূপে নৈতিক দর্শনের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে, সামাজিক বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে নয়। সেন্সর বিধি সামান্য বিশ্লেষণ করলেই বলা যাবে যে, এর কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। যে, কারণে সেন্সরবিধি লঙ্ঘন করা খুব কঠিন কিছু নয়। ইউরোপ থেকে শুরু করে বাংলাদেশ পর্যন্ত সকল দেশে চিত্রনির্মাতারা সেন্সর বোর্ডের অনেক নীতি অগ্রাহ্য


www.pathagar.com

করে ছবি তৈরি করছেন এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সেসব ছবি ছাড়পত্র পাচ্ছে।[৬৫] গাঁস্ত রোবের্জ (জন্ম ১৯৩৫) বলেছেন, ফিল্মের ক্ষেত্রে সেন্সরশিপ থাকা উচিত নয়। কারণ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে, সেন্সরশিপে কোন কাজ হয় না। একটু ভাবলেই আমরা বুঝতে পারি যে, সেন্সরশিপকে বাঁচানোরও কোন পথ নেই।[৬৬]

কালের পরিবর্তনে সমাজব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তনের সঙ্গে বিভিন্ন দেশে সেন্সরবিধি পরিবর্তিত হয়েছে। একজন পরিচালকের মতে, দেশে যদি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকে, তাহলে চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রেও স্বাধীনতা থাকা দরকার। কবিতা, নাটক, কার্টুন, ছড়া এবং ভিডিও ছবি যখন সেন্সর হয় না তখন শুধু চলচ্চিত্র সেন্সর হবে কেন?[৬৭]

বস্তুত, ভিডিও প্রযুক্তি স্যাটেলাইট টিভি ও লেজার ডিস্কের এই যুগে সেন্সরের নীতিমালা কার্যত প্রায় অর্থহীন হয়ে পড়েছে। মানুষ ক্রমশই পরিণত হচ্ছে বিশ্ব নাগরিকে আর চলচ্চিত্র হয়ে উঠেছে এক আন্তর্জাতিক শিল্প।

## বাংলাদেশের সেন্সর বোর্ড এবং তার ভূমিকা

দেশে সুস্থ চলচ্চিত্র নির্মাণ বা তার পরিবেশ সৃষ্টির যেকোন ধরনের প্রচেষ্টা প্রতিহত করার সব চেয়ে বড় মন্ত্রণাদাতা ফিল্ম সেন্সর বোর্ড।[৬৮] আমাদের দেশের অধিকাংশ চিত্রনির্মাতা বস্তুনিষ্ঠ, রুচিশীল, সৎ চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে সেন্সর বোর্ডকে সবচেয়ে বড় বাধা বলে মনে করেন। এ-কারণে সেন্সর বোর্ডের রুচি ও বিবেচনাবোধ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হয় এমন ছবির সংখ্যা হাতে গোনা।[৬৯]

বাংলাদেশে চলচ্চিত্র সেন্সর পুরোপুরি সরকার নিয়ন্ত্রিত এবং সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানেই এই বোর্ড পরিচালিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বোর্ড গঠন করা হয় যোগ্যতা বিচারে নয়, সরকারের পছন্দ ও ইচ্ছানুযায়ী। স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার মর্যাদা না থাকায় বোর্ডের কোন স্বাধীনতা নেই। ফিল্ম সেন্সর বোর্ডে যাঁরা নিযুক্ত হন নিজস্ব মতামত প্রকাশের কোন সুযোগ তাঁদের নেই। ছবি বিচারের পর বোর্ডের সদস্যরা যে রায় দেন, তা প্রণীত হয় সরকারের ঘোষিত সেন্সরবিধিধির এবং কোন-কোন ক্ষেত্রে নিজস্ব ব্যাখ্যার ভিত্তিতে—বিচক্ষণতা, সমাজ সচেতনতা এবং বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নয়।[৭০] ১৯৮২ সালে সেন্সর বোর্ড থেকে পদত্যাগ করে একজন সদস্য বোর্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে বলেছিলেন, বোর্ডের বেশির ভাগ সদস্যই ছবির যথার্থ বিচার নয় বরং বিশেষ স্বার্থন্বেষী মহলের নির্দেশে কোটারি স্বার্থ রক্ষায় উচ্চকণ্ঠ হয়। সেন্সর বোর্ডের উপেক্ষা এবং মুক্তচিন্তার এহেন অপমৃত্যু যেকোন বিবেকবান ব্যক্তির জন্য লজ্জাকর ঘটনা বলে তিনি উল্লেখ করেন।[৭১] একদিকে সরকারি আমলা এবং অন্যদিকে সরকার মনোনীত কিছু সুবিধাভোগী সদস্য এই প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট হয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র ফড়িয়াদের একচেটিয়াত্ব কায়েমে সহায়তা করে চলেছেন। তাঁদের কাজ হলো, প্রতি সপ্তাহের মুক্তিপ্রাপ্ত দেশী ও বিদেশী ছবিগুলিকে ছাড়পত্র প্রদান করা। তাঁদের



www.pathagar.com

যত আক্রোশ শিল্পসম্মত ছবির বেলায়। দেশে নির্মিত এমন কোন জীবনঘনিষ্ঠ ও শিল্পসম্মত চলচ্চিত্র নেই যা সেন্সর বোর্ডের রোষাণলে পড়েনি। '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে নির্মিত জহির রায়হানের *জীবন থেকে নেয়া* (১৯৭০) হতে শুরু করে সাম্প্রতিক কালে নির্মিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র *ধূসর যাত্রা* (১৯৯২)-য় পর্যন্ত এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে। একদিকে এই সেন্সরবোর্ড সুস্থ চলচ্চিত্র নির্মাণ ও তার প্রদর্শনে বাধার সৃষ্টি করছে অন্যদিকে সুস্থ চলচ্চিত্র নির্মাণের পরিবেশ যাতে সৃষ্টি না হয়, তার ব্যবস্থা করে চলেছে।[৭২] বলতে দ্বিধা নেই যে, অলৌকিক কাহিনী, নকল গান, অশ্লীল যৌনতা, স্থূল ভাঁড়ামি এবং অকারণ ভায়োলেন্সসমৃদ্ধ জীবনবিমুখ অপসংস্কৃতির অন্যতম বাহক হচ্ছে আমাদের দেশের বর্তমান চলচ্চিত্র। এই কুরুচিপূর্ণ অবাস্তব এবং অলৌকিক ছবির দৌরাত্ম্যে আমাদের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি আজ ধ্বংসের পথে। আনন্দপিপাসু নিরীহ দর্শকদের ক্রমশ আফিমের ন্যায় নেশা ধরিয়ে দিচ্ছে এই ছবিগুলি।

বাংলাদেশের বর্তমান সেন্সর নীতিমালা মুক্তবুদ্ধিচর্চার অন্তরায় হলেও তা এখনো প্রত্যক্ষভাবে ধরা পড়েনি। কারণ সেই রকম ছবি নির্মিত হয়নি যে ছবিকে মুক্তবুদ্ধিচর্চার নিদর্শন বলা যায়। বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টির আশঙ্কা প্রকাশ করে জাতীয় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে প্রতীকী ছবি বন্ধ করার চেষ্টা ঠিকই হয়। সেন্সর বোর্ড প্রচলিত নীতিমালায় উদ্ভট, অশ্লীল, জাতীয় চেতনাবিরোধী ছবি নিষিদ্ধ না করে সেসব ছবিকে সহজেই ছাড়পত্র দিয়ে চলেছে।[৭৩] ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে ফিল্ম সেন্সর বোর্ড দ্বৈত ভূমিকা পালন করে।[৭৪] উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্যের *আগামী* ছবিতে 'হারামজাদা' শব্দকে অশ্লীল বলে তা বাদ দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় অথচ টেলিভিশনে প্রদর্শিত *শহর থেকে দূরে* ছবিতে অবলীলাক্রমে 'হারামজাদী', 'মাগী' প্রভৃতি শব্দ উচ্চারিত হয়।[৭৫]

এফডিসি-তে নির্মিত ও এ-দেশের চলচ্চিত্রের কথিত অভিভাবক সেন্সর বোর্ডের ছাড়পত্র নিয়ে দেশে হুবহু কিংবা আংশিক নকল কাহিনী ও সংলাপসমৃদ্ধ নিম্ন কারিগরি মানসম্পন্ন অশালীন ও কুরুচিপূর্ণ চলচ্চিত্রের উৎপাদন ও প্রদর্শন চলছে পূর্ণমাত্রায়। সেই সব অতন্দ্র প্রহরী যাঁরা সামান্য কিছুতেই দেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং ধর্মের অবমাননা খুঁজে পান, আবিষ্কার করেন দেশের সার্বভৌমত্ব-বিরোধী গভীর ষড়যন্ত্র তাঁরা কিন্তু এসব ক্ষেত্রে থাকেন বাকহীন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমৃদ্ধ, ধর্মের প্রগতিশীল ব্যাখ্যাসম্পন্ন ও রাজনৈতিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কোনো কিছু লিখলে বা এ-সংক্রান্ত চলচ্চিত্র নির্মাণ করলে তা হয় দেশজ ঐতিহ্য, সংস্কৃতি কিংবা সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি। আমাদের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম আকাঙ্ক্ষা ছিল অবাধে মত প্রকাশের অধিকার অর্জন। কিন্তু স্বাধীনতার এত বছর পরও রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের দোহাই দিয়ে প্রায়শ মতপ্রকাশের অধিকারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে।[৭৬]



www.pathagar.com

## মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন

চলচ্চিত্র জীবনবোধ ও শিল্পরসকে তুলে ধরতে পারে সুনিপুণ বাঙ্ময়তায়। বাণিজ্যিক বৃত্তের বাইরে চলচ্চিত্রের নান্দনিক, মননশীল ও বৈপ্লবিক ক্ষমতার কারণে চলচ্চিত্রের তৈরি হয়েছে ভিন্ন শ্রেণীর দর্শক। তারা গড়ে তুলেছেন চলচ্চিত্র সংসদ বা ফিল্ম সোসাইটি।[৭৭] চলচ্চিত্র শিল্পের বিকাশের স্বার্থেই গড়ে উঠেছে চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন।[৭৮] এ-আন্দোলন মূলত দর্শক সৃষ্টির আন্দোলন।[৭৯] এ-আন্দোলন প্রথমে গড়ে ওঠে শিল্পোন্নত দেশে। প্রথমদিকে এসব দেশেই তা সীমাবদ্ধ থাকে। পরবর্তীকালে এই আন্দোলন উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে।[৮০] সূচনায় এ-আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল শিল্পসম্মত ছবির দর্শক সৃষ্টি করা, বাণিজ্যিক ছবির ব্যাপক প্রসারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা এবং ছবির নান্দনিকতা ও আঙ্গিক চেতনাকে উন্নত করা।[৮১] বিশ্বের প্রথম চলচ্চিত্র সংসদ The Film Society প্রতিষ্ঠিত হয় লন্ডনে ১৯২৫ সালে।

ব্রিটেনে চলচ্চিত্র সংসদ জন্মলাভের পর যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও জার্মানিসহ অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশে চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন বিস্তৃত হয়। উপমহাদেশে ১৯৪৭ সালের ৫ অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয় চলচ্চিত্র সংসদ 'ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি'।[৮২] বস্তুতপক্ষে বাংলাদেশে চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের সূচনা পাকিস্তান ফিল্ম সোসাইটি প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে। এটি গঠিত হয় ১৯৬৩ সালে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর পাকিস্তান ফিল্ম সোসাইটির নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ'।[৮৩] আমাদের দেশে চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন বর্তমানে দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বহু বাধার সম্মুখীন।[৮৪] সরকারের সঙ্গে সংসদের সম্পর্ক সুস্থ নয়। সংসদের চলচ্চিত্র প্রদর্শনকে সরকারি সেন্সর বোর্ড সন্দেহের চোখে দেখে। ফলে তাদের তরফ থেকে একাধিক কালাকানুন বহাল রাখা হয়েছে। এমন পরিস্থিতি ব্রিটেনেও ছিল। কিন্তু উভয় পক্ষই এখন অনুধাবন করছে যে, সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের জন্য পারস্পরিক সম্প্রীতির বিশেষ প্রয়োজন। ফলে ব্রিটেনে এই অবিশ্বাস নির্বাসিত হয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশে এ-সম্পর্কের কোন উন্নতি হয়নি।[৮৫]

সূচনাকাল থেকেই বাংলাদেশে চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের সঙ্গে সরকারের একটা বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। এর কারণ আন্দোলন সম্পর্কে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনভিজ্ঞতা। পাকিস্তান আমল থেকে চলচ্চিত্র সংসদগুলি পৃথক সেন্সর নীতিমালা দাবি করে আসছে। তাদের দাবির মধ্যে আরো ছিল জাতীয়ভিত্তিক একটি প্রগতিশীল সেন্সর নীতিমালা প্রণয়ন। কিন্তু চলচ্চিত্র সংসদসমূহের এ-দাবি মেনে নেওয়া হয়নি। ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর ধীরে-ধীরে চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের উপর নেমে আসে নিয়ন্ত্রণের বেড়াজাল। নিয়ন্ত্রণের প্রথম পর্যায়ে সংসদ প্রদর্শিত ছবিগুলিতে আরোপ করা হয় সেন্সর; সামরিক আইনে বাধাপ্রাপ্ত হয় বিভিন্ন সংসদের কার্যক্রম। সেন্সর বোর্ডের অনুমোদন না পাওয়ায়



www.pathagar.com

অপ্রদর্শিত অবস্থায় ফিরে যায় সত্যজিৎ রায়ের 'জন অরণ্য (১৯৭৬), গদারের *'উমেন ইজ' উমেন'*, জোলতান ফারাবীর *'ফিফ্‌থ সীল'* (১৯৭৭) প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত ছবি। '৭৭ সালের মাঝামাঝি চলচ্চিত্র সংসদগুলির কার্যক্রম সম্পর্কে সরকার খোঁজখবর নিতে শুরু করে। জাতীয় নিরাপত্তা দপ্তর এবং সামরিক নিরাপত্তা দপ্তর পরীক্ষা করে সংসদগুলির কাগজপত্র। চলচ্চিত্র সংসদগুলির বিরুদ্ধে সরকার বিদেশী সংস্থা থেকে বেআইনিভাবে আর্থিক লেনদেন এবং গোপন চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর অভিযোগ উত্থাপন করে। অপরদিকে সেন্সর নীতিমালার কড়াকড়ির জন্য বিদেশী দূতাবাসসমূহ বাংলাদেশে ছবি আনার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।[৮৬] শেষে চলচ্চিত্র সংসদগুলির উপর আরোপিত হয় নিয়ন্ত্রণাদেশ। ১৯৮০ সালের ৯ জুলাই জাতীয় সংসদে চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি আইন পাস হয়। আইনটির শিরোনামা হচ্ছে : 'ফিল্ম ক্লাব রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৮০'।[৮৭]

১৯৮০ সালে ফিল্ম ক্লাব রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ আইন জারির মাত্র ৫ বছরের মধ্যে চলচ্চিত্র সংসদসমূহের উপর নেমে আসে চরম আঘাত। ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ড উক্ত আইন ও বিধির কতিপয় ধারা লঙ্ঘনের অভিযোগে মোট ১৪টি ফিল্ম ক্লাব, সোসাইটি ও সংসদের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করে। এই আইন জারির পর বহু সংসদ অহেতুক হয়রানি ও জেল হাজতের ভয়ে এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে তাদের কার্যক্রমে সীমিত করতে অথবা বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়। '৯০ সালের পর হতেই চলচ্চিত্র সংসদকর্মীরা প্রতিবাদ সভা, বিক্ষোভ মিছিল, সংবাদ সম্মেলন, বক্তৃতা, বিবৃতি এবং সেমিনারের মাধ্যমে কালো আইনটি বাতিলের লক্ষ্যে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ-সময় সরকারের তরফ থেকে বহুবার আইনটি বাতিল অথবা পুনর্বিবেচনার আশ্বাস প্রদান করা হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আইনটি এখন পর্যন্ত পরিপূর্ণভাবে কার্যকর রয়েছে; খড়্গ ঝুলছে চলচ্চিত্র সংসদ তথা চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের উপর যা চলচ্চিত্র শিল্পের সার্বিক মানোন্নয়ন ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে চলেছে।[৮৮] পৃথিবীর অনেক দেশেই ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলন দীর্ঘদিন ধরে চলে এখন ফসিল হয়ে গেছে, কিন্তু বাংলাদেশে এই আন্দোলন এখনো নতুন। এই ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের তৎপরতা জন্ম দিয়ে চলেছে অনেক হবু চলচ্চিত্র নির্মাতার, বিকল্প ও সৃষ্টিশীল ছবি নির্মাণে যাঁরা উৎসাহী ও উদগ্রীব।[৮৯]

## ভিডিও ছবি, চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন এবং সেন্সরবিধির অসারতা

সাধারণভাবে ভিডিও ক্যামেরায় চিত্রায়িত এবং ভিসিআর বা ভিসিপি-র মাধ্যমে পূর্ণ বা স্বল্পদৈর্ঘ্যের যে ছবি নির্মিত হয়, তাকে ভিডিও ছবি বলা হয়। স্বল্প বা পূর্ণদৈর্ঘের কাহিনীচিত্রই কেবল নয়, একজন নির্মাতা ভিডিও-তে বিভিন্ন বিষয় যেমন : পরিবেশ, বিক্ষোভ মিছিল, সভা, সন্ত্রাস, মানবাধিকার, জনসংখ্যা প্রভৃতি বিষয়ে ছবি নির্মাণ করতে পারেন।[৯০] পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও ভিডিও



www.pathagar.com

মাধ্যমের প্রথম প্রচলন ঘটে টেলিভিশনে।[৯১] টেলিভিশনের বাইরে ভিডিও মাধ্যমের প্রধান ব্যবহারকারী হলো বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠনগুলি।[৯২] বলা যেতে পারে, ৮০ দশকের শুরু থেকেই বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠনগুলি তাদের কাজের সহায়ক হিসেবে ভিডিও ব্যবহার শুরু করে।[৯৩] আকার, ওজন এবং রঙিন ছবির ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধিত হওয়ার পর ভিডিও ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকে। সাধারণ মানুষও এই প্রযুক্তির ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ফলত উন্নত বিশ্ব থেকে এই প্রযুক্তি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতেও স্থানান্তরিত হয়।[৯৪] বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলি এ-কাজে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে। স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রকারদের মত তারাই প্রথম ভিডিও মাধ্যমের বিকল্প পরিবেশনার কাজ করে প্রথাগত সেন্সর ব্যবস্থাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েছে।[৯৫] বাংলাদেশে নির্মিত চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে সেন্সর ব্যবস্থা থাকলেও অবৈধভাবে চোরাপথে আমদানিকৃত ভিডিও ক্যাসেটের ক্ষেত্রে সেন্সরের কোন ব্যবস্থা নেই।[৯৬]

চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যাপারে বাংলাদেশের সেন্সর বোর্ড দু-মুখো নীতি প্রয়োগ করে আসছে। ভিডিওর ব্যাপারে এক রকম আর চলচ্চিত্রের ব্যাপারে অন্য রকম— এই দু-মুখো নীতির টানাপোড়নে এ-দেশে সুস্থ চলচ্চিত্রের বিকাশ প্রায় রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। চলচ্চিত্র সংসদ কালাকানুন প্রয়োগ হবার পর থেকে চলচ্চিত্র সংসদগুলি বিদেশ থেকে সদস্যদের দেখাবার জন্য যেসব ছবি পেয়ে থাকে সেসব ছবির উপর বোর্ড খুব কড়া সেন্সর আরোপ করে। যেমন; সত্যজিত রায়ের (১৯২২-১৯৯২) *জন-অরণ্য*, উৎপলেন্দু চক্রবর্তীর (১৯৮৩) *চোখ*, কেতন মেহতার *হোলি*, ঋত্বিক ঘটক (১৯২৫-১৯৭৬)-এর *যুক্তি তক্কো গপ্পো*-র মতো ছবি সেন্সরবোর্ড এ-দেশে প্রদর্শনের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। অপরদিকে ভিডিও ক্লাবগুলিতে বোম্বাইয়ের তাবত কুরুচিপূর্ণ, মারদাঙ্গা অশ্লীল ছবি, বিদেশী ভয়ংকর সব ভায়োলেন্সপূর্ণ কুংফু, ক্যারাতে ছবি কিংবা হংকং, থাইল্যান্ডের নির্মিত কুৎসিত এবং নিম্নমানের চলচ্চিত্র, সফট এবং হার্ডকোর মার্কিনী পর্নোগ্রাফির ছবি থরে থরে সাজানো থাকে এবং হলে নিয়মিত প্রদর্শিত হয়। এসব ছবির উপর সেন্সর বোর্ডের নিয়ন্ত্রণ নেই। এসব ভিডিও প্রদর্শনীর ব্যাপারে অদ্যাবধি সরকারি পক্ষ থেকে কোন নীতিমালা তৈরি হয়নি।[৯৭] মননশীল ছবি নির্মাণ না করে অনেকেই আবার ভিডিও-র অপব্যবহার করছেন। কারণ ভিডিও-তে নির্মিত ছবি সেন্সর হয় না।[৯৮] সেজন্যই 'ইচ্ছায় কি অনিচ্ছায় ভিডিও একটা দ্রোহমূলক কাজ, সেন্সর ব্যবস্থাকে অর্থহীন করে তুলেছে'।[৯৯]

## স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র এবং স্বাধীনতার অন্বেষা

স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের সংজ্ঞার্থ নিরূপণ কঠিন। কোন সুনির্দিষ্ট ছকে ফেলে এর শিল্পমূল্য বিচার করা প্রায়-অসম্ভব ব্যাপার। সাধারণভাবে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রকে উপন্যাসের সঙ্গে এবং স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রকে ছোটগল্পের সঙ্গে তুলনা করা যেতে



www.pathagar.com

পারে।[১০০] সর্বোচ্চ ৬০ মিনিটের ছবিকেই স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এর চেয়ে বেশি সময়ে নির্মিত ছবিই হচ্ছে পূর্ণদৈর্ঘ্যের। তবে দৈর্ঘ্যের দিক থেকে আন্তর্জাতিকভাবে ৪০ মিনিটের চলচ্চিত্রকেই স্বল্পদৈর্ঘ্যের আদর্শ ধরা হয়। কাহিনীচিত্র, প্রামাণ্যচিত্র, কোলাজচিত্র, অ্যানিমেশন অথবা যেকোন ধরনের নিরীক্ষামূলক চলচ্চিত্রই স্বল্পদৈর্ঘ্যের আওতায় আসতে পারে।[১০১] স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র হচ্ছে মূলত ১৬ মি.মি. ফ্রেমে নির্মিত, সাদাকালো, স্বল্পব্যয়ে তৈরি এক ধরনের কাহিনীচিত্র যার বিষয়বস্তু সমাজসচেতন কোন বিষয় এবং যার নির্মাতা প্রায়শই তরুন।[১০২]

আমাদের দেশে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু হয় মুক্তিযুদ্ধ, শিশুশ্রম, নারীর অধিকার বা মাদকাসক্তির সমস্যা অর্থাৎ সেইসব বিষয় যা সমাজ ও রাজনীতি সচেতন।[১০৩] নির্মাণশৈলী এবং চলচ্চিত্রের ভাষার সাবলীল প্রয়োগের দিকটি বিবেচনা করলে জহির রায়হান হচ্ছেন বাংলাদেশের স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র আন্দোলনের স্থপতি ও অগ্রদূত। ১৯৭১-এর মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তাঁর *স্টপ জেনোসাইড* হচ্ছে এ-দেশের প্রথম সার্থক স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র।[১০৪] মোরশেদুল ইসলাম পরিচালিত *আগামী* হচ্ছে বাংলাদেশে মুক্তি পাওয়া প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি।[১০৫] ১৯৮৪ সালের জানুয়ারিতে ছবিটি সেন্সর সার্টিফিকেট লাভ করে ও ৩ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পায়। *আগামী*-র নির্মাণ শুরুর পরপরই ৮২ সালে তানভীর মোকাম্মেল তার *হুলিয়া* ছবির কাজ শুরু করেন।[১০৬] *আগামী* (১৯৮৪) ও *হুলিয়া*-র (১৯৮৫) সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে তরুণ প্রজন্মের অনেকেই এগিয়ে আসেন স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র নির্মাণে।[১০৭]

আশির দশকের মাঝামাঝি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে বিকল্পধারার চলচ্চিত্র আন্দোলনের যখন সূত্রপাত ঘটে তখন এই-আন্দোলনের সাথে যুক্ত চলচ্চিত্রকর্মীরা যে-সমস্ত লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলেন তার মধ্যে দুটি ছিল উল্লেখযোগ্য : (১) বাণিজ্যিক পুঁজির কবল থেকে চলচ্চিত্রকে মুক্ত করার প্রয়াসে স্বল্প বাজেটে নিজস্ব চলচ্চিত্র প্রযোজনা শুরু করা এবং (২) শিল্পীর ভাবনা প্রকাশের স্বাধীনতাকে স্বীকার করে তার প্রকাশকে অবারিত করার জন্য কালো পুঁজির দৌরাত্ম্য কমানোর সাথে সাথে সেন্সর প্রথার গণতন্ত্রায়ণ করা।[১০৮]

নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রগুলির বিষয়বস্তু ভালো হওয়া সত্ত্বেও সেগুলি পূর্ণদৈর্ঘ্য কেন করা হয় না– এ-রকম প্রশ্নের জবাবে চলচ্চিত্রকার তানভীর মোকাম্মেল বলেছেন : "...একজন চলচ্চিত্রকারকে কেন এই বিধির বিধানে আটকে ফেলা হবে যে, তার ছবিকে দুই আড়াই ঘণ্টার হতে হবে। আসলে, হলিউড তার লগ্নীপুঁজির স্বার্থে, বিশ্বজুড়ে তাদের পরিবেশ সার্কিটে দুই আড়াই ঘণ্টার এই তথাকথিত পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্রের রীতি চাপিয়ে দিয়ে গেছে। এর বিপক্ষে মুক্ত এক দৈর্ঘ্যের অন্বেষা, শিল্পী হিসেবে আসলে আমাদের স্বাধীনতারই অন্বেষা।"[১০৯]



www.pathagar.com

## মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বিকল্প চলচ্চিত্র ও সেন্সর বোর্ডের খড়্গ

মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায় অথবা চরিত্রকে নিয়ে যেসব চলচ্চিত্র নির্মিত হচ্ছে, সেন্সর বোর্ডের খড়্গ সেসব চলচ্চিত্রের উপর নেমে এসেছে সুপরিকল্পিতভাবে। মোরশেদুল ইসলামের *আগামীর* ব্যাপারে সেন্সর বোর্ড প্রথমে আপত্তি করেছিল, পরবর্তীকালে আপত্তি করার কোন গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা খুঁজে না পেয়ে সেন্সরবোর্ড ছবিটি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বাচ্চুর *একাত্তরের যীশু*-কে ছাড়পত্র প্রদানে অস্বীকৃতি জানায় সেন্সর বোর্ড। কারণ হিসেবে তারা '৮৫ সালের গেজেট নোটিফিকেশনের উল্লিখিত 'Distorts historical facts particularly maligning Bangladesh and its idea and heroes' শীর্ষক নিষেধাজ্ঞার তথ্য জানিয়েছে। পরবর্তীকালে আপীল বোর্ডে চলচ্চিত্রটি ছাড়পত্র পায়। *সরকারি 'লাশ'* শব্দের প্রয়োগের জন্য আটকে দেওয়া হয় *চাকা* ছবিটি। এটিও পরে ছাড়পত্র পায়। আবু সাইদের *ধূসর যাত্রা* মুক্তি পেতে আপীল বোর্ডের সিদ্ধান্তের মুখাপেক্ষী হতে হয়।[১১০] *ধূসর যাত্রা* ছাড়পত্র আটকে দেওয়ায় বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (১৫ জানুয়ারি, ৯২) এক রিপোর্টে বলা হয়, Thirty two intellectuals on Tuesday expressed their deep concern at the refusal of Bangladesh Film Censor Board to issue Certificate to the short film 'Dhusar Jatra' directed by Abu Sayeed. In a joint statement, they said it was a matter of great regret that the Censor Board did not issue certificate to the short film based on the Liberation war when an elected democratic government was in power in the country.[১১১] সেন্সর বোর্ডের শিকার হয় তানভীর মোকাম্মেলের আরো দুটি ছবি : *স্মৃতি-৭১* (১৯৯৩) ও *নদীর নাম মধুমতি*। *স্মৃতি-৭১* বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত '৭১ সালের শহীদ বুদ্ধিজীবী হত্যার উপর লিখিত গ্রন্থ অবলম্বনে নির্মিত। ছবিটির প্রযোজক জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট। ছবিটির নির্মাণ ৯৩-এর শুরুতে শেষ হলেও শর্তানুযায়ী জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট নির্মাতাকে ছবির ১৬ মি.মি. প্রিন্টও দেয়নি উপরন্ত তারা ছবিটিকে সেন্সর বোর্ডে উপস্থাপনের ব্যাপারে নীরবতা পালন করতে থাকে। নির্মাতা নিজেই ছবিটির ব্যক্তিগত কপি সেন্সর বোর্ডে জমা দেয় ১৫ এপ্রিল ৯৩। তারপর হতে এখন পর্যন্ত সেন্সর বোর্ড ছবিটির ব্যাপারে পালন করে চলেছে বিস্ময়কর নীরবতা। নির্মাতার ধারণা জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট ছবিটি দেখাতে আগ্রহী নয়; কারণ শহীদ বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের সাথে যারা জড়িত বর্তমানে এ-দেশের সমাজ ও রাজনীতিতে তারাই শক্তিশালী। একই নির্মাতার মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আরেকটি চলচ্চিত্র *নদীর নাম মধুমতি*-কে সেন্সর বোর্ড আটকে দিয়েছিল। ছবিটির মুক্তির জন্য নির্মাতাকে হাইকোর্ট পর্যন্ত যেতে হয়।[১১২] বিস্ময়কর যে, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ভালো সাহিত্য হয়তো তৈরি হবে, ভালো নাটক হবে, কিন্তু ভালো চলচ্চিত্র নাও হতে পারে। এজন্য সেন্সরের নেপথ্য সক্রিয় কারণগুলির একটি আমাদের সেন্সর বোর্ড।[১১৩]



www.pathagar.com

## ভাবপ্রকাশ, নৈতিকতা ও দায়িত্ব

বাংলাদেশে বিভিন্ন সরকার, সংস্থা, ব্যক্তিবিশেষের কূপমণ্ডুকতা কিংবা সেন্সরবোর্ডের স্বার্থ ও অদূরদর্শিতার কারণে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র তার কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে। এর সাথে রয়েছে খোলা বাজার অর্থনীতির দর্শন : কোল্ড ড্রিংকস, সাবান কয়েল কিংবা আর দশটা পণ্যের মতো চলচ্চিত্র পণ্য বলে। বাংলাদেশে সৃষ্টিশীল চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রয়াস তাই বাধার সম্মুখীন হয়েছে। ব্যক্তির বিশেষ ততক্ষণ স্বাধীন, যতক্ষণ তার অভিব্যক্তি প্রকাশের ক্ষমতা থাকে।[১১৪] চলচ্চিত্রের স্বাধীনতার প্রসঙ্গ তাই সামনে এসেছে বারবার। স্বাধীনতার সঙ্গে দায়িত্ববোধ জড়িত। সেন্সরশিপ বা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যখন অসহিষ্ণুতার পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায় তখন এ-দায়িত্ব পালন কঠিন হয়ে পড়ে। সিনেমার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকেরই দায়িত্ব হলো পারস্পরিক সম্মান এবং অন্যের প্রতি সীমাহীন সহিষ্ণুতা দেখানো।[১১৫]

ভারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির উপর সেন্সরশিপ নির্ভর করে এবং যে আইন বলে সেন্সরশিপের ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে তা সংবিধানের ক্ষেত্রে অনধিকার চর্চা বলে গণ্য হবে না, যদি তা যুক্তিসঙ্গত গণ্য হয়। কিন্তু যে আইন ব্যক্তিগত ভূমির উপরে দাঁড়িয়ে কোন কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, তাকে সহজেই আদালতে টেনে আনা সম্ভব। কিন্তু তা সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ। সাম্প্রতিককালে, আমেরিকায় যে কটি এ-ধরনের মামলা হয়েছে, সেগুলিতে আদালত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিচালকের পক্ষে এবং সেন্সরের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে। নৈতিক ব্যাপারে অভিব্যক্তি প্রকাশের স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রাখলে ভবিষ্যতে সেন্সরশিপের প্রয়োজন থাকবে না।[১১৬] সিনেমার সঙ্গে অন্তত তিনটি গোষ্ঠীর দায়িত্ব জড়িয়ে আছে। তাঁরা হলেন নির্মাতা, প্রযোজক এবং দর্শক। চলচ্চিত্র নির্মাতার প্রথম দায়িত্ব হলো নিজের সঙ্গে প্রতারণা না করা। তিনি স্বাধীনভাবে যেমন ইচ্ছা করতে পারেন। কিন্তু জনগণের জন্য ফিল্ম তৈরি করছেন– এমন ঢালাও মন্তব্য একজন পরিচালকের দায়িত্ববোধের মাপকাঠি নয়; তার দায়িত্ব এমন সব ছবি করা যা সৎ এবং সৃষ্টিশীল অভিব্যক্তিতে পূর্ণ।[১১৭]

নির্মাতারা বলেন, 'দর্শক যা চায় আমরা তাই দিয়ে থাকি।' এ-কথাও এক ধরনের মিথ্যার বেসাতি। কারণ এ পর্যন্ত দর্শকের চাহিদা সম্পর্কে কোন বিশ্বাসযোগ্য জরিপ এ-দেশে হয়নি। তাছাড়া এ-কথা মেনে নিলেও বলতে হয়, নির্মাতারা চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিচ্ছেন। দর্শক যা চাইবে সব সময় তা দেওয়া যায় না। এখানেই শিল্পীর দায়িত্বের প্রশ্ন আসে।[১১৮] অপরদিকে প্রযোজকের যতটা দায়িত্ব তার চেয়ে বেশি দায়িত্ব তার উপর চাপানো হয়। তিনি দর্শকরুচি বা শিক্ষার জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী নন। তিনি ব্যবসায়ী এবং ব্যবসায় যেসব নিয়মকানুনে কাজ করে তার সঙ্গে নান্দনিকতা এবং এমনকি দুর্ভাগ্যক্রমে নৈতিকতারও কোন সংশ্রব নেই। প্রযোজকরা যে, ব্যবসায় টিকে থাকেন তা দিয়ে এটাই প্রমাণ হয় যে



www.pathagar.com

ব্যবসার আইনকানুন তারা ভালো জানেন। তারা ইচ্ছে করলে অশিক্ষিত দর্শকদের জন্য অনেক কিছু করতে পারেন। অতএব প্রযোজকদের কাছে এমন সব ছবির প্রস্তাব দেওয়া উচিত যা ব্যবসার কঠিন দাবি-দাওয়া মেটাতে পারে এবং একই সঙ্গে শিল্প ও নৈতিকতার দায়িত্ব বহন করতে পারে। অনুদানের মাধ্যমে রুচিশীল ও মানসম্মত ছবি নির্মাণে সরকারকেও আরো দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসা উচিত।[১১৯] চলচ্চিত্রের ভালো দিকগুলিকে আবিষ্কার ও সমর্থন করা।[১২০] পরিচালকের যেমন নিজের মর্জিমত ছবি করার অধিকার আছে; তেমনি দর্শকও নিশ্চয়ই দাবি করতে পারেন যে, দর্শক হিসেবে পরিচালক তাদের বিচারবুদ্ধিকে যথোচিত সম্মান করবে, তাদেরকে স্বাধীন ও রুচিশীল মানুষের মর্যাদা দেবে। একটি ছবির বিষয়বস্তু বিচার করে দর্শক নিশ্চয়ই তার নিজের অন্তর্গত ত্রুটি শুধরে নিতে পারেন। দর্শক তার স্বমতের স্বাধীনতা রক্ষায় যেহেতু আগ্রহী, তখন তার উপর আরেকটি দায়িত্ব এসে পড়ে, তার নিজের বিচার ক্ষমতাকে বিকশিত করা। এই বিচারক্ষমতা পরিণত হয়ে উঠলেই দর্শক চলচ্চিত্র থেকে সত্যিকারভাবে উপকৃত হবেন।[১২১]

## উপসংহার

মুক্ত ও গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ যেকোন মাধ্যমে তার মত, বা ভাব প্রকাশ করতে পারেন। স্বাধীন মতপ্রকাশ করতে গিয়ে মানুষ ভুল করতে পারে এবং সেই ভুল মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। এ-সূত্রে কেউ কেউ বলেন, সব কিছুর একটা সীমা আছে। সর্বজননিন্দিত অভিমতের সমর্থনে কোন ব্যক্তির কিছু বলতে পারার অধিকার থাকা উচিত নয়, কারণ তাহলে সমাজে মূল্যবোধ নষ্ট হয়। তাঁরা বলতে চান যে, বেশি বাড়াবাড়ি সমর্থন করা যায় না। বস্তুত, বিরুদ্ধ মত না-শুনে নিজেদের অভ্রান্ত মনে করা কোন কাজের কথা নয়। সকল প্রকারের মতামত এমনকি ভ্রান্ত মতও যদি জানা যায় তাহলে সেই জ্ঞান পরম সত্যে উপনীত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হয়। মত বা ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা ও চলচ্চিত্র বিষয়ক আলোচনায় এ-দর্শনকেই প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন।

## তথ্যসূত্র :


১. মিনিস্ট্রি ফর ফরেন অ্যাফেয়ার্স অব সুইডেন; *এ হিউম্যান রাইটস মেসেজ*, ১৯৯৯ পৃ. ১৭৪

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

৩. পার্থ চট্টোপাধ্যায়; *বিষয় : সাংবাদিকতা* (*কলকাতা : লিপিকা*, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯০) পৃ. ৩২

৪. ফিরোজ আহমদ (সম্পাদিত), *ল রিভিউ*, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন গবেষণা ছাত্র কেন্দ্রের তথ্য প্রকাশনা) সংখ্যা, ১১ বর্ষ, ৪ আগস্ট, ১৯৯৬, পৃ. ২

৫. গাজী শামছুর রহমান; সংবাদ বিষয়ক আইন, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৮৪) পৃ. ২২২




www.pathagar.com

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২
৭. গান্তঁ রোবেজ; (উৎপলকুমার বসু অনূদিত), *সিনেমার কথা,* (কোলকাতা বাণী শিল্প, মার্চ, ১৯৯৫), পৃ. ২৮৭
৮. তানভীর মোকাম্মেল; *সিনেমার শিল্পরূপ* (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮), পৃ. ১৯২
৯. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, (১৯৯৪ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত সংশোধিত) পৃ. ২৭
১০. গাজী শামছুর রহমান; *সংবাদ বিষয়ক আইন* (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৯৪) পৃ. ২২২
১১. মিনিস্ট্রি ফর ফরেন অ্যাফেয়ার্স অব সুইডেন; *এ হিউম্যান রাইটস মেসেজ,* পৃ. ১৭৫
১২. গান্তঁ রোবেজ; *সিনেমার কথা,* পৃ. ২৯২
১৩. হারমান মেইন; *ম্যাস মিডিয়া ইন দ্য ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানি,* ১৯৯৪, পৃ. ৬
১৪. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, পৃ. ২৭
১৫. মিনিস্ট্রি ফর ফরেন অ্যাফেয়ার্স অব সুইডেন; পৃ. ১৭৬
১৬. জিন গিলমোর; *মর্ডান নিউজ পেপার এডিটিং;* (সান ফ্রান্সিকো : বয়েড এন্ড ফ্রেজার পাবলিশিং কোম্পানি, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৩), পৃ. ২৫৯
১৭. চিন্ময় মুৎসুদ্দী, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে সামাজিক অঙ্গীকার,* (ঢাকা : বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, জুন, ১৯৮৭), পৃ. ১১
১৮. মির্জা তারেকুল কাদের, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প,* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, জুন, ১৯৯৩), পৃ. ৪৮৪
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৫
২০. আহমেদ মুজতবা জামাল (সম্পাদিত) *চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রকাশনা 'সেলুলয়েড'* (ঢাকা : রেইনবো চলচ্চিত্র সংসদ, ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫), পৃ. ৫
২১. চিন্ময় মুৎসুদ্দী, পৃ. ১১
২২. মির্জা তারেকুল কাদের, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প,* পৃ. ২৫
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬
২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪
২৬. চিন্ময় মুৎসুদ্দী, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে সামাজিক অঙ্গীকার,* পৃ. ৪
২৭. মির্জা তারেকুল কাদের, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প,* পৃ. ৪৯২
২৮. চিন্ময় মুৎসুদ্দী, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে অঙ্গীকার,* পৃ. ১৫
২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
৩০. মির্জা তারেকুল কাদের, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প,* পৃ. ৪৮৪
৩১. চিন্ময় মুৎসুদ্দী, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে সামাজিক অঙ্গীকার,* পৃ. ১২৯
৩২. মির্জা তারেকুল কাদের, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প,* পৃ. ৪৮৪
৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৪
৩৪. নির্মাল্য আচার্য ও দিব্যেন্দু পালিত (সম্পাদিত), *শতবর্ষের চলচ্চিত্র* (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় খন্ড, জানুয়ারি, ১৯৯৮), পৃ. ৫২৬
৩৫. মির্জা তারেকুল কাদের, পৃ. ৪৮৫-৪৮৬



www.pathagar.com

৩৬. বাংলাদেশে অভিযোজিত পাকিস্তান আমলে প্রণীত ১৯৬৩ সালের চলচ্চিত্র সেন্সরশিপ আইনের ১০ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সরকার সরকারি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণের বিধিমালা প্রণয়ন করতে পারবে। সূত্র : আবু নছর মোঃ গাজিউল হক(সংকলিত), *বাংলাদেশের গণমাধ্যম, আইন ও বিধিমালা,* (ঢাকা : এ্যামিক ও ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, নভেম্বর, ১৯৯৬), পৃ. ১১০

৩৭. মির্জা তারেকুল কাদের, পৃ. ৪৮৬-৪৮৭

৩৮. চিন্ময় মুৎসুদ্দী, পৃ. ১৭১

৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০

৪১. আবু নছর মোঃ গাজিউল হক (সংকলিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ১১

৪২. ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগরে তৎকালীন বিপ্লবী সরকারের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলামের স্বাক্ষরিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে সকল আইন বলবতের কথা বলা হয়। সূত্র : চিন্ময় মুৎসুদ্দী; বাংলাদেশের *চলচ্চিত্রে সামাজিক অঙ্গীকার,* পৃ ১৭৬

৪৩. আবু নছর মোঃ গাজিউল হক (সংকলিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৬

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯-৩০

৫০. ফিরোজ আহমেদ (সম্পাদিত), *ল রিভিউ* (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন গবেষণা ছাত্র কেন্দ্রের প্রকাশনা), *সংখ্যা* ১১; আগস্ট, ১৯৯৬

৫১. আবু নছর মোঃ গাজিউল হক (সংকলিত), পূর্বোক্ত পৃ. ২৮৮

৫২. উৎপল কুমার বসু (অনূদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৮

৫৩. মির্জা তারেকুল কাদের, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮৪

৫৪. মোঃ খুরশীদ আলম; *সংবাদপত্রের স্বাধীনতা,* সুবর্ণ, ঢাকা জুন, পৃ. ২৫

৫৫. মির্জা তারেকুল কাদের, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮৩

৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৩

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৪

৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৪

৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৪

৬০. উৎপল কুমার বসু (অনূদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৮

৬১. নির্মাল্য আচার্য ও দিব্যেন্দু পালিত (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২৬

৬২. মির্জা তারেকুল কাদের, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮৩

৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯২

৬৪. নির্মাল্য আচার্য ও দিব্যেন্দু পালিত (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২৮

৬৫. মির্জা তারেকুল কাদের, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯২-৪৯৩



www.pathagar.com

৬৬. উৎপল কুমার বসু (অনূদিত), *সিনেমার কথা*, (কলকাতা : বাণী শিল্প, মার্চ, ১৯৯৫), পৃ. ২৮৬
৬৭. মির্জা তারেকুল কাদের, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৪
৬৮. মির্জা তারেকুল কাদের, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প*, পৃ. ৪৯৭
৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৩
৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৯
৭১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৯
৭২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯৭
৭৩. চিন্ময় মুৎসুদ্দী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩১-১৩২
৭৪. মির্জা তারেকুল কাদের, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প*, পৃ. ৪৯৩
৭৫. চিন্ময় মুৎসুদ্দী, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে সামাজিক অঙ্গীকার*, পৃ. ১৩২
৭৬. ফিরোজ আহমেদ (সম্পাদিত), ল রিভিউ সংখ্যা ১১, বর্ষ-৪, আগস্ট, ১৯৯৬, পৃ. ২
৭৭. অনুপম হায়াৎ, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ইতিহাস* (ঢাকা : বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, আগস্ট ১৯৮৭), পৃ ১৬১
৭৮. চিন্ময় মুৎসুদ্দী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮
৭৯. আব্দুস সেলিম, *সেলুলয়েড শিল্প ও সংসদ আন্দোলন* (ঢাকা : প্যাপিরাস প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি---), পৃ. ৩৬
৮০. চিন্ময় মুৎসুদ্দী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮
৮১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮
৮২. মির্জা তারেকুল কাদের, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩৮
৮৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৮-৬৩৭
৮৪. চিন্ময় মুৎসুদ্দী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪০
৮৫. আব্দুস সেলিম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫
৮৬. মির্জা তারেকুল কাদের, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প*, পৃ. ৬৩৮
৮৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৮
৮৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫২
৮৯. তানভীর মোকাম্মেল; *সিনেমার শিল্পরূপ*, (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮), পৃ. ২০০
৯০. মির্জা তারেকুল কাদের, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, জুন, ১৯৯৩), পৃ. ২৯০-২৯১
৯১. আহমেদ মুজতবা জামাল (সম্পাদিত), *সেলুলয়েড*, ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫, পৃ. ৪৬
৯২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬
৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭
৯৪. মির্জা তারেকুল কাদের, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৬
৯৫. আহমেদ মুজতবা জামাল (সম্পাদিত), *সেলুলয়েড*, ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫, পৃ. ৪৭
৯৬. মির্জা তারেকুল কাদের, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প*, পৃ. ৪৭২



www.pathagar.com

৯৭. মুহাম্মদ খসরু (সম্পাদিত), *চলচ্চিত্র পত্র*, একাদশ বর্ষ ১ম সংখ্যা, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১, পৃ. ২৮
৯৮. মির্জা তারেকুল কাদের, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৬
৯৯. তানভীর মোকাম্মেল; *সিনেমার শিল্পরূপ*, (ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮), পৃ. ১৯৭
১০০. মির্জা তারেকুল কাদের, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫২
১০১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২
১০২. তানভীর মোকাম্মেল; *সিনেমার শিল্পরূপ*, পৃ. ১৮১
১০৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১
১০৪. মির্জা তারেকুল কাদের, *বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প*, পৃ. ২৫২-২৫৪
১০৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪
১০৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০
১০৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫
১০৮. আহমেদ মুজতবা জামাল (সম্পাদিত), *সেলুলয়েড*, ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫, পৃ. ৪৫
১০৯. তানভীর মোকাম্মেল; *সিনেমার শিল্পরূপ*, পৃ. ৪৫
১১০. ফিরোজ আহমেদ (সম্পাদিত), ল রিভিউ সংখ্যা ১১, বর্ষ-৪, আগস্ট, ১৯৯৬, পৃ. ৫
১১১. মোঃ খুরশীদ আলম; *সংবাদপত্রের স্বাধীনতা*, সুবর্ণ, জুন, ১৯৯২, পৃ.
১১২. (ঢাকা : বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের প্রকাশনী) নিরীক্ষা, ৭৯ সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল, ৯৭, পৃ. ৪
১১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮
১১৪. মির্জা তারেকুল কাদের, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮৩
১১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪
১১৬. উৎপল কুমার বসু (অনূদিত), *সিনেমার কথা*, (কলকাতা : বাণী শিল্প, মার্চ, ১৯৯৫), পৃ. ২৯২
১১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০
১১৮. চিন্ময় মুৎসুদ্দী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮
১১৯. উৎপল কুমার বসু (অনূদিত), পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৫
১২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫
১২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩

*সূত্র : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা অক্টোবর ২০০৩-ফেব্রুয়ারি ২০০৪ যুক্তসংখ্যায় জনাব রোবায়েত ফেরদৌসের সঙ্গে যৌথভাবে লিখিত।*


www.pathagar.com

# সাংবাদিকতায় নীতির দ্বন্দ্ব

## ভূমিকা

একটি সভ্য ও কাম্যমাত্রার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একটি যুথের (Community) প্রতিটি সদস্যই কিছু না কিছু বিধিবিধান মেনে চলে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষেরও কিছু না কিছু নিয়মকানুন ছিল। মানামানির সেই বিধানগুলো এমন নয় যে কোন ব্যবস্থার মানুষেরা তা একদিনেই তৈরি করে ফেলেছিল। জীবনের অভিজ্ঞতার দীর্ঘপথে তাঁরা-বিশেষ করে সমাজপতিরা—সমাজকে একটি শৃঙ্খলার মধ্যে বেঁধে রাখতেই ওই বিধিবিধানগুলো তৈরি করে থাকেন। সেই নিয়মগুলোর এমন কতকগুলো যা সময়ের বিবর্তনে না মানলে মৃত্যুদণ্ড হবে এমন নয়। কোন-কোন সমাজব্যবস্থায় একেবারেই যে হয় না তাও নয়। তবে না মানলে দণ্ডের সীমানা অধিকাংশেই ভর্ৎসনার মধ্যেই আটকে থাকে। পিতার সামনে সিগারেট খাওয়াটা বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে রীতিসম্মত নয়। খেলে পিতার সামনে যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। এটি অন্যায় কিন্তু পশ্চিমা সংস্কৃতিতে তা নয়। একটি সংস্কৃতির জন্য যেটা নিয়ম, অন্য সংস্কৃতিতে তা অন্যায়, অশোভন-অশালীন। Every civilization has its own mores (Akbar, 2009: 11). স্বল্পপোশাকে নারীদের প্রকাশ্যে চলাফেরা পশ্চিমা সংস্কৃতির অংশ বটে কিন্তু কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতে সেরকম দৃশ্য কী কল্পনা করা যায়? যদি সেরকমটা ঘটেও এবং তার ছবি যদি কেউ ধারণও করে ফেলে তা কী পত্রিকার পাতায় ছাপা যায়? র‍্যাবের ক্রসফায়ারে মারা পড়া কোন মানুষের চাটাই মোড়ানো, গুলিতে ঝাঁঝরা হওয়া লাশের গা বেয়ে রক্ত ঝরছে অথবা লাশের ওপর মাছি উড়ছে, এরকম ছবি কী আমরা টিভি'র স্ক্রিনে দেখাতে পারি? অথবা সাবানের বিজ্ঞাপনের ওই মেয়েটি গায়ের জামা খুলে ভেতরের আবাসটাকে দৃশ্যমান করে বিজ্ঞাপনের ফোকাসটাকে স্নায়ু তাড়ানো একটা জায়গাতেই কেন্দ্রীভূত করে ফেলে তা কী আমরা করতে পারি অথবা একথাগুলো যে আমিও এভাবে বর্ণনা করছি তাও আমি করতে পারি কিনা। এসকলই নীতির প্রশ্ন।


www.pathagar.com

## তাহলে নীতি কি?

সাংবাদিকরা কী অবলীলায় সবকিছু করতে পারে? তার অধিকার কী নিরঙ্কুশ অধিকার (absolute right)? নীতির বিষয়টি শুধু সাংবাদিকতা নয়, সকল পেশার জন্যই প্রযোজ্য। সাংবাদিকদের জন্য এটি আরো বেশি জরুরি। 'Journalists as a group are no more likely to exploit their positions than people in other professions, but when journalists make the wrong ethical choices, the consequences can be very damaging' (Biagi, 1992 : 442).

নীতি কী? নীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ Ethics গ্রীক পদ Ethos থেকে এসেছে, যার অর্থ হচ্ছে 'The traditions or guiding spirit that governs a culture' (ibid : 442).

আরেকটি ব্যাখ্যা হচ্ছে : 'Ethics comes from the Greek word ethos meaning 'character', or what a good person is or does to have a good character' (Bryant et al, 1998 : 388).

অতএব নীতি হচ্ছে চলার বিষয় এবং সেটি মানলেই ভালো; সবার জন্য কল্যাণ। তবে মানতে বাধ্য হওয়ার বিষয় নয়। না মানলে, আগেই বলেছি, বড় দণ্ডের আশংকা কম। বরং ভর্ৎসনার মুখোমুখি হয় মানুষ। এই নীতি মানুষ শিখে প্রথমে পরিবারে, পরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। আর যাঁরা সংবাদমাধ্যমে আসেন তাঁরা হয় সাংবাদিকতার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পেশার নীতি সম্পর্কে আরো ভাল করে শিখেন অথবা পেশায় ঢোকার পর প্রথম পাঠ হিসেবে নীতিটা ভাল করে শিখে নেন। এটার উপকার আছে। দু'টো কেসস্টাডি থেকে জানা গেছে, খুলনা'র প্রায় ৮৭ শতাংশ সাংবাদিক বলেছেন, বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের পর তারা সাংবাদিকতার নীতিসমূহ মেনে চলেন। একই বিষয়ে টাঙ্গাইলের ৯০ শতাংশ সাংবাদিকও বলেছেন, প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর তারা এখন সাংবাদিকতার নীতি মেনে চলেন (রায়, ২০০৭ : ২২১)। অতএব নীতি সম্পর্কে না জেনে কাজ করাটা খুব একটা কাজের কথা নয়। একটি একক ব্যবস্থায় বসবাস করে সর্বজনগ্রাহ্য নীতিমালা না মানা অথবা তার বিরোধিতাও কাজের কথা নয়।

নীতির সঙ্গে দায়িত্বের (responsibility) একটি সুগভীর সম্পর্ক রয়েছে। নীতি হচ্ছে দর্শনসঞ্জাত একটি ভিত্তি (Philosophical foundation), আর দায়িত্বশীলতা হচ্ছে নীতির প্রতি সম্মান দেখিয়ে কিভাবে আমি প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছি আমার প্রকাশনায় কিংবা পরিবেশনে। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার নীতি অনুসারে আমি লিখছি কিনা বা বলছি কিনা। 'Social responsibility and ethics


www.pathagar.com

almost interchangeably, because we belive that members of institutions have a societal obligation to function responsibility, and ethics are the manifestations of that social conciousness' (Byant el at : 388).

অতএব Ethics যদি হয় নীতি বা জীবনবিধান অন্যার্থে পেশাগত বিধান তবে তার খুব কাছাকাছি হচ্ছে Morality বা শ্রেয়নীতি অন্যার্থে সদাচরণ।

Ethics deals with the philosophical foundation of decision making, of choosing among the good and bad options that one faces. Morality on the other hand, comes from the Latin mores and refers to the way or manner, in which people behave. Thus morality has come to mean socially approved customs, or the practice or application of ethics (ibid : 388).

কোন পরিবেশনায় আমি শালীন হব কিনা তা নির্ভর করে নীতির ওপর এবং এর প্রমাণটি হয় শ্রেয়নীতির (Morality) ওপর। আর আমি যখন তা মানছি না, না মেনে যখন দেখি তার কোন প্রতিকার নেই-যেটা হরহামেশাই বাংলাদেশি সংস্কৃতিতে ঘটছে—তখনই প্রয়োজন হয় আইনের। '...law... is a bottom-line, minimalistic enterprise that tells us what we can do or cannot do' (ibid : 388)। আইনের বৈশিষ্ট্যই হলো যে কোন কিছু মানতে বা করতে আপনাকে বাধ্য করা; বাধ্য না হলে রয়েছে শাস্তির বিধান। কিন্তু সমাজে যদি আইনের শাসন না চলে অথবা নীতি কিংবা আইন মেনে চলার সংস্কৃতি তৈরি না হয় তাহলে নীতি কিংবা আইন কোন কিছু দিয়েই একজনকে শৃঙ্খলায় নিয়ে আসা যাবে না। প্রকাশ্যে ধূমপান আইন দিয়ে বন্ধ করার পদক্ষেপটি এরই মধ্যে ভ্রান্ত বলেই প্রমাণিত হয়েছে। নীতির ব্যবহারটাই ছিল বরং ভাল। অতএব ব্রডকাস্টিং পলিসি নিয়ে যারা বলছেন এ নিয়ে দেশে অনেক আইন আছে, নীতির দরকার নেই- তা শুধু একটি ভ্রান্ত উপলব্ধি মাত্র। আইন শিষ্টাচার শেখাতে বাধ্য করে, আর তখন নিপীড়নের প্রশ্ন এসে যায়; কিন্তু নীতি মানুষকে শিষ্টাচার শেখায়। এটাই ধ্রুব সত্য।

সাংবাদিকতার কাজটি এমন যে প্রধানত দু'টো কারণে সাংবাদিককে নীতিভ্রষ্টতার মধ্যে পড়তে হয়।

Journalist sometimes made poor ethical judgements because they work quickly and their actions can be haphazard; because the lust to be first with a story that can override the desire to be right;



www.pathagar.com

because they sometimes don't know enough to question the truthfulness of what they're told; because they can win attention and professional success quickly by ignoring ethical standards; and because journalists sometimes are insensitive to the consequences of their stories for the people they cover (Biagi : 442).

দ্রুত কাজ করতে গিয়ে আমরা ভুল করি এবং প্রায়শই ভুল করি। ডেডলাইনের চাপে পড়ে আমরা অনেক সময়ই ক্রস চেকিংয়ের সুযোগ পাই না; করিও না। অনেক সময় অকারণে অন্যকে পরাজিত করার অনৈতিক ক্ষুধা কাজ করে। সময়ের অভাবের কারণে সত্যাসত্যের ভেদরেখা জানার হিতাহিত জ্ঞান পর্যন্ত থাকে না। ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে এর প্রকোপ আরো তীব্র। এটা টিভি সাংবাদিকতায় দেখানোটা (Showmanship) একটা বৈশিষ্ট্য বলে। কিন্তু জানানোর (to inform) বদলে দেখানোটাই বড় হয়ে উঠছে বেশি। এখানে তথ্যদানের চেয়ে Adventurism ও glamour টাই মুখ্য হয়ে উঠছে। ঘটনার একপাশের দিকটা তুলে ধরছি, উল্টো পাশে কি হচ্ছে তা দেখছি না। মানুষের আবেগটাকে সম্মান করছি না, শ্রদ্ধা করছি না, সবার আগে আমি দেখাতে চাই। বড় ঘটনায় চ্যানেলগুলোর লাইভ টেলিকাস্টের ডামাডোলে পাঠক বুঝতেও পারে না ঘটনাক্রমগুলোর কোনটা আগে কোনটা পরে। ৫-১০ ঘণ্টার আগের ঘটনাক্রমটিও এমনভাবে দেখানো হচ্ছে যে, মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে। কোনটা সতেজ খবর কোনটা বাসি তা নিয়ে টিভি মিডিয়ার মাথাব্যথা নেই, এছাড়া আছে অজস্র মন্তব্যের ছড়াছড়ি। দর্শক যেন সব মিলিয়ে এই উপলব্ধি করে আমরা অন্যের চেয়ে ভাল দেখাতে পেরেছি। এসবই হচ্ছে অসুস্থ প্রতিযোগিতার ফসল। বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনায় টিভি মিডিয়ার কভারেজ অনেক ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। তরুণ রিপোর্টাররা অনেক সাহসী ও ভাল কাজ করেছে। কিন্তু যতটা ছিল জ্ঞাপনের কাজ তার চেয়েও বেশি ছিল গ্লামার। তথ্যের আলোকে মিডিয়ার সেট করা গ্ল্যামারের চক্রে আমরা যেন মোহাবিষ্ট হয়ে আছি।

এত কিছুর পরেও পাল্টা প্রশ্ন এত-এত নীতি নিয়ে পড়ে থাকলে সাংবাদিকতাই তো হবে না। হ্যাঁ সাংবাদিকতা পেশায় নীতির দ্বন্দ্ব বা সংকট রয়েছে। মাঝে-মধ্যে পরিবেশ-পরিস্থিতি এমন একটা অবস্থায় গিয়ে দাঁড়ায় তখন পেশাগত সততা ও নীতির ভেদরেখাটা কোথায় তা চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। বিয়াজি (১৯৯২) নীতির চারটি সংকটের কথা বলেছেন। আমরা সেগুলো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মূল্যায়ন করার চেষ্টা করতে পারি। এর প্রথমটি হচ্ছে–

১. সত্যবাদিতা (Truthfulness) : অর্থাৎ যা বলব, যাদের সম্পর্কে বলব তা পুরোটা সত্য হবে। এর বিপরীতে যা তাহলো মিথ্যে, বানোয়াট। সত্য বলার কথা



www.pathagar.com

থাকলেও সাংবাদিক কখনো-কখনো নিজেই চরিত্র সৃষ্টি করে থাকেন। যারা ফিচার সার্ভিস দেন কিংবা সরাসরি ফিচার লিখে থাকেন বিশেষ করে সামাজিক কুপ্রভাব এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম নিয়ে তারা অনেক সময়ই চরিত্র সৃষ্টি করে থাকেন। নামিদামি পুরস্কারও মিলে যায় তাদের, পুলিৎজার পুরস্কার পর্যন্ত। পরে অনেক সময়ই প্রমাণিত হয়েছে সেই সকল চরিত্রগুলো কাল্পনিক। একে সাংবাদিকতার ভাষায় বলে Misrepresentation। চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষের সময় জালপরা বাসন্তী নিয়ে যে ছবি ছাপা হয়েছিল তা নিয়ে এখনো বিতর্ক আছে। এ নিয়ে প্রেস ইনস্টিটিউটের এক সেমিনারে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হতে দেখেছি। পয়লা ফাল্গুনে কৃষ্ণচূড়ার ছবি, প্রবল বর্ষণে জলমগ্ন ঢাকা মহানগরীর কোন রিকশা থেকে কোন স্কুলফেরত কিশোরীর হাসতে-হাসতে পড়ে যাওয়ার দৃশ্য, এসবই Misrepresentation-এর দৃষ্টান্ত। উল্টোদিকে সরকার কিংবা দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষ এমন কিছু তথ্য দেন তা নিয়ে সমাজে এমনকি সারাবিশ্বে মহাশোরগোল পড়ে যায়। ইরাকে মহাবিধ্বংসী অস্ত্র পাওয়া গেছে বলে আমেরিকার প্রলয়কাণ্ডে ইরাক লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। অস্ত্র পাওয়া যায়নি এরকম কথা বলতে গিয়ে ব্রিটেনের একজন পরিদর্শকের প্রাণটাই বেঘোরে গেল। এই ধরনের তথ্যকে বলে Disinformation. যুদ্ধ বা যুদ্ধের মতো স্পর্শকাতর পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ এমন সব তথ্য দেন যে সাংবাদিক ডেডলাইনের চাপে এবং প্রথম হবার অসুস্থ প্রতিযোগিতায় মত্ত হয়ে ক্রসচেকিংয়ের প্রয়োজনটুকুও অনুভব করেন না। বিডিআর ইস্যুতে সেনা কর্তৃপক্ষ একবার বলল ৭০ জন সেনা কর্মকর্তা নিখোঁজ, মিডিয়া তাই লিখে দিলো। দু'দিন পরে কর্তৃপক্ষ বলল ৭, মিডিয়া আবার লিখল ৭। কোন্‌টি সত্য? মিডিয়ার কি বিষয়টি বিবেচনায় আনা উচিত ছিল না?

২. নীতির সংকট বা দ্বন্দ্ব রয়েছে ন্যায্যতা (Fairness) নিয়েও। বিটে (Beat) কাজ করতে গিয়ে কারও সঙ্গে রিপোর্টারের দোস্তি হয়ে যেতে পারে। তার কাছ থেকে উপহার নিতে পারি, সুবিধা নিতে পারি। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ভেতরের কোন খবর না ছেপে প্যারিস কনসার্টিয়ামের বৈঠকে যাবার সুযোগটা নিতে পারি। তেহলকা ডট কমের মতো খবর পাবার জন্য ঘুষ দিতে পারি। এটা সুনীতির মধ্যে পড়ে কিনা! শেয়ার বাজারের খবর আমি জানি, আমার বন্ধুকে আগেভাগে জানিয়ে তাকে লাভবান হতে সাহায্য করে আমি পরে অন্যভাবে লাভবান হব কিনা। এসবই ন্যায্যতার প্রশ্ন। সাংবাদিকতায় নীতির দৃষ্টিকোণ থেকে একে বলে Insider friendship, conflict of interest ও checkbook journalism.

৩. সাংবাদিকতার নীতির তৃতীয় দ্বন্দ্ব বা সংকট হচ্ছে গোপনীয়তা বা Privacy। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন ও যাপন নিয়ে সংবাদমাধ্যমগুলোর এক ধরনের ঔৎসুক্য থাকে বিশেষ করে নামি লোকদের। কিন্তু মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা যদি



www.pathagar.com

সমাজকে নাড়া না দেয় উদ্বিগ্ন করে না তোলে তাহলে তা নিয়ে আমাদের লেখার কোন নৈতিক অধিকার নেই। লাকসামের একজন ইউপি মেম্বার ভারতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার হলেও তার সামাজিক মর্যাদা রক্ষার জন্য নামধাম, ঠিকানা গোপন রাখা হচ্ছিল অথচ বেনাপোল বর্ডারে আসতে না আসতেই তাঁর সমস্ত পরিচিতি দিয়ে আমরা তাঁকে দ্বিতীয়বারের মতো ধ্বংস করেছি।

Sensational material violets a person's love life, business affairs or social activities can constitute invasion of privacy. If the acts are private and of no legitimate concern to the public, the material is dangerous.

...If the reporter forces himself or herself into a private area to gather news, this is intrusion. The intrusion need not to be physical. The use of tape recorders, hidden microphone, cameras and any other kind of electronic equipment without the person's permission is intrusion; even of the material is not used. (Mencher, 1993 : 412)

ফিল্মস্টার সালমান খান বাসায় বসে মদ খান না কি করেন তাতে কিছু আসে যায় না; কিন্তু মদ্যপ অবস্থায় কাউকে যদি গাড়ি চাপা দেন তবে তা গোপনীয়তার অংশ নয়। এইড্স-এ আক্রান্ত হয়ে কেউ সমাজের মানুষের কোন ক্ষতি না করলে আগ বাড়িয়ে কারো রোগাক্রান্তের খবর ছাপিয়ে তাঁকে সমাজবিচ্যুত করা সাংবাদিকের নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। গোপনীয়তা হচ্ছে মানুষকে তার মতো করে একান্তভাবে শান্তিতে থাকতে দেয়া। তাঁর গোপনীয়তা জনউদ্বেগ তৈরি না করলে তা লঙ্ঘন করা উচিত নয়। কিন্তু আমরা তা হরহামেশাই করছি।

৪. দায়িত্বশীলতা বা Responsibility হচ্ছে চতুর্থ দ্বন্দ্ব বা সংকট। বস্তুনিষ্ঠভাবে সংবাদ পরিবেশন হচ্ছে সাংবাদিকের পেশাগত দায়িত্ব। কিন্তু কতগুলো বিষয় আছে যখন বস্তুনিষ্ঠতাকে দায়িত্বশীলতার জন্য পথ ছেড়ে দিতে হয়। র‍্যাবের ক্রসফায়ারে মারাপড়া কোন মানুষের রক্তাক্ত বিকৃত লাশের ছবি কিংবা খাঁচার পাশ দিয়ে যাবার সময় একজন টোকাইকে চিড়িয়াখানার অর্জুন নামের বাঘটি টেনেহিঁচড়ে তার খাবার বানিয়ে ফেলার পর খাঁচার পাশে হতভাগা সেই টোকাইয়ের পড়ে থাকা মুণ্ডটির ছবি আমরা ছাপাতে পারি কিনা। হিন্দু ও মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মধ্যকার কোন জাতিগত দাঙ্গার খবর বস্তুনিষ্ঠভাবে ক্রমাগত ছাপিয়ে দাঙ্গাকে আরো উসকে দেব নাকি বস্তুনিষ্ঠতা Sacrifice করে কিছু অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করব? সাংবাদিকের জন্য এ এক চ্যালেঞ্জ কোন্‌টা করব।



www.pathagar.com

বিডিআর ইস্যুতে সেনাকর্মকর্তাদের নিখোঁজের মতো অতিসংবেদনশীল খবরটিতে মিডিয়া আরো দায়িত্বশীল হতে পারত কী? একদিকে জনগণের কাছে জানানোর তীব্র তাগিদ ও আকাঙ্ক্ষা অপরদিকে নীতির সীমা লঙ্ঘন হয়ে যায় কিনা এ এক উভয় সংকট। আমরা কি বেশি-বেশি করে বলার চেষ্টা করব নাকি সীমা লঙ্ঘনের ভয়ে চুপ করে থাকব? সম্ভবত দু'টোর মধ্যে আমাদের একটা ভারসাম্য তৈরি করতে হবে। আমাদের কিছু সাংবাদিক বন্ধু আছেন যাঁরা খুবই insensitive বা অসংবেদনশীল। কোন কিছু সত্য না মিথ্যা, কারো গোপনীয়তা লঙ্ঘন হলো কিনা, পক্ষপাতদুষ্টতা গ্রাস করল কিনা তা আমাদের মোটেই ভাবায় না, আমরা তা অবলীয়ায় লিখে ফেলি। তার উল্টোপাশে আরেকদল হলো hypersensitive বা অতিসংবেদশীল যাঁরা সব সময় হায়-হায় করেন। আমাদের সমাজব্যবস্থা পশ্চিমের বিশেষ করে আমেরিকা অথবা ইউরোপের Nordic অঞ্চলের রাষ্ট্রব্যবস্থায় পরিচিত তত্ত্বের আলোকে পরিচালিত হয় না। সঙ্গত কারণেই পুরো উদার আমরা হতে পারব না, বরং দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়ে সংবাদ পরিবেশনায় আমাদের সমুন্নত নীতি বজায় রেখে চলতে হবে। কিন্তু খোলা আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবের কারণে অনেক কিছু প্রকাশে আপত্তিকে অনেকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বলেও গণ্য করেন।

**পরিশেষ :**

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিজেই একটি সংবেদনশীল বিষয়। এক ব্যবস্থায় যেটা সত্যিই স্বাধীনতা আরেক ব্যবস্থায় তা হস্তক্ষেপ। এর সঙ্গেই নীতি ও দায়িত্বের প্রশ্নটি আসে। নীতিবর্জিত, বিবেকবর্জিত নির্বিচার অনেক কিছু আমরা করতে পারি না। The liberty of the press consists, in the strict sense, merely ... exemption from the superintendence of a licencer (http:// caselaw.lp. findlaw.com/ data/ constitution/ amendment 01).

বাংলাদেশে নীতির প্রয়োগ নিয়ে বিতর্ক কিংবা পেশাগত দ্বন্দ্ব রয়েছে। প্রথম আলো'র সম্পাদক মতিউর রহমান সম্পাদক ও প্রকাশকদের প্রশিক্ষণের কথা বলেছেন। টেলিভিশন চ্যানেলের ব্যবস্থাপকদেরও নীতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ জরুরি অন্তত নিচের বিবরণী থেকেতা উপলব্ধিযোগ্য। একটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় পুড়ে যাওয়া মানবদেহ দেখানোর কভারেজের ওপর একজন ভিউয়ার তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন এভাবে :

Why the television channels in Bangladesh keep on failing to care for the sensitive and weak hearted or even for the children who might be watching the television. It was appalling to see the



www.pathagar.com

news camera covering the half charred and half burnt body of one of the victims. ... no one heed the least sense of decency in showing respect to the unknown victim who was once someone's loved one. It appeared no one even bothered to put off the smouldering fire which was very much ablaze on the dead man's body. Instead of being active in bringing the dead mans burning body on our television screen, the television crew should have rather initiated the humane effort to put off the blaze from the body and that would have been more civilized.

In the UK the television newscasters caution the viewers of even flash photography on any news coverage of superstars and we still often falter to care for basic human norms in Bangladeshi channels.

I do not wish to shudder while watching Bangladeshi channels any more and would hope that the respected news moderators of these television channels would abide by basic international standards of news coverage.

The sudden influx of cable television channels have recruited many enthusiastic and sometimes challenging and brave news reporters but we should also be attentive to training the crew with code of conduct relating to news coverage (The Daily star, 2009...)

গণমাধ্যম- সে সংবাদপত্র, টিভি-রেডিও যাই হোক না কেন- একটি সার্বজনীন নীতির মধ্য দিয়ে এগোবে এটাই প্রত্যাশিত। নীতি সবসময় বলে দেয়ার বিষয় নয়, উপলব্ধির বিষয়। সেই উপলব্ধিটা জাগ্রত করার জন্যই মাঝে-মধ্যে ওরিয়েন্টেশন দরকার। বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯নং ধারার ২ উপ-ধারায়ও নৈতিকতা, শালীনতা সম্পর্কে বলা আছে। নীতি যদি ভাল জানি, মেনে চলি, তাহলে নীতি নিয়ে দ্বন্দ্বের কোন কারণ আছে কী?

**তথ্যসূত্র :**

১. Shirley Biagi (1992) : Media Impact (An Introduction of Mass Media) 2nd edition; Wads Worth Publishing Co. California.



www.pathagar.com

২. Melvin Mencher (1989) : Basic News Writing, 3rd edition; Universal Book Stall, New Delhi.
৩. Jay Black, Jennings Bryant and Susan Thompson (1998) : Introduction to Media Communication, 5th edition, McGraw-Hill Companies Inc.
৪. The Constitiution of the people's Republic of Bangladesh (As modified upto 1998).
৫. The Daily Star, (2009). Letters to the Editor Page.
৬. সুধাংশু শেখর রায় (২০০৭) : বাংলাদেশের মফস্বল সংবাদপত্র এবং জনগণের উপর তার প্রভাব (অপ্রকাশিত পিএইচডি অভিসন্দর্ভ)।
৭. M. J. Akbar (2009) : In a class of his own (An article published in the editorial page of the Daily Star; September 20, 2009).

*সূত্র : বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের জার্নাল নিরীক্ষা'র জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১০ সংখ্যায় প্রকাশিত।*



www.pathagar.com

# বন্যা, ত্রাণকাজে পলিথিনের ব্যবহার এবং গণমাধ্যমের ভূমিকা

উনষত্তর দিন তাণ্ডবলীলা চালিয়ে অবশেষে বন্যা যেতে শুরু করেছে। বন্যা আমাদের দেশে প্রতিবছরই হয়। উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবরুদ্ধ বাংলাদেশে ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক কারণেই প্রতিবছর বন্যা হয়ে থাকে। এবছরও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। তবে এবার বন্যা এসেছে সর্বগ্রাসী ধ্বংস ও দীর্ঘস্থায়ী দুর্গতি নিয়ে। শতাব্দীর ইতিহাসে এত দীর্ঘস্থায়ী বন্যা আর কখনও হয়নি। কেন এ দীর্ঘস্থায়ী বন্যা তা নিয়ে যে যার অবস্থান থেকে বিচারবিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। কেউ কেউ হয়তো রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি কিংবা অন্য কোন স্বার্থ হাসিলেরও প্রয়াস পেয়েছে। তবে বোধ করি বেশির ভাগ মানুষই পরিবেশের মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয়কেও এবারের বন্যার অন্যতম কারণ বলে মনে করছেন।

পরিবেশ বিনষ্ট করার বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে আওয়াজ উঠেছে। আমাদের দেশও তার বাইরে নয়। পরিবেশ নষ্ট করার ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে। এর ফলে এ অঞ্চলে হিমালয়ের বরফ গলে বিপুল জলরাশির নিচের দিকে নেমে আসার আশংকা করা হয়েছে। উল্টোদিকে দক্ষিণে সমুদ্রস্তরের স্ফীতির কারণে উপকূলীয় অঞ্চল তলিয়ে যাবার আশংকাও করা হয়েছে। এবারের বন্যার অন্যতম একটি কারণ একদিকে যেমন হিমালয়ে উৎসারিত নদীসমূহ বিশেষ করে ব্রহ্মপুত্রের থেকে বিপুল জলরাশি নেমে এসেছে, অপরদিকে সেই পানিকে সাগরতো ধারণ করেইনি বরং সাগর নিজেই ফুলে ফেঁপে জলস্তরকে উপরের দিকে ঠেলে ধরে রেখেছিল। ফলে বন্যার জলে আড়াইমাস ধরে ভেসেছে দেশের দু'কোটির ওপর মানুষ।

বন্যাকে কেন্দ্র করে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ এবার পরিচালনা করা হয়েছে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে, বিপুল উদ্যমে। কিন্তু যেভাবে ত্রাণ ও পুর্নবাসন কাজ করা হলো এবং আরো দু'এক মাস চলবে সে সময়টাতে পরিবেশের পতনের বিরুদ্ধে যদি দু'চারটে করে কথা মানুষজনকে বলা যেতো তাহলে তা অনেকটাই বোধহয়



www.pathagar.com

কাজে আসতো। দুঃখের দিনে, কষ্টের দিনে মানুষের মন আরো নরম হয়ে যায়, যখন তার দিকে কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। এই মোক্ষম সময়টাতেই যদি জনসাধারণকে পরিবেশের উন্নতির কথা বলা যেতো তাহলে বোধহয় খুব একটা খারাপ হতো না। ইংরেজিতে একটা কথা আছে Hit the nail on the had অর্থাৎ 'মোক্ষম কাজটি মোক্ষম সময়ে করা বা মোক্ষম কথাটি বলা'।

এ প্রেক্ষাপটে আমি পরিবেশ পতনের অনেকগুলো নয়, একটি মাত্র দিকে আলোকপাত করতে চাই। ঢাকা নগরীর আরামবাগ, ফকিরাপুল, শান্তিনগর প্রভৃতি এলাকায় যারা বসবাস করেন, প্রতিবছরই ভারী বর্ষনের দিনগুলোতে তাদের আট দশবার করে হাটুর ওপর কাপড় তুলে বাড়িঘরে, দোকানপাটে, অফিসে যাতায়াত করতে হয়। ভারী কেন মাঝারি বর্ষন হলেই এসব এলাকায় হাটু ছাপিয়ে কোমর পর্যন্ত পানি ওঠে। যারা এই পানি ভেঙ্গে দু'একবার যাতায়াত করেছেন তাদের কারো শরীরে মলমূত্রের নোংরা লাগেনি এমন কোন রেকর্ড বোধহয় নেই। এ ছাড়া তাদের হাজারে বিজারে পলিথিনের টুকরা এড়িয়ে পথ চলতে হয়। একটু পানি হলেই এত পলিথিন কোথা থেকে আসে? আসলে প্রতিদিন আমাদের ব্যবহার্য অসংখ্য পলিথিন কাজ শেষে আমরা রাস্তাঘাটে, ড্রেনে নিক্ষেপ করে থাকি। নীতি নিয়ে যেহেতু আমাদের বালাই নেই অতএব যত্রতত্র আমরা অনেক কিছুই ছুঁড়ে থাকি। পলিথিনগুলো মূলত ড্রেনেই বেশি জড়ো হয়ে থাকে। ময়লা পানি নিষ্কাশনের প্রবাহপথকে এগুলো করে রাখে রুদ্ধ। এছাড়া মাটির স্তরে স্তরে এগুলো জমা হচ্ছে বছরের পর বছর ধরে।

পলিথিন যে আমাদের কতখানি সর্বনাশ করছে তা আমরা এখনই ততোটা বুঝতে পারবো না। কিন্তু দশ বিশ বছর পর যখন একটা মহাবিপর্যয়ের সম্মুখীন আমরা হবো তখন তার উৎসমুখ খুজতে আমরা পিছন ফিরে তাকাবো। বিগত সরকারের আমলে একটি পরিবেশ সংরক্ষণবাদী সংগঠন পলিথিনের ব্যবহারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। তখন সরকার প্রথমদিকে পলিথিন উৎপাদন বন্ধের ঘোষণা করে। কিন্তু পলিথিন উৎপাদনকারী ছোট ছোট কলকারখানা বন্ধ করে দিয়ে সেগুলোর শ্রমিকদের হঠাৎ করে বেকার না হতে হয় এজন্যে সরকার সেগুলোর উৎপাদন ছয় মাসের জন্য চালিয়ে যাবার নির্দেশ প্রদান করে। তখন ওই পরিবেশবাদী সংগঠন থেকে এরকম সুপরিশও এসেছিল যে এই ছয়মাসের মধ্যে ওইসব পলিথিন উৎপাদনকারী কলকারখানাগুলোকে 'Evironment-fiendly' দ্রব্য উৎপাদনের কারখানায় পরিণত করা যাবে। কিন্তু সেই ছয়মাস পরে যতদূর শুনেছিলাম রাজনৈতিক কারণে পলিথিনের উৎপাদন বন্ধতো হয়ইনি বরং তার আরো বিকাশ ঘটেছে বহুগুণ। পরিবেশ বিপন্ন করে এমন কোন কিছুকে রুখতে তাই সব রাজনৈতিক দলের যৌথ অঙ্গীকার থাকা চাই।



www.pathagar.com

এবারের বন্যা শুরুর পর সরকারি বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবি সংগঠন সংস্থা ও দফতর থেকে যখন ব্যাপক ত্রাণ সরবরাহ শুরু হলো তখন থেকে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত টিভিতে পলিথিনের ব্যবহার যতই দেখছি ততই শিউরে উঠছি। প্রতিদিন লাখ লাখ পলিথিনের ব্যাগে ত্রাণ দেয়া হচ্ছে। যাদের হাতে যাচ্ছে এইসব পলিথিনের ব্যাগ তাদের সংখ্যা প্রায় তিন কোটি। বানভাসি মানুষ সেইসব পলিথিন ব্যবহার করে একসময় তা পানিতে নিক্ষেপ করছে, বন্যার পানি যখন শুকিয়ে যাবে তখন এইসব লাখ লাখ কোটি কোটি পলিথিন জমির মাটির স্তরে স্তরে লুকিয়ে যাবে। রাস্তাঘাট, ড্রেন প্রভৃতি করে তুলবে অবরুদ্ধ। এর দীর্ঘমেয়াদী প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে দু'এক দশক পর।

বন্যার কারণ নিয়ে পত্রপত্রিকা বিশেষ করে টিভিতে বিশেষজ্ঞরা এল-নিনো, লা-নিনা, সুনামী প্রভৃতি নিয়ে প্রচুর কথা বলছেন। এগুলো শুনে শুনে মানুষ এক কল্পলোকে ভাসছে। আবার সেইসব আলোচনার কোন কোনটা এত জটিল ও উচ্চমার্গের যে সাধারণ স্রোতাদর্শকের কানে ও মগজে তার কিছুই ঢুকছে না। কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা বলছেন না যে এল-নিনো, লা-নিনা যতই আসুক-আমাদের নদীগুলো যদি ড্রেজিং করে নাব্যতা ঠিক রাখা না হয়, রাস্তাঘাট ও বাড়িঘরগুলো যদি পরিকল্পিত না হয়, সর্বত্র পানির প্রবাহ যদি সমতানে না চলে, পলিথিনের ব্যবহার যদি বন্ধ না হয়, বৃক্ষ নিধন যদি বন্ধ না হয় তাহলে বন্যার সামান্যতম কিংবা ভয়াবহ প্রকোপকে আমরা কিছুতেই রুখতে পারবো না।

পলিথিন ব্যাগে করে প্রতিদিন রুটি, চিড়া, গুড়, চাল, ডাল, মাছ, খিচুড়ি কতরকমের ত্রাণ সাহায্য দেয়া হচ্ছে বন্যাদুর্গতদের। কিন্তু এর বিরূপ আচরণ সম্পর্কে কেউ কিছু বলছে না। ত্রাণকাজের একটা বিরাট অংশের দায়িত্ব পালন করছে সরকার ও তার দফতরসমূহ এবং সরকারি দল ও তার অঙ্গসংগঠনসমূহ। তারা যদি ত্রাণকাজে পলিথিনের বদলে কাগজ বা চটের ব্যাগের ব্যবহার করতেন তাহলে এবারই তার প্রচলন শুরু করার একটা মোক্ষম সময় ছিল। ত্রাণকাজের দৃশ্যগুলো দেখানো হচ্ছে কিন্তু পলিথিনের বদলে কাগজ বা চটের ব্যাগে ত্রাণ দেবার দৃশ্য দেখলে হয়তো সাধারণ মানুষ তা ব্যবহারে কিঞ্চিত আগ্রহী হলেও হতে পারতো। যারা ব্যাপক ত্রাণ বিতরণ করছেন তাদের প্রত্যহ হাজার হাজার পলিথিন ব্যাগের প্রয়োজন হচ্ছে। তারা ত্রাণকাজে সহায়তা করার লক্ষ্যে উৎপাদকদের চট বা কাগজের ব্যাগ সরবরাহের আহ্বান জানাতে পারতেন, একবার কেউ এটা চালু করলে তা ব্যবহারের Culture শুরু হলেও হতে পারতো। দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতার অন্যতম একটি কারণ যে পলিথিন- অন্তত ঢাকা শহরে—সে সম্পর্কে টিভিতে প্রোগ্রাম হতে পারতো। যোগাযোগের পণ্ডিত উইলবার শ্র্যামের কথা এখানে প্রযোজ্য : The mass media can focus attention।

সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এটা জানার পরেও ধূমপায়ীরা সিগারেট খাচ্ছেই। তার মানে এই নয় যে তারা কোনদিন ধূমপান ছেড়ে দেবে না। সিগারেট



www.pathagar.com

কোম্পানীগুলো সিগারেটের প্যাকেটে সংবিধিবদ্ধ সতর্কতা হিসেবে উল্লেখ করে থাকে যে ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এটা একটা Motivational কথা। অনেক ধূমপায়ীই হয়তো এই কথাগুলো বারবার পড়তে পড়তে একসময় ধূমপান ছেড়ে দিয়েছেন। ঠিক একইভাবে এখনই পলিথিনের ব্যাগের বদলে কাগজ বা চটের ব্যাগ ব্যবহারের ব্যবস্থা করতে না পারলে পলিথিনের ব্যাগেই যদি সিগারেটের অনুরূপ Motivational কথা বলা যেতো যে 'পলিথিনের ব্যবহার পরিবেশের জন্য বিপর্যয়কর' অথবা 'পলিথিন বন্যা নিয়ে আসে' কিংবা 'জলাবদ্ধতার অন্যতম কারণ পলিথিন' তাহলে মানুষ তা পড়তে পড়তেই হয়তো তার ব্যবহার একদিন ছেড়ে দিতো। উইলবার শ্র্যাম আরেকটি কথা বলেছেন : The mass media can feed the interpersonal channels. মুদ্রণ ও ইলেকট্রনিক মাধ্যম বিশেষ করে টিভিতে যদি এবার বন্যার সময়ে পলিথিনের বিরূপ ও মন্দ আচরণ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা হতো এবং তার পাশাপাশি ত্রাণ দেয়ার সময় যদি জনগণকে সে সম্পর্কে অল্পবিস্তর জানিয়ে দেয়া যেতো তাহলে তা সাধারণ জনগণের আলোচনার খোরাক হতো। কৃষক তার জমি চাষ করতে গিয়ে অসংখ্য পলিথিনের টুকরো বাছাই করতে গিয়ে হয়তো বিরক্ত হবে কিন্তু এর ভয়াবহ প্রভাব সম্পর্কে কিছুই জানেনা। অর্থাৎ এ সম্পর্কে তার কোন জ্ঞানই নেই। যদিও শহরের মতো গ্রামেগঞ্জেও পলিথিন পৌছে গেছে। ওই কৃষকটি হয়তো কিছু জানে না কিন্তু শহরের শিক্ষিতজন তারা তো এসম্পর্কে খুব ভালো জানে। কিন্তু জেনেও তারা এর ব্যবহার থেকে বিরত নয়। অর্থাৎ পলিথিনের ভয়াবহ প্রভাব সম্পর্কে একটা বিরাট জনগোষ্ঠী যেমন জানে কিন্তু এর ব্যবহার বন্ধের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এখনও অনুকূল নয়। আর অপর একটি জনগোষ্ঠী এসম্পর্কে কিছুই জানে না। আর সেজন্যেই গণমাধ্যমে এ সম্পর্কে জনসাধারণের মনোযোগ দারুণভাবে আকৃষ্ট করে আন্তর্ব্যক্তিক পর্যায়ে প্রণোদনামূলক কথা বলে পলিথিনের ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে তোলা যেতে পারতো। দেশের জনগোষ্ঠীর প্রায় ৫০ শতাংশ এখন সাক্ষর। তবে এদের সবই সচেতন এমন নয়। আবার বাকি ৫০ শতাংশ নিরক্ষর হলেও তাদের সবাই অসচেতন তাও নয়। যে অশিক্ষিত ও নিরক্ষর কৃষক মাটি ও আকাশ দেখে জমি চষে, বীজ রোপন করে সে অবশ্যই সচেতন। আর তাই আমরা যদি পলিথিনের বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে সাধারণ মানুষজনকে প্রচুর তথ্য দিতে পারি তাহলে তারা অবশ্যই এ সম্পর্কে সচেতন হবে এবং একদিন পলিথিনের ব্যাগ পরিত্যাগ করে চটের ব্যাগ হাতে নিয়ে বাজারে যাবে।

*সূত্র : দৈনিক ভোরের কাগজের সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত]*



www.pathagar.com

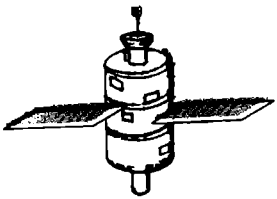

# সংবাদপত্র ও বিজ্ঞাপন : একের কী অপরের?

সংবাদপত্রের সার্কুলেশন সম্পর্কে এ বিষয়ের একজন বিশেষজ্ঞ Herbart Lee Williams বলেছেন, 'Circulation—the number of copies sold and paid for—is the foundation of a newspapers success.' পত্রিকার যত বেশি প্রচারসংখ্যা, ততবেশি এর সাফল্যের পরিচায়ক। তবে এটাও সত্য পত্রিকার কপিগুলো বিক্রি করে প্রতিদিনের পত্রিকা প্রোডাকশনের যে খরচ তার অর্ধেকটাও উঠে আসেনা। তাহলে পত্রিকা চলে কী করে? এটা অনুমিত যে, একটি পত্রিকার মূল আয়ের (রাজস্ব) তিনচতুর্থাংশ আসে বিজ্ঞাপন থেকে। পত্রিকার মূল আয় বিজ্ঞাপন থেকে যদি হয় মোট আয়ের অর্ধেকেরও কম তাহলে সে পত্রিকার অবস্থা নুন আনতে পান্তা ফুরোনোর মতো। দুর্ভাগ্য হলেও সত্য বাংলাদেশের বেশিরভাগ পত্রিকার অবস্থাই তাই। মূলত তারা বেঁচে আছে সরকারি বিজ্ঞাপনের আয় থেকে। উল্টোদিকে বড় পত্রিকাগুলোর আকর্ষণ বেসরকারি বিজ্ঞাপকদের কাছেই। তারাই এখন বড় পত্রিকার বিশাল রাজস্ব জুগিয়ে সংশ্লিষ্ট পত্রিকাগুলোর নীতির চৌহদ্দীতে পা ফেলেছে। সংবাদপত্রের ওপর সরকারের একসময়ের নিয়ন্ত্রণ এখন সঙ্গতই কর্পোরেটদের হাতের মুঠোয়। যেহেতু বিজ্ঞাপন থেকে প্রাপ্ত আয় হচ্ছে পত্রিকার মূল আয়ের সিংহভাগ, অতএব বিজ্ঞাপনকে পত্রিকার প্রধান সঞ্জীবনী বলা যেতে পারে। কিন্তু তাত্ত্বিক ভিত্তিটা হচ্ছে, It is not Ad, rather circulation is the life-blood of newspaper. অর্থাৎ বেশি বিজ্ঞাপন মানে বেশি রাজস্ব বটে তবে প্রচারসংখ্যাই হচ্ছে একটি পত্রিকার সাফল্যের পরিচায়ক। কারণ 'মার্কেটিং' শাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিজ্ঞাপনদাতারা তাদের দ্রব্য, সেবা কিংবা গুডউইলের বার্তা সর্বোচ্চ সংখ্যক পাঠকের (Readership) কাছে পৌছাতে চায় যাতে তারা আনুপাতিক হারে সর্বোচ্চ সংখ্যক ক্রেতার কাছে তাদের দ্রব্য বা সেবা বিক্রি করতে পারেন।

এ প্রেক্ষাপটে কি বলা যায় একটি সংবাদপত্র বেঁচে থাকে বিজ্ঞাপনের ওপর আর সংবাদপত্র (টিভিরেডিও হচ্ছে এ ক্ষেত্রে একটি পৃথক ইস্যু) ছাড়া বিজ্ঞাপন প্রচারের বাহন নেই? তার মানে সংবাদপত্রের সঙ্গে বিজ্ঞাপনের এবং বিজ্ঞাপনের সঙ্গে



www.pathagar.com

সংবাদপত্রের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। বিজ্ঞাপন ছাড়া একটি সংবাদপত্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। আবার গণমাধ্যম হিসেবে সংবাদপত্র জনগণের খুব কাছাকাছি যেতে পারে বিধায় তারা আজকের বিজ্ঞাপনী সমাজে (Advertising and synthetic society) পণ্য ও সেবার সরবরাহে বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রের একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ হিসেবে দাড়িয়ে গেছে।

সংবাদপত্রের সার্কুলেশন বা প্রচারসংখ্যা বাড়ানোর জন্য যেমন ভালো সংবাদ ও সংবাদভাষ্য এবং তার চমৎকার উপস্থাপন দরকার তেমনি তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতির সর্বাধুনিক সাজসরমজাম, তথ্য সাজানোর কৌশলী মানবসম্পদের সহজলভ্যতার জন্য সুদৃঢ় আর্থিক সংগতিও খুব জরুরী; আর সেজন্যেই অধিক হারে বিজ্ঞাপন ও আর্থিক সমর্থন প্রয়োজন। আর প্রচারসংখ্যা বা পত্রিকার উৎপাদন মানে অধিক হারে ভোক্তাকে যদি আকষ্ট না করা যায় তাহলে বিজ্ঞাপনদাতারা তাদের বিজ্ঞাপন নিয়ে এগিয়ে আসবে না। অতএব অধিক চাহিদা মানেই অধিক উৎপাদন আর অধিক উৎপাদন মানেই বেশি হারে ভোগ ও বিক্রি।

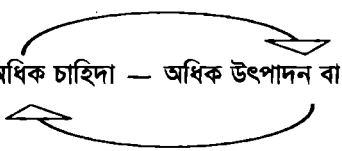


এটি একটি চক্রাকার (Circular) প্রক্রিয়া

সংবাদপত্র বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভরশীল এবং সংবাদপত্রের একটি টেকসই (Sustainable) প্রচারসংখ্যা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পর সংশ্লিষ্ট পত্রিকাগুলোর পাঠকের কাঙ্খিত সেবা মাঝে মাঝে ভুলে গিয়ে বেশি বেশি করে বিজ্ঞাপনের ওপর ঝুঁকে পড়ে। আর তাই যত খুশি সংখ্যক বিজ্ঞাপন দেয়া যায়না, কারণ সংবাদপত্র হচ্ছে প্রথমত সংবাদের পত্র, পরে বিজ্ঞাপনের। অধিক উৎপাদনেরও একটি চূড়ান্ত মাত্রা (Optimum limit) থাকে। বিজ্ঞাপনকে জায়গা করে দেয়ার জন্য সংবাদপত্রেরও একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত ক্ষমতা আছে। এর বাইরে বিজ্ঞাপন দেয়া বা প্রচার করা নীতিগতভাবেই উচিত নয়। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের সুবিধা সম্পর্কে এ বিষয়ে আরেকজন বিশেষজ্ঞ থমাস এফ বার্ণহার্ট (Thomas F. Barnhart) কতগুলো দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। আমরা সেগুলো বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি।

এক. সংবাদপত্র পাঠ মানুষের একটি চিরন্তণ অভ্যাস। তথ্য প্রযুক্তির তোড়জোড়ের মধ্যেও সংবাদপত্র আরো দুয়েক শতাব্দী টিকে থাকবে। অন্তত এ গ্রহের দক্ষিণ গোলার্ধে। অতএব সংবাদপত্র পড়ার পাশাপাশি মানুষ বিজ্ঞাপনের বার্তাও পড়বে। সংবাদপত্র বেঁচে থাকলে একে অপরের গুরুত্ব কমে যাবে না।



www.pathagar.com

দুই. বিজ্ঞাপনী সমাজের বাসিন্দা হওয়ায় সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন প্রায় সব পাঠকই পড়ে থাকেন। রেডিও টিভির মতো এখানে সময়ের ব্যাপার নেই। সংবাদপত্র সহজে সংরক্ষণ করা যায়। এখানে বারবার পড়ার সুযোগ রয়েছে। সময় বুঝে পড়ার সুযোগ রয়েছে, ফলে সংবাদপত্রের এ সুবিধাটা পণ্য ও সেবা সরবরাহকারীদের বিজ্ঞাপকরা সহজে কাজে লাগাতে পারেন।

তিনি. সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন একটি পূর্ণাঙ্গ পত্রিকার অপরিহার্য অংশ হিসেবে সব বাড়িতে একজন অতিথির মতো অভ্যর্থনা পায়। সংবাদপত্রের মতো বিজ্ঞাপনও প্রতিদিনই নতুনত্ব ও বৈপরীত্য নিয়ে পাঠকের কাজে হাজির হতে পারে। সংবাদপত্রের এই প্রেক্ষাপটে নতুনত্ব ও বৈপরীত্যের কারণেই পাঠকের আগ্রহ বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রেও কমেনা।

চার. সংবাদপত্রের বৈচিত্র্যের কারণে সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন সংবাদ বিবরণীগুলোর মতোই স্থানীয় সংবাদমূল্য বেশি থাকে এবং সংবাদপত্রের পরিমণ্ডলের বাসিন্দাদের জীবনাচরণ, অভ্যাস, দৃষ্টিভঙ্গি বা আচরণের কথা তুলে ধরে; এর ফলে বিজ্ঞাপনগুলো স্থানীয় মানুষজন বা পাঠকের সমাদর পায়। সঙ্গতই তারা পাঠকের আগ্রহকে ধরে রাখে।

পাঁচ. সংবাদপত্রে প্রকাশযোগ্য বিজ্ঞাপনের বিষয় (Text)-এর পরিমাণ নির্ভর করে সংবাদপত্রে লভ্য জায়গার (Space) ওপর। সময় ও মূল্যের কারণে রেডিওটিভির তুলনায় সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনে কোন পণ্য বা সেবার বিজ্ঞাপক অনেক বেশি কথা বলার সুযোগ পান। তবে কতটুকু কথা (Text) বলা যাবে তার একটি নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে। জায়গা ও অর্থের সাশ্রয় যেমন জরুরী তেমনি পাঠকের আগ্রহের ধৈর্য্যচূতি না ঘটানোও একটি জরুরী বিষয়।

ছয়. সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনে পণ্য বা সেবার প্রস্তুতকারক ও ব্যবসায়ীগণ পণ্য সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে পারেন। পণ্যের ব্যবহারবিধি কিংবা সেবা গ্রহণের ধরন ধারণগুলো সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দিতে পারেন।

সাত. সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন অবশ্যই নমনীয় হবে। কোন দ্রব্যের বিক্রি, বন্টন কিংবা পরিবর্তনশীল ও বিচিত্র ধরনের বাজার পরিস্থিতির কারণে সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের ভাষা ও উপস্থাপনের পরিবর্তন হতে পারে। কোন দ্রব্য সম্পর্কে বিজ্ঞাপনে প্রচারিত টেক্সট্ কিংবা বিবরণী কিংবা স্টাইল প্রভৃতি পরিবর্তিত একটি পরিস্থিতিতে পরিবর্তন, পরিমার্জনের ফলে ওই পণ্যটির চাহিদা দারুণভাবে বেড়ে যেতে পারে। অর্থাৎ প্রয়োজন অনুসারে সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনকে পরিবর্তন করা যায়। সেই মোতাবেক বিজ্ঞাপনের ভাষার ক্ষেত্রে নমনীয়তা (Flexibility) বজায় রাখতে হয়।

আট. রেডিওটিভির বিজ্ঞাপনের তুলনায় সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনকে খুব দ্রুত নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একে সহজ, সংক্ষিপ্ত ও দৃঢ়তার সঙ্গে উপস্থাপন



www.pathagar.com

করা যায়। প্রয়োজনে পরিবর্তন, পরিমার্জন করা যায়। ফলে পণ্যদ্রব্যের ভোক্তারা দ্রব্যের সর্বশেষ পরিস্থিতি (Latest development) সম্পর্কে জানতে পারে। এটা তাদের পয়সা বাঁচাতে সাহায্য করে এবং এ প্রক্রিয়ায় তারা তাদের কাম্য সেবা পায়।

নয়. বিভিন্ন প্রেক্ষাপট, পরিস্থিতি বা শর্তের সঙ্গে সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের সমন্বয় (adjustment) করা হয়। কপির আবেদন, অঙ্গসজ্জা অথবা ডিসপ্লে স্থানীয় বাজার পরিস্থিতি, বাজারে তার গ্রহণযোগ্যতা এবং আবহাওয়ার (মওশুম) পরিবর্তন প্রভৃতির সঙ্গে তাল রেখে করা হয়। একটি দ্রব্যে গ্রীষ্মকালের উপযোগী একটি কথা থাকলে সেই অংশটুকু বাদ দিয়ে শীতকাল উপযোগী অন্য কথা সংযোজন করা যায়।

দশ. সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনদাতারা (পণ্য নির্মাতারা) ও ডিলারগণ তাদের দ্রব্যাদি ক্রেতারা কোথায় কিনতে পারবেন সেই তথ্য সম্পর্কে অবহিত করেন। দ্রব্যটি কেনার জায়গাটি সম্পর্কে বলে দিয়ে ক্রেতার সময়, যাতায়াতের খরচ ও শ্রম লাঘব করা যায়।

এগারো. টিভি মাধ্যমের তুলনায় সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন কম ব্যয়সাপেক্ষ। বিজ্ঞাপনের উদ্যোক্তারা বুঝতে পারেন যে অন্য কোন ধরনের বিজ্ঞাপনের তুলনায় সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন কম পয়সায় অধিক সংখ্যক পরিবার বা লোকজনের কাছে যেতে পারে। ফলে যে সকল দ্রব্যাদি বাজারে বেশ চলে সেই সকল দ্রব্যাদির বিজ্ঞাপনদাতারা সংবাদপত্রকে তাদের বার্তা সরবরাহের আদর্শ মাধ্যম বলে মনে করে।

বারো. সংবাদপত্রে দেয়া বিজ্ঞাপন থেকে প্রাপ্ত ফলাফলকে খুব দ্রুত ঝালিয়ে নেয়া যায়। দ্রুত মূল্যায়ন করার সুযোগ আছে এখানে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পণ্যের প্রভাব জনগণের ওপর খুব দ্রুত পড়ে। বিভিন্ন ধরনের নমুনায়ন পদ্ধতির মাধ্যমে এই প্রভাবকে যাচাই করা যেতে পারে। পণ্য সম্পর্কে ভোক্তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও মনোভঙ্গির জরীপ করা যায়। বাজার নিয়ে গবেষণা করা যায়। প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে নতুন পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিজ্ঞাপন লেখা ও উপস্থাপন করা যেতে পারে।

তেরো. সংবাদপত্রের সার্কুলেশন মোটামুটি জানাই থাকে। পাঠকের সংখ্যাও হঠাৎ করে খুব বাড়ে কমেনা, বড় কোন ইস্যু ছাড়া। দৈনন্দিন যে পরিবর্তন তার ছোঁয়া তুলনামূলকভাবে খুব কমই লাগে সার্কুলেশনের গায়ে। গ্রাহক, ভোক্তা, পাঠকের (Readrship) চাহিদা অনুযায়ী বোঝা যায় কী পরিমাণ লোকজন পত্রিকা পড়ছে। এর প্রেক্ষাপটে বিজ্ঞাপনের সামগ্রিক দিক খেয়াল রাখা যায়।

চৌদ্দ. সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন পণ্যসামগ্রীর পরিচিতি দান করে। উন্নত মান ও বাণিজ্যিক সব প্রক্রিয়া ও প্রকরণ সম্পর্কে প্রতিটি সম্ভাব্য ভোক্তাকে সেবা



www.pathagar.com

সরবরাহ করে থাকে। বিজ্ঞাপন বাজারে দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়মূল্য যথাযথ রাখার ক্ষেত্র তৈরি করে। বিজ্ঞাপন কোন পণ্য দ্রব্য সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাস, আস্থা ও সুনাম সৃষ্টি করে।

**যে সকল বিজ্ঞাপন পত্রিকায় নিষিদ্ধ :**

প্রতিটি পত্রিকারই নিজস্ব কতগুলো নিয়মকানুন থাকে বিজ্ঞাপন ছাপানোর ব্যাপারে। পত্রিকার সম্পাদকীয় ও বিজ্ঞাপনী নীতিমালার প্রতি খেয়াল রেখেই বিজ্ঞাপনদাতারা বিজ্ঞাপন প্রকাশ ও প্রচার করে। বিজ্ঞাপনী বার্তার ভাষা এমন যদি হয় যে তা পত্রিকার সম্পাদকীয় নীতির সঙ্গে মিলে না তাহলে সেই পত্রিকা ওই বিজ্ঞাপন গ্রহণ করবেনা। বিজ্ঞাপন শুধু পণ্য ও সেবা কেনা বেচা নয়, এখানে শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটে; সমাজের মূল্যবোধকে সম্মান দেখানোর আভাস থাকে। জনগণকে উত্তম পণ্য ও সেবা দেবার প্রতিশ্রুতি সবকিছু মিলিয়েই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়ে থাকে। বিজ্ঞাপন মিথ্যার বেসাতি করার শিল্প নয়, কারণ বিজ্ঞাপন সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যুক্তরাষ্ট্রের এলিট সংবাদপত্র The New York Times পত্রিকার বিজ্ঞাপন প্রকাশের ক্ষেত্রে Index Prohibitorium নামে একটি নীতিমালা তৈরি করে নিয়েছিল। সেই নীতিসমূহ হচ্ছে :

১. সংবাদপত্রে কোন সন্দেহজনক বা প্রচলিত অর্থে ভূয়া বিজ্ঞাপন দেয়া যাবে না। বিজ্ঞাপন সদা সত্যনির্ভর। বিজ্ঞাপনের নামে মিথ্যা, ভ্রান্তি বা সংশয়ের বেড়াজালে আবদ্ধ করার কোন সুযোগ নেই। এটি নীতিবিরুদ্ধ।

২. কোন জিনিসের হয়তো স্পষ্টত কোন মূল্য নেই, অথচ সেই জিনিসটাকে মূল্যবান প্রতীয়মান করে বাজারে বিজ্ঞাপন ছাড়া একটি অনৈতিক ও অপরাধমূলক কাজ। এটি শাস্তির দাবি রাখে। যদিও ক্রয়ের আকাঙ্খা তৈরি করা বিজ্ঞাপনের কাজ তবু মূল্যহীন ও অনোপযোগী জিনিসকে উপযোগী ও মূল্যবান করে তোলা অনৈতিক।

৩. যে সমস্ত বিজ্ঞাপন মিথ্যা কথা বলে কিংবা পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে কোন গ্যারান্টি নেই কিংবা সে সম্পর্কে অতিরঞ্জিত দাবি করা হয় তা নীতিগতভাবে নিষিদ্ধ।

৪. বিজ্ঞাপনে এমন কোন শব্দ ব্যবহার করা যাবে না যাতে করে ভোক্তাসাধারণ বিভ্রান্ত হতে পারে। বিজ্ঞাপনের ভাষা স্পষ্ট হবে। অনাহুত শব্দ প্রয়োগে সামাজিক সমস্যাও তৈরি হতে পারে।

৫. ব্যক্তি চরিত্রের ওপর আক্রমণ করে কোন বিজ্ঞাপন দেয়া যাবে না। ইচ্ছা প্রণোদিতভাবে কোন ব্যক্তির বা ব্যক্তিবর্গের মর্যাদাহানিকর বক্তব্য বিজ্ঞাপনে লেখা বা উপস্থাপন করা যাবে না।

৬. কোন বিজ্ঞাপনে বিরাট অংকের ডিভিডেন্ড-এর নিশ্চয়তা দেয়া হলো কিংবা ব্যাপক (অযৌক্তিক) মুনাফার সম্ভাবনার কথা বলা হলো তা নিষিদ্ধ। আমাদের রিয়াল এস্টেটের ব্যবসার সঙ্গে কেউ কেউ অনৈতিক মুনাফার কথা বলে থাকে।



www.pathagar.com

৭. কোন অনাকাঙ্খিত বা অপরিচিত অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানের (Financial farm) মাধ্যমে সহযোগিতার প্রস্তাব দেয়া যাবে না। এরকম করে অনেক প্রতিষ্ঠানই প্রতারণা করেছে।

৮. যে সকল বিজ্ঞাপনের বার্তা কিংবা ডিসপ্লে শোভন নয় অশ্লীল, অসভ্যতায় পূর্ণ কিংবা তার বক্তব্য ও উপস্থাপনায় অপরাধমূলক ঢং রয়েছে তা প্রকাশ করা যাবে না।

৯. বিজ্ঞাপন এমন হবে না যে তা বিয়ে সংক্রান্ত বা ভাগ্য সংক্রান্ত প্রস্তাব হয়ে যায়। এমন বিজ্ঞাপন দেয়া হলো যা কোন ব্যক্তির প্রতি বা ভোক্তাদের প্রতি বিয়ের প্রস্তাব মনে হতে পারে। নতুন করে ভাগ্যগঠনের প্রস্তাবও হতে পারে। এধরনের বিজ্ঞাপন পাশ্চাত্যে বেশি হয় তবে তার আঁচ বাংলাদেশেও লেগেছে।

১০. চিকিৎসাসেবা সংক্রান্ত কিছু বিষয় যা চিকিৎসক সমাজ থেকে অপ্রকাশযোগ্য তা বিজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করা যাবে না। বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা দেবার প্রস্তাবও দেয়া যাবে না। কোন বিজ্ঞাপনে কোন অসুস্থ থেকে পুরোপুরি সারিয়ে তোলার দাবি করা যাবে না। তথ্যনির্ভরতা ও সাধারণ অভিজ্ঞতার বদলে যুক্তিহীনভাবে প্রত্যক্ষ কিংবা অনুমানের ওপর ভিত্তি করে কাউকে সুস্থ করে দেবার গ্যারান্টিযুক্ত চিকিৎসা সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন দেয়া যাবে না। সব তেলের বিজ্ঞাপনে বলা হয় যে চুলপড়া ও পাকা বন্ধ হবে। চব্বিশ ঘন্টায় টাকে চুল গজিয়ে যাবে। কিন্তু তা করা যাবে না।

১১. মানুষকে নেশাগ্রস্ত করে তোলে কিংবা তাদের মধ্যে ক্ষতিকর অভ্যেস গড়ে তোলে এমন কোন বিজ্ঞাপন দেয়া যাবে না। গাজা, ভাং, চরস কিংবা বিদেশি কোন চটকদার নামের আড়ালে কোন মাদকজাতীয় দ্রব্যের বিজ্ঞাপন দেয়া যাবে না সেগুলির লাইসেন্স থাকলেও। এ ধরনের কাজ বিজ্ঞাপনী নীতির পরিপন্থী। ঘুমের ঔষধের বিজ্ঞাপনও একটা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত দেয়া যেতে পারে। মানুষের স্নায়ুতন্ত্রকে অবশ ও বিবশ করে ফেলে এরকম কোন বিজ্ঞাপনকে প্রয়োজনে খুবই কমমাত্রায় দিতে হবে অথবা সেগুলোকে অনেকবেশি আবেদনধর্মী করা যাবে না যাতে তার অতি ব্যবহারের ফলে তা মানুষের বাজে নেশা বা অভ্যাসে পরিণত হয়।

১২. অর্থনাশের কারণ ঘটে, স্বাস্থ্যের হানি হয় কিংবা কারো মনোবল ভেঙ্গে পড়ে অথবা কোন সম্মানজনক ব্যবসা ও সুনাম ক্ষতিগ্রস্ত করে এ ধরনের বিজ্ঞাপন দেয়া যাবে না। যে বিজ্ঞাপন মানুষের কাছে মূল্যহীন বলে প্রতীয়মান হয় সেগুলোরও বিজ্ঞাপন দেয়া যাবে না।

## বেটার বিজনেস ব্যুরোর নীতিবিষয়ক পরামর্শ :

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব বেটার বিজ্‌নেস ব্যুরো নামের একটি সংগঠন বহু বছর আগে বিজ্ঞাপন প্রকাশের ক্ষেত্রে তাদের কিছু নীতিমালা সন্নিবেশ করেছিল। তারা Fair Trade Code নামের শিরোনামে বিজ্ঞাপন প্রকাশের ক্ষেত্রে কতগুলো বিধিনিষেধের কথা লিপিবদ্ধ করেছিল যা সংশ্লিষ্টদের জন্য অনুসরণযোগ্য।



www.pathagar.com

১. জনগণকে বা ভোক্তাকে যা সরবরাহ করা হচ্ছে তা যেন সততাপূর্ণ ও সৎমূল্যবোধসঞ্জাত হয়। যে দ্রব্য বা সেবা সম্পর্কে প্রস্তাব রাখা হয়েছে তা অবশ্যই সত্য হতে হবে।

২. সত্যি কথাটাকে দৃপ্তভঙ্গিতে বলতে হবে যাতে করে সেই কথাটার তাৎপর্যকে সবাই বিশ্বাসের সঙ্গে বুঝতে পারে।

৩. ভোক্তাদের জানাতে হবে তারা কী জানতে চায়। যে জিনিস সম্পর্কে বিজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে সে সম্পর্কে আরো কিছু খুঁটিনাটি জানার অধিকার ভোক্তাদের রয়েছে। ফলে তারা কোন জিনিস বিচারবিবেচনা করে কিনতে পারে এবং এর মধ্য দিয়ে তাদের সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে।

৪. প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ভালো বিজ্ঞাপন দেবার ইচ্ছা থাকতে হবে বিজ্ঞাপনদাতার এবং এর জন্য তার মানসিক প্রস্তুতি থাকতে হবে। বিজ্ঞাপনের ভাষায় আবেদন থাকবে তবে তাতে কোন কুটিল কথার মারপ্যাচ থাকবে না। যা বিক্রি করতে চাও তাই বলতে হবে।

৫. বিজ্ঞাপনে বিক্রির জন্য যে পণ্য ও সেবার কথা বলা হয়েছে তাতে এমন কিছু থাকবে না যা জনস্বাস্থ্য ও জীবনের প্রতি হুমকিস্বরূপ হয়।

৬. বিজ্ঞাপনে প্রতারনামূলক কিংবা গোপন কিছু থাকবে না। যদি এমন কোন কিছুতে ভোক্তা বিভ্রান্ত হয় সেরকম পরিস্থিতিকে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য দিতে হবে। ব্যাখ্যা দিতে হবে।

৭. বিজ্ঞাপনে যদি কারো সাক্ষ্যমূলক (Testimonial) কোন বক্তব্য ব্যবহার করা হয়- তবে যাদের মতামত নেয়া হবে তারা যেন প্রত্যক্ষদর্শী, কিংবা কোন ভোক্তা হয় এবং অবশ্যই তাদের সৎ ও বিশ্বস্ত হতে হবে। সাক্ষ্যদাতারা কি বলছে বিজ্ঞাপনে তাদের কথাই বলতে হবে, বিক্রেতা কি বলছে তা নয়।

৮. কোন বিক্রয়যোগ্য সেবা বা পণ্যের গুণাবলীর ওপরই সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপকের বিজ্ঞাপন দিতে হবে। নিজের দ্রব্যাদি বিক্রির জন্য অন্য কোম্পানীর দ্রব্যাদির নাম বা তার ভালোমন্দ উল্লেখ করে বিজ্ঞাপন দেয়া যাবে না। অন্য কোম্পানীর প্রতিদ্বন্দ্বীদের দ্রব্য বা সেবা কিংবা তাদের দৈনন্দিন ব্যবসা পদ্ধতির ওপর অনাহুত ও অযাচিতভাবে আলোকপাত করে কিংবা তাদেরকে আক্রমন করে কোন বিজ্ঞাপন দেয়া যাবে না।

৯. সব ধরনের কূট কলাকৌশল ও পরিকল্পনা বর্জন করতে হবে, দ্রব্যাদির ভূয়া মূল্যস্তর কিংবা অন্যান্য বিজ্ঞাপনের সঙ্গে মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত করে তুলনামূলক কম মূল্যস্তর উল্লেখ করা কিংবা বিনে পয়সায় কোন কিছু দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনগণের সরলতাকে কাজে লাগানো যাবে না। জনগণ সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করে ফেলে এমন কোন চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন দেয়া যাবে না। অর্থাৎ ক্রেতার সরলতার সুযোগ নেয়া যাবে না।

**তথ্য নির্দেশ :** ভট্টাচার্য, বৈদ্যনাথ (২০০০) : সংবাদপত্র পরিচালন ব্যবস্থা; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা।

*কৃতজ্ঞতা : (প্রয়াত) অধ্যাপক ক আ ই ম নূরউদ্দিন, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*



www.pathagar.com

# মিডিয়ার স্বাধীনতাঃ নীতি ও আইনি দৃষ্টিতে

একেকটি যুদ্ধ মানুষকে অনেক কিছু শেখায়। ভালো-মন্দ অনেক কিছু। বেঁচে থাকার, মেরে ফেলার কিংবা সমাজ গঠনের অথবা সামাজিক অবক্ষয়ের। যুদ্ধ প্ররোচিত করে ইতিহাস ঐতিহ্য বিনষ্টের, যেমন করে হয়েছে ইরাকে। উল্টোপথে বিবেক জাগ্রত হয় তা রক্ষার।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে 'Liberation' এর মতো মহান শব্দটি আমরা শিখেছিলাম। আবার 'ধর্ষণ- এর মতো কদর্য শব্দটিও তখন থেকেই আমাদের সমজে ছেলেবুড়ো সবার কাছেই অতি পরিচিত ও বারবার শ্রুত।

দ্বিতীয় দফায় উপসাগরীয় যুদ্ধের এখনও শেষ হয়নি। অথবা শেষ হলেও তার রেশ কাটেনি। Iraq Liberated নাকি Iraq Occupied এ নিয়ে এখনও বিতর্ক চলছে। মিডিয়ার জন্য এখনও একটা ভালো ইস্যু। যুদ্ধের একেক পর্যায়ে বিভিন্ন মিডিয়া বিশেষত টিভি নেটওয়ার্ক বিভিন্ন লেবেল-এর আওতায় তাদের সম্প্রচার কাজ চালিয়েছে। এরকম একটি ছিল বিবিসি টিভি নেটওয়ার্কের 'Battle of Control'। এই Battle of Control যতটা না যুদ্ধের ময়দানে তার চেয়েও বেশি মিডিয়ার মল্লভূমিতে। সংবাদক্ষেত্র বা সার্বিক অর্থে মিডিয়ার স্বাধীনতা বা সাংবাদিকের স্বাধীনতা এবং অবশ্যই অডিয়েন্স বা ভোক্তার স্বাধীনতা কতটুকু- ইরাকের যুদ্ধও তা আমাদের বোধকরি কিছুটা শিখিয়েছে। একদিকে বিবিসি কিংবা সিএনএন-এর মতো সম্প্রচার কেন্দ্রগুলো যা বলেছে বা দেখিয়েছে তা কি আমরা সেভাবে শুনতে বা দেখতে চেয়েছি। উল্টোপথে আমাদের দেশের বেশিরভাগ পত্র-পত্রিকা প্রতিদিন যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি বা মূল ঘটনার খবরমূল্য ও গুরুত্বকে এড়িয়ে লাগাতার ব্যানার শিরোনামে অন্য খবরকে ফোকাস করার প্রয়াস পেয়েছে তা কি আমরা ক্রিটিক্যাল পাঠক-শ্রোতা হিসেবে পেতে চেয়েছি?

প্রশ্ন উঠতে পারে আপনার ভালো না লাগলে আপনি টিভি দেখবেন না। রেডিও শুনবেন না। পত্রিকার পাতায় চোখ বুলাবেন না। কিন্তু মিডিয়ানির্ভর ভূবনের বাসিন্দা ও আধুনিক মানুষ হিসেবে আমরাতো সেগুলো করবই। অবশ্য দেশে



www.pathagar.com

দেশে মিডিয়া বা সাংবাদিকের কাজের পেশাগত এবং আইনি ও নৈতিক পরিসীমা যে সকল নিয়মকানুনের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে তার বেশিরভাগ সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র ও সরকারের দৃষ্টিকোণ থেকে। কিন্তু রাষ্ট্র ও মিডিয়ার মাঝে জনগণের চাহিদা ও অধিকারের প্রশ্নটি ভোক্তার দৃষ্টিকোণ থেকে কোথাও স্পষ্ট নয়। ভোক্তার স্বাধীনতা কি আছে?

সরকার ও মিডিয়ার জগতের লোকজন জনগণের স্বার্থেই সবকিছু করছেন এটা অবশ্য আমরা সবসময়ই শুনি। তাদের কাজ ও সেবার কেন্দ্রবিন্দু মানুষ এটাই মুখ্য আলোচ্য বিষয় সর্বত্র। সার্বিক প্রেক্ষাপটে আমরা আইনি ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মিডিয়ার স্বাধীনতা বা সাংবাদিকের স্বাধীনতাকে বিভিন্ন দেশের সংবিধানসহ বিভিন্ন ঐতিহাসিক উদ্ধৃতি ও মন্তব্য নিরীক্ষা করে বোঝার চেষ্টা করতে পারি। তাতে ভোক্তার স্বাধীনতা রয়েছে কিনা সেটাও দেখতে পারি।

প্রথম দফাতেই বাংলাদেশের সংবিধানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাবার চেষ্টা করতে পারি। বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগ-যেখানে মৌলিক অধিকার সন্নিবেশিত রয়েছে সেখানে ৩৯ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে-

৩৯ (১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।

(২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা বা নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংঘটনে প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের ধারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে-

(ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক্ ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের; এবং

(খ) সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হইল।

এখানে লক্ষণীয় যে চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা নিশ্চিত। কিন্তু বাক্ ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা শর্ত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু প্রশ্ন-একজন বিবেকবান মানুষ তাঁর চিন্তা-চেতনার কথা মনেই কেবল পুষে রাখবেন নাকি তা কথা বা ভাবের মাধ্যমে প্রকাশ বা সঞ্চার করবেন। কিন্তু তিনি যদি তা বাক্ ও ভাবের মাধ্যমে প্রকাশ করতে যান তাহলে সুনির্দিষ্ট বিধি-নিষেধের আওতায় পড়ে যাবেন। যদি চিন্তার সূত্রগুলো কিংবা বিবেকের বাণী শর্তসাপেক্ষ হয়ে পড়ে তাহলে তা হবে এক ধরনের অবরুদ্ধ সমাজে বসবাসের সামিল।

কিন্তু একটা বহুল প্রচলিত কথা রয়েছে স্বাধীনতা কোনো লাইসেন্সিং নয়। একটা সিস্টেমে একটি নৈতিক কাঠামো ও পরিসীমার মধ্যে সবাই আচার-আচরণ করবে এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু শর্ত দিয়ে কাউকে তার স্বাধীনতার প্রয়োগ সীমার মধ্যে বেঁধে রাখা যাবে কিনা সেটা একটা বিতর্কের বিষয়। দ্বিতীয়ত স্বাধীনতার প্রয়োগ যদি শর্তসাপেক্ষের বাইরে গিয়ে সাংবাদিক বারে বারে করতে থাকে তাহলে এটা



www.pathagar.com

স্পষ্ট যে বাধ্যবাধকতা দিয়ে নয় বরং সহজাত নৈতিক ভিত মজবুত করার পন্থা পদ্ধতি খুঁজতে হবে।

যে ধরনের বাধ্যবাধকতা বাংলাদেশের সংবিধানে তা ভারতের সংবিধানেও স্পষ্ট। ভারতের সংবিধানের ১৯ (২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে,

> 'ব্যক্তি বিশেষের যে স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে সংবাদপত্রসমূহও একই স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে। ...' সংবাদক্ষেত্রের স্বাধীনতার অধিকার সংরক্ষিত থাকলেও ওই অধিকার লাইসেন্স-এর মতো ঢালাও অনুমতি নয়। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, অন্যান্য দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, নৈতিকতার প্রশ্নে বা আদালত অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ কর্মে প্ররোচনার বিবেচনায় আইনসভা যেসব সঙ্গত বিধিনিষেধ আরোপ করে থাকেন সংবাদপত্রেরও ওইসব অধিকার বিধিনিষেধ সাপেক্ষ।

বাংলাদেশ ও ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংবিধানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা শর্তসাপেক্ষে করলেও ভিন্ন ধারার শাসন ব্যবস্থার কাঠামোধীন চীনের সংবিধানের ৩৫নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে :

> 'Citizens of the People's Republic of China enjoy freedom of speech, of the press, of assembly, of association, of procession and of demonstration.'

সংবিধানে বর্ণিত এই অবাধ স্বাধীনতা চীনের মতো একটি রুদ্ধ সমাজ ব্যবস্থার (Regimented society) চরিত্রের বিপরীত। কারণ আমরা চীনের জনগণের কথা সাধারণত শুনতে পাই না, সাংবাদিকদের সংবাদ বা সংবাদভাষ্য পাই না। তিয়েন আন মেন স্কোয়ারে ছাত্র বিক্ষোভের পরিণতি কী হয়েছিল তাও আমরা দেখেছি। নীতির সঙ্গে প্রয়োগের বিস্তর ফারাক সেখানে।

অপরদিকে ১৭৯১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রথম সংশোধনীতে, যা বিল অব রাইটস্-এর অন্তর্ভুক্ত, বলা হয়েছে :

> Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of Grievances.

মার্কিন সংবিধানে সংবাদপত্রের বা বাক্-স্বাধীনতা খর্ব করে কংগ্রেস কোনো আইন প্রণয়ন করতে পারবে না একথা বললেও Doctrine of police power-এর মাধ্যমে সেই স্বাধীনতাকে সীমিত করা হয়েছে। তার অনেক আগে ১৭৫৮ সালে



www.pathagar.com

ব্রিটিশ আইনজ্ঞ স্যার উইলিয়াম ব্ল্যাকস্টোন যে মন্তব্য করেছিলেন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে তা এখানে প্রণিধানযোগ্য।

তিনি বলেছেন :

> Every freedom has an undoubted right to lay what sentiments he pleases before the public, .... but if he publishes what is improper, mischievous, or illegal, he must take the consequences of his own temerity.
>
> That is, he will be held accountable, by criminal proceedings or in civil action for damages, should he slander or libel another. And his oral and written speech is subject to restriction by the police power for the protection of the moral health of the community.

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টও ১৯২১ সালে এক মন্তব্যে বলেছিল :

> Freedom of the press may protect criticism and agitation for modification or repeal of laws, but it does not extend to protection of him who counsels and encourages the violation of the law as it exists.

সুইডেনে সর্বপ্রথম ১৭৫৬ সালে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নেয়া হয়। কিন্তু তার দুশ বছর পর ১৯৪৯ সালে জারিকৃত এক আইনে আদালতের বিবেচ্য বিষয়, ব্যক্তি অধিকার সংরক্ষণ ও জননিরাপত্তা প্রভৃতি বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেয়া হয়নি। অপরদিকে ইউরোপের ফেডারেল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র জার্মানির Basic Law-এর ৫ নম্বর অনুচ্ছেদের ১ নং ধারায় বলা হয়েছে-

> Everyone has the right to express and disseminate his opinion freely in speech, writing and images and to inform himself without let or hindrance from generally accessible sources. Freedom of the press and the freedom to report by radio and film are guaranteed. There shall be no censorship.

উল্লেখিত ধারায় ব্যাপক স্বাধীনতার কথা বলা হলেও একই অনুচ্ছেদের ২ নম্বর ধারায় তাকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে এইভাবে :

> These rights are limited by the provisions of general laws, the legal requirements governing the protection of young people and the right to personal honour.



www.pathagar.com

আমরা দেশে-বিদেশের সংবিধান ও ঐতিহাসিক উদ্ধৃতি ও মন্তব্য থেকে এটা উপলব্ধি করতে পারছি যে সংবাদপত্রের তথা মিডিয়ার স্বাধীনতা বা সাংবাদিকের স্বাধীনতা কোথাও নিরঙ্কুশ নয়। কোথাও প্রকটভাবে কোথাও ঢিলেঢালা বা উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে সংবাদপত্রের নিয়ন্ত্রণযুক্ত স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। আবার এমনও আছে যে নিয়ন্ত্রণের কথা বা বিধিনিষেধের কথা বলা হয়েছে কিন্তু জ্ঞাতসারে যতটা তার চেয়ে অজ্ঞাতে, অসচেতনায় স্বাধীনতার লঙ্ঘণ হচ্ছে অহরহ কিন্তু তার বিরুদ্ধে প্রতিকার হচ্ছে এক আধবার এবং তার বেশিরভাগই সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বিবেচনায়। অন্যদিকে কোথাও কোথাও স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ রয়েছে সনদে কিন্তু তার প্রয়োগ কখনই দৃশ্যমান নয়।

কিন্তু দৃশ্যত গণ্ডীবদ্ধ সমাজব্যবস্থা যদি না হয় তাহলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংবাদপত্রের বা সাংবাদিকের স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ হলে ক্ষতিটা কতটুকু আর লাভটা কতখানি।

অধ্যাপক হ্যারল্ড লাস্কির উদ্ধৃতি এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন :

'A government can learn from criticism of the enemies than the flattery of its friends.' কিন্তু পাঠক হিসেবে তো আমরা দেশে-বিদেশের মিডিয়াতে বন্ধুদের স্তুতিই শুনছি অহরহ। একি স্বাধীনতা সাংবাদিকের নাকি পাঠকের?

অপরদিকে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওয়াহেরলাল নেহেরু একদা বলেছিলেন, 'I would rather have a completely free press with all the dangers involved in the wrong use of the freedom than a suppressed or a regulated press.' একটি অবরুদ্ধ অথবা নিয়ন্ত্রিত সংবাদক্ষেত্রের বদলে স্বাধীনতার বেঠিক ব্যবহারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল বিপদসহ পুরোপুরি স্বাধীন সংবাদপত্রের পক্ষেই ছিলেন পণ্ডিত নেহেরু।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রথম সংশোধনী নিয়ে বিভিন্ন মহাজন নানামুখী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাদের ব্যাখ্যার একটি অভিন্ন সুর হচ্ছে যে, সংবিধানে নানামাত্রিক স্বাধীনতার মানে এই নয় যে কোন একজন সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ও আইনের পরিপন্থি কাজ করলে পার পেয়ে যাবেন। কিন্তু কোন্‌টা পন্থি আর কোন্‌টা পরিপন্থি তা নির্ণয় করা খুবই কঠিন। কিন্তু তারপরেও যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের একজন বিচারপতি থারগুড মার্শাল বলেছেন :

> Above all else, the First Amendment means that the government has no power to restrict expression because of its message, its ideas, its subject matter, or its content.



www.pathagar.com

ওপরের কথায়ও দুয়ের মাঝে একধরনের ভারসাম্যের ইঙ্গিত রয়েছে। অবশ্য জার্মানিতে ফেডারেল কনস্টিটিউশনাল কোর্ট ১৯৫৮ সালে এক রায় প্রদানের সময় মন্তব্য করেছিল যে :

> The basic right to free statement of opinion is, as the most direct expression of the human personality in society, one of the nobliest of all human rights. ...For a liberal democratic system of government it is absolutely fundamental because only it permits the continous intellectual debate, the battlle of opinion which is the lifeblood of such a system. In a certain sense it is the basis for all freedom.

মহামতি প্লেটোও বলেছিলেন, মুক্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে সত্যে উপনীত হওয়া যায়।

ওপরের দুটো উদ্ধৃতি যথেষ্ঠমাত্রায় অনুসরণযোগ্য। কিন্তু এই ধরনের মন্তব্যসমূহ দেশে বিদেশে প্রায় সর্বত্রই 'Rhetoric' এই প্রত্যয়ের (Term) কৌটোয় বন্দি করার প্রবণতা লক্ষণীয়।

মানুষ যন্ত্র নয়, যন্ত্রবতও নয়। মানুষের বাক্‌ের স্বাধীনতা তাই থাকবে, বাক্‌ের লড়াই হবে, বিতর্ক হবে। তার মধ্য থেকে সমাধান সূত্র বেরিয়ে আসবে। কথা ও ভাবকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে বন্দি করা অথবা নিয়ন্ত্রণের মধ্য থেকে কথা বলা বা ভাব প্রকাশ অবশ্যই কাম্য নয়। এ প্রেক্ষাপটে Constitutional History of England-এর প্রণেতা Hallan-এর বক্তব্য সার্বিকভাবে প্রণিধানযোগ্য :

The liberty of the press consists, in the strict sense, merely in an exemption from the superintendence of a licenser.

মিডিয়ার স্বাধীনতা লাইসেন্সারের খবরদারির নাগালের বাইরে অন্তর্নিহিত।

'ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম' দিবসে আমরা এরকমটা অবশ্যই আশা করতে পারি। সঠিক চিত্র ও তথ্যটি পেতে পাঠকের তথা অডিয়েন্সের চাহিদা ও মর্যাদার দৃষ্টিকোণ থেকে অন্তত।

**তথ্যনির্দেশ :**

১. হক, আবু নছর মোঃ গাজীউল : *বাংলাদেশের গণমাধ্যম আইন ও নীতিমালা*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ঢাকা; ১৯৯৬



www.pathagar.com

২. Meyn, Herman : *Mass Media in the Federal Republic of Cermanv,* 1994
৩. *The Constitution of the United States of America,* 18th edition published by the Commission on the Bicentennial of the US Constitution, Washington DC, 1992
৪. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান* : ১৯৯৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সংশোধিত
৫. আলম, মোঃ খুরশীদ : *সংবাদপত্রের স্বাধীনতা,* সুবর্ণ, ঢাকা; ১৯৯২
৬. রায়, সুধাংশু শেখর : *সাংবাদিকতা সাংবাদিক ও সংবাদপত্র,* ধলেশ্বরী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৪
৭. Internet : *The Constitution for the United States* (Its Sources and its Application)
৮. Internet : *The Fundamental Rights and duties of Citizens.*
৯. আলম, আশফাকউল অনূদিত : *আধুনিক ভারতে সাংবাদিকতা,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা

*সূত্র : ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ডে ২০০৩ উপলক্ষে ম্যাসলাইন মিডিয়া সেন্টার (এমসিসি)-এর বিশেষ প্রকাশনায় প্রকাশিত।*



www.pathagar.com

# শৈলী ও শৈথিল্য

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# শিরোনাম নিয়ে শিরঃপীড়া

একটি সংবাদপত্র মূলত চলে তার পরিবেশিত সংবাদ ও সংবাদভাষ্যে। যে পত্রিকায় ভাল সংবাদ নেই সে পত্রিকায় প্রাণ নেই। সংবাদবিষয়ক সেই প্রাণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিজ্ঞাপন ও পত্রিকার অস্তিত্ব। আমরা সাধারণত জানি, একটি সংবাদবিবরণীর তিনটি প্রধান অংশ। ১. শিরোনাম, ২. সংবাদসূচনা বা শীর্ষ ও ৩. বডি (Body) বা অবয়ব। এর মধ্যে প্রথমটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ; কারণ শিরোনামই প্রথম পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগটি করে থাকে। কয়েকটি শব্দের একটি লেখাই হচ্ছে শিরোনাম। অনেকেরই মনে হতে পারে, এ আর এমন কি কাজ। কিন্তু শিরোনাম লেখাটা যে কত কঠিন তা প্রতিদিনই সংবাদবিষয়ক বৃত্তির পরীক্ষায় বসা একজন সহ-সম্পাদক ভাল করেই জানেন।

গত প্রায় দু'দশকে বাংলাদেশের সংবাদপত্রে বিষয়ের ক্ষেত্রে, পরিবেশনার ক্ষেত্রে বেশ পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে শিরোনাম লেখার ক্ষেত্রেও। তবে সেই পরিবর্তন যুগের পরিবর্তনের কারণে, নাকি সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে তাড়াহুড়োর ফল হিসেবে, নাকি এক ধরনের মন্ময়ীরূপে (Subjectively) গল্প বলার ঢঙের কারণে তা স্পষ্ট নয়। শিরোনামের উদ্দেশ্য হচ্ছে কম কথায় অতি দ্রুত পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা। সাধারণত ১ থেকে ৯ শব্দের মধ্যে শিরোনাম লেখা হয়। এ কাজটি আগেও হতো, এখনও হয়। তবে ইদানীংকালের শিরোনাম দেখে সত্যিই ভাবতে হচ্ছে আমরা সত্যিই অনেক চিন্তাভাবনা করে শিরোনাম লিখছি নাকি শিরোনাম দেয়ার দরকার তাই দিয়ে যাচ্ছি। শিরোনামের অবয়ব দীর্ঘ হচ্ছে। কলামের স্পেসের সাথে কোন সামঞ্জস্য নেই। মাল্টিকলাম হেডলাইন তিন-চার-পাঁচ লাইনে লেখা হচ্ছে। একি ভাল করে লিখতে না পারার ফল নাকি সংবাদ বিবরণীর মূলভাব বা তথ্যকে পুরোটাই দিয়ে দেয়া হচ্ছে! তাহলে শিরোনাম লেখার দরকার কি!

শিরোনাম লিখতে গিয়ে অনেক সহ-সম্পাদক বা কপি এডিটরেরই শিরঃপীড়া দেখা দেয়, চুল ছিঁড়তে হয়। নিউজডেস্কে প্রকৃতই এমন ঘটনা ঘটার রেকর্ড আছে।



www.pathagar.com

শিরোনাম লেখাটা একটা ফ্যাশন নয়, এটি একটি প্যাশন (Passion)। কিন্তু সাম্প্রতিককালে শিরোনাম লেখায় যে যথাযথ মনোনিবেশ করা হচ্ছে না তা আমরা কিছু উদাহরণ সহযোগে বোঝার চেষ্টা করতে পারি।

শিরোনামকে আকর্ষণীয় করতে হবে- এটাই দাবি, তবে জোর করে আকর্ষণ বাড়ানো যায় না। একটি পত্রিকা লিখল-

'চট্টগ্রামে দৃষ্টিনন্দন পাহাড়

কেটে ফেলা হচ্ছে'

একটি শিরোনাম খুবই আকর্ষণীয় হবে তবে অনাহুত রোমান্টিক করার কোন যুক্তি নেই। শিরোনামটিতে পাহাড় কেটে ফেলার ক্রুরতাকে ফুটিয়ে তুলতে ব্যর্থ হয়ে সহ-সম্পাদক অনাহুত 'দৃষ্টিনন্দন' কথাটি বসিয়ে শিরোনামের জোর ও সৌন্দর্যহানি ঘটিয়েছেন। শিরোনামের অন্তর্নিহিত অর্থের মধ্যেই তার সৌন্দর্য লুকিয়ে থাকে।

অন্য একটি শিরোনামে লেখা হলো :

'ব্রাদার্স-আবাহনীর উত্তেজনাপূর্ণ খেলা আজ'

এখানে 'উত্তেজনাপূর্ণ' কথাটি সহ-সম্পাদকের সম্পূর্ণ জল্পনা। এটি আগাম বলে লাভ নেই। কারণ খেলাটি নিষ্প্রাণও হতে পারে। বরং খেলা নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে কোন উত্তেজনা থাকলে সেটাই বরং শিরোনামে আনা যেতে পারত। সাংবাদিকতায় জল্পনার কোন স্থান নেই একথা সাংবাদিকদের মনে রাখতে হবে। একই বিষয়ে অন্য একটি শিরোনামে লেখা হলো :

'বড় বাজেটের দল ব্রাদার্সের খেলা আজ'

এখানে ব্রাদার্সের খেলাটাই মুখ্য। বড় বাজেট না ছোট বাজেট তা মুখ্য নয়। 'বড় বাজেটের' কথা বলে শিরোনামটির আকর্ষণের Focus দূরে সরে গেছে। এই অনাহুত বিশেষণ বসিয়ে একজন সহ-সম্পাদক মনে করতে পারেন যে, দারুণ একখানা শব্দ প্রযোগ করলাম। কিন্তু ফলটা হলো তার বিপরীত।

কোন এক বছর বাণিজ্যমেলা ফেব্রুয়ারিতে শুরু হয়েছিল। ক্রেতাদের দাবির মুখে তা গড়িয়ে মার্চে পড়ল। তখন একটি পত্রিকা লিখল :

'বাণিজ্য মেলা মার্চ মাস

পর্যন্ত গড়ালো'

শিরোনামটি অস্পষ্ট। মার্চ মাস বলতে ১ থেকে ৩১ তারিখ পর্যন্ত বোঝায়। পাঠক ভাবতে পারেন মাসের শেষদিকে মেলায় গিয়ে একটি জিনিস কিনবেন। কিন্তু



www.pathagar.com

এমনও হতে পারে মেলার সময় ৭ মার্চ পর্যন্ত। তাহলে? পাঠককে আমরা সংশয়াচ্ছন্ন করতে পারি না। স্পষ্ট তথ্য শিরোনামের প্রাণ।

অনেক আগে একটি পত্রিকা বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক একটি খবরের শিরোনাম লিখল :

'বাংলাদেশের সঙ্গে বন
বাণিজ্য সম্পর্ক আরো
সুদৃঢ় করতে চায়'

এখানে 'তথ্যগত ভুল' ও 'টেকনিক্যাল ত্রুটি' দু'টোই রয়েছে। যখন বলছি 'বাংলাদেশের' তখন তার সঙ্গে মানানসই করে 'জার্মানি' বলতে হবে। আর না হলে 'ঢাকার' সঙ্গে 'বন'। যদিও যে সময় জার্মানির রাজধানী 'বন' বলা হয়েছিল প্রকৃতপক্ষে তখন কিন্তু জার্মানির রাজধানী বন থেকে বার্লিনে স্থানান্তর হয়ে গেছে। অভ্যাসবশত বা অজ্ঞতাবশত সহ-সম্পাদক 'বন' লিখেছেন। অথবা তিনি তথ্যের ক্ষেত্রে Updated নন। রাজনৈতিক একটি খবরের শিরোনাম লিখতে গিয়ে একজন সহ-সম্পাদক লিখলেন :

'প্রধানমন্ত্রী গতকাল
দেশে ফিরে এসেছেন'

শিরোনামটি যদিও খারাপ হয়নি, তবু শব্দ সংকোচ (Word Economy) করে লেখা যেতে পারত- 'প্রধানমন্ত্রী দেশে ফিরেছেন'। শব্দ সংকোচনের মানে এই নয় যে, কোন শিরোনামের অর্থকে অস্পষ্ট করে তোলা। তবে শব্দ সংকোচনের মাধ্যমে যদি শিরোনামকে আরো ছোট করা যায় তাহলে সে শিরোনামের ট্রিটমেন্ট আরো বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। শব্দ সংকোচনের সঙ্গে তাই শিরোনামের ট্রিটমেন্টের ভাল-মন্দের সম্পর্ক। শব্দ সংকোচন হলে ইউনিট বা ক্যারেকটার (Unit or Character) কমে যায় আর ট্রিটমেন্টের মাত্রা বাড়তে থাকে। ইউনিট কমাতে পারলে ট্রিটমেন্টের মাত্রা বাড়ানো যায় এই টেকনিক্যাল বিষয়টি আজকের জমানার অনেক সহসম্পাদকই ভালো করে জানেন না।

অপরদিকে অনেক হাসি-তামাশা আর নাটকের পর যখন এক সময়ের প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি এম.এ. আজিজ পদত্যাগ করলেন, তখন একটি নামি পত্রিকা তার প্রধান খবরের শিরোনাম করল :

'অবশেষে ঘোলা করে পানি
খেলেন সিইসি আজিজ'

ঘোলা করে কে পানি খায়? মূলস্রোতের একটি অন্যতম প্রধান পত্রিকার কোন দিনের প্রধান খবরের শিরোনাম এমন 'স্থূল' হওয়ার কথা নয়। লেখাটি নীতিসম্মত


www.pathagar.com

নয়, বরং অশোভন ও মানহানিকর। সিইসি আজিজ সাহেব নিজে হয়তো অনেক কিছু করে থাকতে পারেন। কিন্তু তাঁকে কেন্দ্র করে কোন খবর 'অপলেখ'র পর্যায়ে চলে যায় তা অভিপ্রেত নয়। প্রকৃতপক্ষে লেখাটির মধ্যে একটু শ্লেষ মেশাতে গিয়ে 'unethical slant'-এর আশ্রয় নেয়া হয়েছে। একটি Slant বা ঝোঁক কোন শিরোনামে বা সংবাদবিবরণীতে পত্রিকার আদর্শের কারণে আনা যেতে পারে তবে তা যেন রুচির বাইরে না যায় সেটা খেয়াল করা উচিত। সাংবাদিকতা হচ্ছে মূলত একটি নৈর্ব্যক্তিক পেশা, তাই একটি শিরোনাম মন্ময়ীরূপে লেখা সাধারণত নিয়মবিরুদ্ধ, তবে ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়; তবে শালীনতার মাত্রা যেন অতিক্রম করে না যায় তা খেয়াল রাখা সহ-সম্পাদকের পেশাগত দায়িত্বের অংশ।

একটি আইনি সংবাদবিবণীর শিরোনাম লিখতে গিয়ে একজন সহ-সম্পাদক কিভাবে আইনের কাঠগড়ায় তাঁর সম্পাদককে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন তার উদাহরণ ছিল নিম্নরূপ :

'মাতৃহন্তারক বেকসুর খালাস'

এটি হতে পারত 'মাকে হত্যার অভিযোগ থেকে খালাস'। কিন্তু শিরোনাম থেকে মনে হয় যেন কোন আদালত মায়ের হত্যাকারীকে ইচ্ছে করেই খালাস দিয়ে দিয়েছে। মাকে হত্যা করার পরও কাউকে যদি আদালত খালাস দিয়ে থাকে তবে আদালতের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। শিরোনামটি ছিল সম্পূর্ণ আদালত অবমাননা এবং সংশ্লিষ্ট আদালত সংশ্লিষ্ট পত্রিকার সম্পাদককে আদালতে হাজির করার সমন জারি করেছিল। সংশ্লিষ্ট সহ-সম্পাদক আইনি বিষয়টি ভাল করে না বুঝেই শিরোনামটি লিখেছিলেন এবং ভাগ্য ভাল যে, আদালতে এসে স্বীকার করায় আদালত ওই সম্পাদককে সসম্মানে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন।

এবার দেখি অন্য একটি শিরোনাম :

'বিদ্যুতের তার চুরি করতে গিয়ে
বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে চোরের মৃত্যু'

শিরোনামটিতে শব্দের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। অর্থাৎ 'বিদ্যুৎ' ও 'বিদ্যুৎস্পৃষ্ট'। এটি বরং লেখা যেতে পারত : 'তার চুরি করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু'।

একই রকম শিরোনাম লেখা হলো :

'তুরাগের তলদেশে গ্যাস লাইনে
বিস্ফোরণ, নগরীতে গ্যাস
সরবরাহ বিঘ্নিত'



www.pathagar.com

এখানেও পুনরাবৃত্তি আছে অর্থাৎ 'গ্যাসলাইন', 'গ্যাস' প্রভৃতি। বরং এটি লেখা যেতে পারত :

'তুরাগের তলদেশে গ্যাসলাইনে
বিস্ফোরণ : নগরীতে
সরবরাহ বিঘ্নিত'

এবার দেখা যাক, কতগুলো ইংরেজি শিরোনাম। রাশিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট পুতিন সেদেশের সরকারকে একবার বরখাস্ত করলেন। এ খবরের ইংরেজি শিরোনাম লেখা হলো :

'Putin sacked entire govt'

এখানে দু'টো সমস্যা রয়েছে। শিরোনাম আমরা বর্তমান কালে লিখি। কেন? ঘটনা যখনই ঘটুক বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমরা তা এমনভাবে বলি পাঠক যেন মনে করে ঘটনা যেন তার সামনেই ঘটেছে বা এইমাত্র ঘটল (Virtual reality)। একে বলে Sense of immediacy সেজন্য 'sacked'-এর জায়গায় 'sacks' লেখা দরকার ছিল। অপর সমস্যাটি হলো 'সরকারটা যখন বাদ পড়ে গেল মানে পুরো সরকারটাই বাদ পড়ে গেল, সেখানে 'entire' শব্দটা লেখার কোন অর্থ হয় না। তবে হ্যাঁ, এখানে কোন প্রেক্ষাপট (context) থাকলেও থাকতে পারে। যদি থাকে তবে তার জন্য তো পুরো সংবাদবিবরণীটিই পড়ে রয়েছে।

গ্রীস একবার ইউরোপীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়ন লীগের শিরোপা জেতার পর একটি ইরেজি পত্রিকায় শিরোনাম লেখা হলো :

'Greek Gods take title in style'

লেখাটি খুবই শৈল্পিক (artistic) কিন্তু অতিমাত্রায় রোমান্টিক। একজন নতুন পাঠক পয়লা বুঝতেই পারবেন না যে, Greek God বলতে কি বোঝানো হয়েছে। বিষয়টি আরও স্পষ্ট করার জন্য হয়তোবা বলা যেতে পারত :

'Greek Euro Football Champ '

অথবা

'Greece, New King of Euro Football'

অথবা

'Greece becomes Champion
of European Football'



www.pathagar.com

শিরোনামের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সাংবাদিকতার একজন পণ্ডিত বলেছিলেন, It is synthesis, crystallization, a distillation-put into a capsule for easy swallowing. অর্থাৎ শিরোনামের অবয়বটা যেমন খুবই ছোট হবে, এবং তার অর্থটাও হবে স্পষ্ট যাতে করে পাঠক খুব সহজেই তা বুঝতে পারেন।

প্রায় একই কায়দায় লেখা আরেকটি ইংরেজি শিরোনাম খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

'Train ride turns fatal venture'

বাংলাদেশের ট্রেন ভ্রমণ খুবই ঝুঁকিপূর্ণ-এই নিয়ে একটি সংবাদবিবরণীর শিরোনাম এটি। শিরোনামের কথাটি পড়ে মনে হয় এ যেন কোন সম্পাদকীয়'র Peg বা উছিলা (Issue)। সাধারণত সম্পাদকীয়তে এ ধরনের শিরোনাম ব্যবহার হয়। উল্লিখিত সংবাদবিবরণীটি ছিল রেল দুর্ঘটনার সংখ্যা, হতাহত ও ক্ষয়ক্ষতির হিসাব এবং সর্বোপরি রক্ষণাবেক্ষণের পয়সার অভাবের কথা। সব মিলিয়ে এক ধরনের Soft news বা কোমল সংবাদ। চরিত্রগত দিক দিয়ে একটি আর্টিকল্-এর মতো। তবে পাঠককে চমকে দেয়ার মতো এমন কিছু তথ্য সংবাদবিবরণীতে ছিল যা দিয়ে শিরোনাম হতে পারত এরকম :

'Country experiences 500 train
accidents every year'

অথবা

'Rail offers 500 train
accidents every year'

ওপরের মতো করে শিরোনামটা লেখা হলে মানুষ এমনিই বুঝে যেতে পারত বাংলাদেশে ট্রেন ভ্রমণ কতটা ঝুঁকিপূর্ণ (অন্তত বছর কয়েক আগে)।

অপর একটি ইংরেজি শিরোনামে লেখা হলো :

'AL pours cold water to Judicial
Commission inquiry report on
21 August granade attack'

শিরোনাম লেখার প্রচলিত নিয়মানুযায়ী অপেক্ষাকৃত কম শব্দের (৯) মধ্যে লিখতে ব্যর্থ হয়েছেন সহ-সম্পাদক। দ্বিতীয়ত এমন একটি Phrase বা শব্দগুচ্ছ তিনি ব্যবহার করলেন যা অর্থকে স্পষ্ট করল না উল্টো বরং শিরোনামের বপুকে দীঘল করেছে। 'Pours cold water' হচ্ছে একটি টেকনিক্যাল শব্দগুচ্ছ, যেটাকে অন্য অর্থে বলা যায় Linguistic jargon. শিরোনামে খুব জরুরি না হলে তা না


www.pathagar.com

লেখাই ভাল। দ্বিতীয়ত, যে চেতনা বা spirit-এর ওপর এই খবর তা 'Pours cold water' বলে খবরটির উচ্চমাত্রা (High intensity) নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। তবে যে পত্রিকা এটি লিখেছিল তারা হয়তো পত্রিকার নীতির কারণে intensity-টাকে আনতে চায়নি। কিন্তু আমরা পাঠকরা স্পষ্টতা চাই। খবরটির বিকল্প শিরোনাম হতে পারত :

'AL rejects judicial inquiry report
on 21 August granade attack'

অথবা

'AL rejects judicial inquiry
report on 21/8 granade attack'

এখানে ' rejects' কথাটা অনেকটা স্পষ্ট এবং সংবাদবিবরণীর সঙ্গে অনেক বেশি সঙ্গতিপূর্ণ। শব্দসংখ্যাও অনেক কমে গেছে, তাতে ট্রিটমেন্টের মাত্রাও বাড়ানো সম্ভব। সংবাদবিবরণীর মূল সুরটিও তাতে পাওয়া যায়। আগে সহ-সম্পাদকরা একটি শিরোনাম লেখার পর শব্দসংখ্যাও গুণে দেখতেন। যদিও এটা শব্দ না হয়ে প্রতিটি অক্ষর বা ইউনিট (বা Character) হতে হবে। কারণ কম্পিউটার প্রযুক্তি আসার আগে শিরোনাম লেখার টাইপগুলো ছিল সীমিত। কিন্তু কম্পিউটার আসার পর ইউনিট বা Character গোণার উপযোগিতা নষ্ট হয়ে গেছে বলে যে ধারণা তৈরি হয়েছে তা কোনভাবেই সত্য নয়। আজকের একটি প্রবণতা দাঁড়িয়ে গেছে শিরোনাম মোটামুটি একটা হলেই হলো, বাকি কাজটা করে দেবে কম্পিউটার। এটি ভুল, মহাভুল। সঠিক শব্দ প্রয়োগ, শব্দসংক্ষেপ করতে পারাটা হচ্ছে দক্ষতা। এর সঙ্গে ট্রিটমেন্ট বাড়ানো কমানোর সম্পর্ক আছে সেটা আগেই বলেছি। দ্বিতীয়ত, সাম্প্রতিককালে একটু Literary approach নিয়ে লেখার প্রবণতাও দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ জানানোর (To inform) বদলে বেশি করে বিনোদনমূলক মাত্রা (entertainment value) যুক্ত করা হচ্ছে।

একটি আকর্ষণীয় শিরোনাম বহুদিন আগে একটি পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল কিন্তু নীতি ও আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে সেটি সঠিক ছিল না। মন্তব্যটি অসময়োচিত ছিল। শিরোনামটি ছিল নিম্নরূপ :

'Precher turns butcher'

বাংলাদেশেরই একটি গির্জার পাদ্রী তাঁর পরিবারের সব সদস্যকে 'হত্যা করার' পরের দিনই এই শিরোনামটি লেখা হয়েছিল। ওই পাদ্রীর শাস্তি হয়েছিল কিনা তা কখনই জানা যায়নি। পত্রিকা অফিসে ব্যুরোক্র্যাটিক ব্যবস্থা চালু হবার পর



www.pathagar.com

Learning institution হিসেবে পত্রিকার চরিত্রটি ক্রমশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি সাংবাদিক আরো বেশি Individualistic হয়ে যাচ্ছেন। তিনি কম্পিউটার ছাড়া কিছু বোঝেন না, তিনি তাই প্রয়োজনে বড়দের জিজ্ঞেস করেন না। বড়রাও আগের মতো অধস্তন বা জুনিয়রদের বলে দেন না। ফলে অহরহ যে ভুল হচ্ছে তা তাঁরা খেয়াল করেন কিন্তু সম্ভবত আমলে নেন না। আরেকটি উদাহরণ হিসেবে যদি দেখি পাকিস্তান ক্রিকেট দলের একটি ঝামেলা নিয়ে বিদেশী পত্রিকা বা এজেন্সি যখন Pakistan ও Stunned মিলিয়ে স্যাটায়্যার করে লিখেন 'Pakistunned' আমরা তা কিছু না বুঝেই বাংলায় লিখি 'পাকিস্টিউনড্'। এই রকম বেহাল অবস্থা শুরু হয়েছে এবং চলছে। সময়কে যেনতেনভাবে পরাজিত করার প্রতিযোগিতা, অপরকে পরাজিত করার এক ধরনের অসুস্থ মানসিকতা সম্ভবত এর জন্য দায়ী। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে সাংবাদিকের মানবীয় দিকটির (emotional attachment) ব্যবহার ভুলে কঠিন যন্ত্রায়ণের ঘেরাটোপে আটকে যাওয়া। যোগাযোগের বাহনগুলো আরো বাড়ছে, সহজ হচ্ছে, কিন্তু আমরা বোধহয় ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছি।

পরিশেষ : এ লেখার উদ্দেশ্য শুধু সমালোচনা নয়। কারণ বেশিরভাগ পত্রিকাই ভাল কাজ করছে, ভাল শিরোনাম লিখছে। কিন্তু ভুলের সংখ্যাটাও বাড়ছে - এটাই উদ্বেগের বিষয়। ভোক্তার দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা নির্ভুল লেখা চাই। কারণ পত্রিকা শুধু তথ্য দেয় না, শেখায়ও। সেই শেখাটা একপক্ষীয় নয়। পত্রিকায় একজন, বিশেষ করে সহ-সম্পাদক, প্রতিদিন প্রতিনিয়তই শেখে এবং পরে জনগণকে শেখায়। সংবাদের শিরোনাম হচ্ছে প্রথমে পাঠকের সঙ্গে যোগাযোগ এবং পরে শেখা ও শেখানোর এবং পরীক্ষাদানের ও নেয়ার প্রথম পাঠ। ভালো শিরোনাম লেখার জন্য একটাই মাত্র রাস্তা— প্রতিনিয়ত চর্চা এবং চর্চা।

*সূত্র : মূল লেখাটি বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের জার্নাল 'নিরীক্ষা'র জানুয়ারি-মার্চ ২০১০ সংখ্যায় প্রকাশিত। বক্ষ্যমাণ লেখটি ইষৎ পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত।*



www.pathagar.com

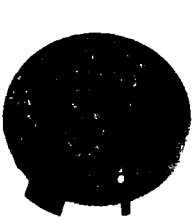

# চাই নির্ভুল, নির্মোহ, নির্মেদ সাংবাদিকতা

লেখালেখির বিভিন্ন ক্ষেত্র রয়েছে। যেমন শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, সাংবাদিকতা প্রভৃতি। বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য ভিন্ন ভিন্ন লেখার বৈশিষ্ট্য ও কৌশল রয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো সাংবাদিকতায়ও লেখার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োগ-কৌশল (Technique) রয়েছে। তবে সহজ সরল, অনাহুত অলংকারমুক্ত, শালীন, বস্তুনিষ্ঠ ও যথার্থভাবে লেখা হচ্ছে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রের জন্য অপরিহার্য শর্ত। সংবাদপত্রের জন্য লেখা শুধুমাত্র পত্রিকার কলামের ফাঁকা জায়গা পুরণ করা নয়। যতটুকু দরকার ততটুকুই পাঠোপযোগী করে লেখার জন্য কিছু কৌশল ও স্টাইল তাই খুবই জরুরী। জরুরী একারণে যে সেই লেখা পাঠকের জন্য শুধু কিছু খড়খড়ে তথ্য সরবরাহ করে না, সেই তথ্য মজা করে পড়ার জন্যও বটে। একুশ শতকের পাঠকের মনে একটু চিন্তাভাবনা উসকে দেয়াও একটি কাজ।

সাংবাদিকতা বিষয়ে বিশেষ করে সংবাদবিবরণী লেখার জন্য কমপক্ষে তিনটি বুনিয়াদ (Basics) রয়েছে। এই তিনটি বুনিয়াদ হচ্ছে স্পষ্টতা (Clarity), স্টাইল (Style) ও যথার্থতা (Accuracy)। সংবাদবিবরণী সুন্দর ও সহজবোধ্য করে পরিবেশনের জন্য ওই তিনটি বুনিয়াদকে একত্র করে লেখাটা খুবই কঠিন কাজ। তিনটি বুনিয়াদের মধ্যে 'স্টাইল'টি নির্ভর করে পত্রিকার ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্তের ওপর তারা কেমন করে লিখবে। টেলিভিশন মাধ্যম প্রাথমিক তথ্য দ্রুত সরবরাহ করছে বিধায় পত্রিকাগুলোর একই স্টাইলে সংবাদ পরিবেশনের আর সুযোগ নেই। অস্তিত্বের প্রশ্নে তাকে ভিন্ন কায়দায় সংবাদ পরিবেশন করতে হচ্ছে। ফলে পত্রিকাগুলো পাঠকের জন্য আকর্ষণ বাড়াতে অনেকাংশেই গল্প বলার ঢংয়ে সংবাদ পরিবেশন করছে। ঢাকার শীর্ষস্থানীয় পত্রিকাগুলোও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে এই সংবাদগল্প মাঝে মাঝে গল্পেরও অতীত হয়ে যাচ্ছে। নিজস্ব স্টাইল একটা পত্রিকার অবশ্যই থাকবে তবে স্টাইলের যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে সংবাদের পরিবেশন সংবাদের অবয়ব অতিক্রম করে কল্পনাশ্রিত ভাবাক্রান্ত গল্পে যেনো রূপান্তরিত না হয়। এ যেনো না হয় ধান ভানতে শিবের গান। সংবাদপত্রে সংবাদ ও সংবাদভাষ্যই বেশি থাকবে এটাই কাঙ্খিত, অন্য কিছু যেন তাকে খবরদারি না



www.pathagar.com

করে। সংবাদে সংবাদই থাকবে, গল্প যেন সংবাদের তথ্যকে গ্রাস না করে। স্টাইলের নামে অনৈতিক ও যথেচ্ছাচার করা কখনই ঠিক নয়।

স্টাইলকে বাদ দিলে যে দুটো উপাদান খুব বেশি জরুরী তাহলো স্পষ্টতা ও যথার্থতা। নির্মোহ ও নির্মেদভাবে তা প্রয়োগ করা জরুরী। সংবাদবিবরণী লেখার তিনটি অংশ শিরোনাম, সংবাদশীর্ষ ও অবয়বকে সমন্বীত করে লেখা না হলে সেই সংবাদবিবরণী মজাদার হয় না। একটি ক্ষেত্রের ভালো লেখা অপরটিকে গুণান্বিত করে। উল্টোদিকে একটি অংশে খারাপ লেখা হলে তা আরেকটি অংশের সৌন্দর্যহানি ঘটায়। অতএব তিনটি অংশেই তথ্য নির্ভুল ও সঠিক হবে; সব কিছুর মধ্যে স্পষ্টতা থাকবে, বানোয়াট ও অনির্ভরযোগ্য তথ্য দেবোনা।

আমরা একটি পত্রিকার কতগুলি সংবাদবিবরণীর বিভিন্ন অংশ তুলে ধরে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করতে পারি। নীতির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সেই পত্রিকার নাম এখানে উল্লেখ করছি না। বছর কয়েক আগে সে সময়ের প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আজিজ নানা হাসি-তামাশা, ব্যঙ্গ-বঙ্গের পর পদত্যাগ করলেন। স্মৃতি যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করে তাহলে বস্তুত প্রচারসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশের শীর্ষ পত্রিকাটি তার প্রথম পৃষ্ঠায় এই ঘটনার সংবাদ বিবরণীর শিরোনাম লিখেছিল এইভাবে :

অবশেষে ঘোলা করে পানি
খেলেন সিইসি আজিজ

সে সময়ের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে শিরোনামটি একদিক দিয়ে হয়তো ভালোই। কিন্তু শিরোনাম মন্ময়ীরূপে (Subjectively) লেখা নীতিসম্মত নয়। তবে তা কখনোই লেখা যাবে না তাও নয়। মন্ময়ী হলেও লক্ষ্য রাখা উচিত তাতে স্থূলতা ও অশালীনতা যেন স্পর্শ না করে। মন্ময়ী শিরোনাম মানে ওই কথাটা হয়তো কেউ বলেছিল। কিন্তু পাঠক হিসেবে পড়ে দেখা গেলো সংবাদবিবরণীর সূচনা অনুসরন করে শিরোনামটি লেখা হয়নি। শিরোনামের কথাগুলোর সম্প্রসারণ সূচনাতে পাওয়া গেলোনা। সংবাদশীর্ষ কেনো, শিরোনামের মূল ভাবটি দ্বিতীয়, তৃতীয় এমনকি চতুর্থ অনুচ্ছেদেও পাওয়া গেলো না। সম্ভবত পঞ্চম অনুচ্ছেদে গিয়ে একটা লাইন পাওয়া গেলো যেখানে মোটামুটি বলা ছিল যে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন যে অবশেষে সিইসি আজিজ পানি ঘোলা করে খেলেন। ঠিক আছে, ভালো কথা। সেই সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল কারা? তাঁদের একজনেরও নাম নিশানা খুঁজে পাওয়া গেলো না সংবাদবিবরীটিতে। তার মানে রিপোর্টার নিজেই একথা বলেছেন, রিপোর্টার হয়তো সময়ের চাপসহ নানা কারণে এভাবে বলে থাকতে পারেন কিন্তু সম্পাদনার ডেস্ক? তাঁরা কী করলো? সংবাদবিবরণীতে ভালো সম্পাদনার অবকাশ ছিল। তথ্যগত ভুল, নীতি ও শালীনতাকে উপেক্ষা করে মন্তব্যাশ্রয়ী তথ্য, অবয়ব গঠনের (Framing and


www.pathagar.com

Organisation) সমস্যাকে অটুট রেখে সম্পাদনা ডেস্ক সংবাদবিবরণীটি কেন ছেপে দিলো? ভুলের সংশোধনীও (Conigendum বা Eratum) আজকাল পত্রিকাগুলো দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেনা। সংবাদপত্র অফিস এখন আর ট্রেনিং ইনস্টিটিউট নয়। কেউ কাউকে এখানে শেখায় না, বলে দেয়না। সবাই উর্দ্ধশ্বাসে ছুটছে খবরের সন্ধানে, আর খবরের প্রচারে।

গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১০ তারিখে পত্রিকাটির শেষের পাতার আগের পাতায় একটি কোমল সংবাদের (Soft News) শিরোনাম ছিল 'রমনার আকাশে তাজা গুলির শব্দ'। শিরোনামে মনে হলো একটু যেন চাঞ্চল্য যোগ হয়েছে, হৃদয়ে ধাক্কা দেয়ার মতো। পাঠক হিসেবে আমার ধারণা হয়েছিল নিউজটি নিশ্চয়ই হার্ডনিউজ। ধাক্কাটা লেগেছিল এ কারণেই। একুশে ফেব্রুয়ারির আগে রমনার আকাশে গুলি খুব ভালো কথা নয়। ভুল ভাঙ্গলো- যখন দেখলাম লেখাটি ১৯৫২ সালের একুশকে কেন্দ্র করে একজন প্রাক্তন সচিবের স্মৃতিচারণমূলক লেখা। লেখাটির শিরোনাম ও অবস্থানটি এমন ছিল যে তা চট করে বলবেনা যে এটি কোন হার্ডনিউজ নয়। কারণ আশে পাশে আরো হার্ডনিউজ ছিল। তবে প্রায় পাশেই আরেকটি আইটেমও ছিল ১৯৫২ এর একুশকে নিয়েই। অতএব আইটেমটির ট্রিটমেন্ট যেভাবে দেওয়ার দরকার ছিল তা হয়নি। এ ধরনের একাধিক আইটেম একটি বড় চাদর শিরোনামের (Blanket head) অধীনে অথবা বক্সের মধ্যে নিয়ে 'Departmentalise' করা যেতে পারতো। তা হয়নি। সঙ্গতই বোঝা যায়নি সংবাদবিবরণীটি হার্ডনিউজ নাকি সফ্‌ট। বিভিন্ন ক্যাটেগরির সংবাদবিবরণীর তাই বিভিন্ন পাতাজুড়ে যত্রতত্র বিচরণ গোছালো কাজের নির্দেশক নয়। দ্বিতীয়ত শিরোনামে বলা হয়েছিল 'রমনার আকাশে তাজা গুলির শব্দ'। বারুদ যদি তাজাই না হয় তাহলেতো শব্দ হওয়ার কথা নয়। অতএব 'তাজা গুলির' 'তাজা' কথাটা লেখার কোন দরকার ছিল না। অবয়বে ছিল কথাটি। সম্পাদনার অবকাশ ছিল সেখানে। করা হয়নি, নামী লেখক বলে?

বছর কয়েক আগে অভিনেত্রী শাবনূর কোথাও একটা সড়ক দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন। সে সংক্রান্ত রিপোর্টের এক জায়গায় বলা হয়েছিল। '...নিশ্চয়ই আমাদের পুরো পরিবারের ওপর আল্লাহর রহমত আর মানুষের দোয়া ছিল, তাই আজ বেঁচে গেছি। তা না হলে হয়তো সবাইকে লাশ হয়ে ফিরতে হতো।' একটু পরেই আবার লেখা হয়েছে, '...দুর্ঘটনায় শাবনূর মাথায় আঘাত পেয়েছেন। এছাড়া বুকে, চোখে ও মুখে আঘাত লেগেছে। তবে তার মায়ের অবস্থা আশঙ্কাজনক'। প্রথম অংশের অন্তর্নিহিত অর্থের সঙ্গে 'আশঙ্কাজনক' কথাটি লাগসই নয়। প্রাণে বেঁচে যাওয়ার সাথে 'আশঙ্কাজনক' খাটে না। -সেখানে 'গুরুতর কিন্তু স্থিতিশীল' অথবা 'আশংকামুক্ত' বললে দুই অংশের মধ্যে যোগসূত্রটা (Link) অনেক ভালো হতো।

আরেকটি সংবাদে বোরো চাষে সেচদান. আসন্ন গ্রীষ্ম প্রভৃতি কারণে বিদ্যুতের চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে তার ওপর আলোকপাত করা হয়েছিল। এতে উল্লিখিত



www.pathagar.com

সময়ে ঢাকার কোন্ কোন্ জায়গায় অন্তত চারবার করে সংঘটিত লোডশেডিংয়ের কোন সমর্থনযোগ্য তথ্য ছিলনা। বিদ্যুতের ইস্যুটা সামনে এলেই আবেগে ভর দিয়ে যেনো বলতে হবে লোডশেডিং হচ্ছে। লেখাটি মূলত বিদ্যুৎ ও গ্যাসের উৎপাদন ও ব্যবহারের হিসেব নিকেশ কিন্তু শিরোনাম ও সংবাদশীর্ষে যা বলা হয়েছিল অবয়বের সাথে তার কোন মিল ছিল না। এছাড়া লেখাটা ছিল এত দীর্ঘ ও সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসেবে ভরপুর যে আজকালকার পাঠকরা তা আর ধৈর্য্য ধরে পড়তে চায় না।

পত্রিকাটির প্রথম পৃষ্ঠার একটি শীর্ষ-সংবাদ ছিল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে খুন হওয়া ছাত্র মহিউদ্দিনকে নিয়ে। সংবাদবিবরণীর তৃতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল :

'প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, চার পাঁচজন মুখোশধারী সন্ত্রাসী ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে এবং পাথর দিয়ে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ থেঁতলে তাঁকে খুন করে। তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পর সন্ত্রাসীরা দ্রুত পালিয়ে যায়।' এই প্রত্যক্ষদর্শীরা কারা? কোন স্পষ্ট ধারণা ছিলনা রিপোর্টে। ধারণা করি, এরকম স্পর্শকাতর ইস্যুতে প্রত্যক্ষদর্শীরাও পরিচয় জানাতে অস্বীকার করবে, কিন্তু বিবরণের জোর থেকে তো বোঝা যাবে যে রিপোর্টার সত্যিই প্রত্যক্ষদর্শীদের সাথে কথা বলেছেন। এ ছাড়া রিপোর্টে 'দ্রুত' কথাটা একেবারে বেমানান। হত্যা প্রক্রিয়ার ধরন থেকেতো বোঝা যায় খুনীরা যথেষ্ট সময় নিয়েই হত্যাকান্ড চালিয়েছে এবং মৃত্যু নিশ্চিত হবার পরই তারা চলে গেছে। তাহলে 'দ্রুত' কথাটা আসলো কেন? খুনের যে বর্ণনা তা সমর্থন জোগায় যে প্রত্যক্ষদর্শীরা যথেষ্ট সময় নিয়েই তা দেখেছে। কিন্তু ন্যূনতম একজন প্রত্যক্ষদর্শীর নামপরিচয় কিংবা ব্যক্তিচরিত্র (Personal identity বা character) সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণাও দেয়া হয়নি। সূত্রবিহীন (No attribution) উদ্ধৃতি দান পত্রিকায় এখন একটি ফ্যাশন নাকি স্টাইল হয়ে দাড়িয়েছে! আমারা কি সাংবাদিকতাবিষয়ক নীতিসমূহ বিস্মৃত হয়েছি?

অপর একদিন নোবেলজয়ী অমর্ত সেনকে নিয়ে একটি সংবাদবিবরণীর শিরোনাম ছিল 'দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে স্বাস্থ্যসমস্যা গভীর'। শিরোনামটি একেবারেই ফ্ল্যাট, প্রকৃতপক্ষে তথ্যহীন কথা-কোনো নতুনত্ব নেই। পুরো সংবাদবিবরণীতেও প্রকৃত অর্থে সংবাদোপযোগী তথ্য নেই। অমর্ত্য সেন যেহেতু যশস্বী লোক সেই জন্যেই এ সংবাদ। তবে সংবাদবিবরণীতে একটিই মাত্র সংবাদোপযোগী তথ্য ছিল- অমর্ত সেন এখানে 'ভারত-বাংলাদেশ সংলাপে' অংশ নিচ্ছেন-তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। যথাযথ সংবাদোপযোগী ঘটনা (event) নির্বাচন করাটাও সম্পাদনা প্রক্রিয়ার অংশ। ভালো সংবাদ নির্বাচন কেবল নয়, বরং ভালো করে লেখা (Framing and organisation) এবং ভালো পরিবেশনাও একটি সামগ্রি সম্পাদনা প্রক্রিয়ার অংশ। পাতা ভরার জন্য নির্বিচারে প্রায়-গুরুত্বহীন সংবাদ নির্বাচন, ভুল পাতা, ভুল অবস্থান, ভুল শিরোনাম, শিরোনামের সঙ্গে সূচনা ও অবয়বের মিল না থাকা, ভুল ট্রিটমেন্ট দেয়া, ভুলশব্দ প্রয়োগ প্রায়শই হচ্ছে।



www.pathagar.com

বঙ্গবন্ধুর 'খুনীদের' ফাঁসি কার্যকরের বদলে 'ঘাতক' বললে ওই লোকদেরও যেমন সম্মান প্রদর্শন হয়, বঙ্গবন্ধুও আরো মহিমান্বিত হন।

ভুল নাম ঠিকানাও দৃষ্টিকটু লাগে এবং সমস্যা তৈরি করে। ভারতীয় একজন অভিনেত্রীর নাম Sweta Tiwarey কে যখন লিখি 'সুইটা তিওয়ারী' তখন বোঝা যায়, কিছু না জেনেই লিখছি। যেমনি করে না জেনে 'পরশনাথ দাবা' কে 'পারসোনাথ দাবা' বলছি, কিংবা একজন হিন্দু বাঙালীর পদবী Sanyal কিছুমাত্র ধারণা না করে 'সান্যাল'-এর বদলে সানিয়েল' লিখছি। ভারতেরই কেরালার একজন মুখ্যমন্ত্রীর নাম লেখা হয়েছিল 'আছুথানন্দা' ইংরেজি বানানকে অনুসরণ করে। কিন্তু তাঁর নামটি প্রকৃতপক্ষে 'অচ্যূতানন্দ' যেমন করে আগেই বলেছি বাংলাদেশে টেলিভিশনের এক বুলেটিনে ক্রিকেটের পরিভাষা 'Retired hurt' এর বাংলা পড়া হয়েছিল 'হৃদযন্ত্রের গোলযোগ' হিসেবে।

পত্রিকার বিষয়সমূহ এখন বহুবিস্তৃত। পরিবেশনে এসেছে নতুনত্ব, পাঠক বাড়ছে, পড়ার বিষয়ভিত্তিক চাহিদা বাড়ছে, কিন্তু একই সাথে ভুল বাড়ছে লাফিয়ে। বাজারে প্রতিযোগিতার অসুস্থ দৌড়ে প্রায়শই যে আমরা ভুল করছি তা একটু খতিয়ে দেখা দরকার। খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে ভাবা দরকার আমরা কী লিখছি কেমন করে লিখছি।

পরিশেষে বলি, একটি পত্রিকা মূলত বাঁচে সংবাদ ও সংবাদভাষ্যে। অন্যান্য বিষয়ও আসবে। তবে তা যেন সংবাদ ও সংবাদভাষ্যকে গ্রাস না করে। আর সেই সংবাদ ও সংবাদভাষ্য হবে নির্ভুল, নির্মেদ, এবং পরিবেশনা হবে নির্মোহ ও নির্ভার। সাংবাদিকের পেশাগত ভ্রান্তি ও ব্যক্তিগত মর্জিতে যেন পাঠককে ভুল ও বিকৃত এবং অপ্রয়োজনীয় সংবাদসামগ্রী গিলতে না হয়। সংবাদপত্র হচ্ছে সংবাদের পত্র। অপ্রাসঙ্গিক, অপ্রয়োজনীয় ও ভুলে ভরা খিচুড়ি আইটেম দিয়ে সংবাদপত্রের যেনো আমরা সর্বনাশ না করি।

*সূত্র : লেখাটি বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা শিক্ষার্থীদের স্টাডি ট্যুর উপলক্ষে প্রকাশিত সুভেনির-২০১১-এ প্রকাশিত।*



www.pathagar.com

# ভ্রান্তি আমায় ক্ষমা করো

মুদ্রণ সাংবাদিকতায় প্রিন্টার্স ডেভিল (Printer's devil) বা মুদ্রণ প্রমাদ বা বিভ্রাট নামে একটা কথা চালু আছে। অর্থাৎ ডেস্কের লোকেরা তাদের কাজের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যান কাগজে কোন প্রকার ভুল যেন না থাকে; তার পরেও সকালে উঠে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকেরা আবিষ্কার করেন কোন না কোন ভুল হয়েই গেছে। এটি একদিক দিকে প্রমাণ করে যে সাংবাদিকও মানুষ এবং মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়। সাংবাদিকও ভুলে করে থাকে; এর উল্টো পিঠের দিকটা হচ্ছে একটি দাবি- আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা থাকবে কোন প্রকার ভুল যেন না হয়। পাঠকেরা সাংবাদিকদের কাছ থেকে এমনটাই দাবি ও প্রত্যাশা করে। কিন্তু সাংবাদিক যখন শৈথিল্যের কারণে ভুল করে পাঠক তা মেনে নেয় না।

গত শতাব্দীর পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর এমনকি আশির দশকের প্রথমাংশ পর্যন্ত বাংলাদেশের মুদ্রণ সাংবাদিকতায় সনাতনী মুদ্রণ প্রযুক্তি চালু ছিল। মনোকম্পোজ বা লাইনো কম্পোজের মাধ্যমে ধাতব হরফের উৎপাদন ও ব্যবহার তথা স্রেফ সেরদরে কেনা হাতে কাটা (Dice casting) হরফের মাধ্যমে হ্যান্ডকম্পোজের প্রক্রিয়ায় মুদ্রণ বিভ্রাট বা মুদ্রণ প্রমাদ প্রায়শই ঘটতো। এ নিয়ে হাসাহাসি হতো। ফলে মাঝে মাঝে অর্থের বিশ্রি রকমের বিকৃতিও ঘটতো। এ সবই ছিল প্রায় নির্মল অপরাধ; কেউ কিছু মনে করতো না, কারণ না চাইলেও অনেক সময় হয়ে যেতো। যেমন 'গুড়ের পাটা' লিখতে গিয়ে 'পাটা'র 'ট' এর বদলে 'ঠ' লেখায় 'পাঠা' হয়ে গেলে কিছু করার থাকতো না। কারণ হাতে কাটা সীসার হরফের সুনির্দিষ্ট খোপ থাকার পরও কম্পোজিটরের সামান্য বেখেয়ালে 'ট' এর বদলে 'ঠ' দন্ত ন-এর বদলে মূর্ধন্য 'ণ' কিংবা দন্ত'স' এর বদলে তালব্য'শ' লিখে অনেক বিপত্তি হয়েছে সনাতন সাংবাদিকতায়, এজন্য প্রুফ রিডারদের অপরিহার্যতা উপলব্ধি করা যায়। তারপরেও তাদের করা অনেক ভুল নিয়ে প্রবীনেরা এখনও অনেক হাস্যরস করেন। এখনও প্রচুর ভুল হয় এজন্য উচ্চমানের সম্পদনা বিভাগ জরুরী কিন্তু তা আমরা ক্রমবিস্মৃত হচ্ছি।


www.pathagar.com

এ সময় কেবল সাংবাদিকদের নিরাপরাধ ভুল ও একেবারেই সনাতনী প্রযুক্তির কারণে কথিত ওই সকল মুদ্রণ প্রমাদ ঘটতো তা নয়, বরং কথিত মুদ্রণ প্রমাদের ছদ্মাবরণে ইচ্ছে করে আজেবাজে কথাও বলা হতো। আবার এমন কিছু-কিছু স্যাটায়ার করা হয়েছে তা শোভনতার সীমা মাঝে মাঝে অতিক্রম করে গেছে। যেমন পাকিস্তান আমলে রাজনৈতিকভাবে বেকায়দায় পড়ে যাওয়া একজন রাজনীতিককে উদ্দেশ্য করে একজন বড় সাংবাদিক লিখেছিলেন 'ফাটা বাঁশে বিচি আটকাইয়া গিয়াছে'। এর চেয়েও খোলামেলা কথা বলা হয়েছে যা সব সময় পঠন বা শ্রুতিযোগ্য নয়। সম্প্রতি একজন নামী নাট্যকারের নির্মিত একটি নাটক গত (২০১১) ঈদুল আজহার সময় কোন চ্যানেলে দেখানো হবে বলে পত্রপত্রিকার বিনোদন সূচীতে দেখে একটু চমকে গিয়েছিলাম। নাটকটির নাম হচ্ছে 'ভোঁদাই'। এ বিষয়ে একই গ্রন্থের আরেকটি জায়গায়ও সামান্য বলেছি। শব্দটি ষাট-সত্তরের দশকের স্কুল কলেজের কিছু ছেলে সীমিত মাত্রায় ব্যবহার করতো। আশির দশকে শব্দটি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদেরও অবলীলায় ব্যবহার করতে দেখে অবাক হয়েছিলাম। এখন মিডিয়ার সকল শ্রেণীতেই তা নির্বিচারে ব্যবহার হচ্ছে। এমন আরো কিছু শব্দাবলী ব্যবহার করা হচ্ছে যেমন 'পোংটা' কিংবা 'পোংটামি' যা নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা 'জেন্ডার সংবেদনশীলতা' বিষয়ে আরো গবেষণা করার অফুরন্ত সুযোগ পাচ্ছেন।

আমার এ নিবন্ধের ফোকাস এটি নয় বরং সামগ্রিকভাবে মুদ্রণ ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া অবলীলায় যে সকল ভুল ভ্রান্তি করে যাচ্ছে তা শুধুমাত্র 'Printer's devil' অথবা 'Brodcaster's devil'-এর আওতায় ফেলে পাড় পাওয়া যে যাবে না সেটাই হচ্ছে মূল বিবেচ্য বিষয়। ভুল হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন মাত্রার এবং এগুলো হয়ে যাচ্ছে সাংবাদিকতার কর্পোরেট সংস্কৃতি ও বিশ্বায়নের সওয়ার হয়ে দ্রব্যের গুণের দিকে না তাকিয়ে যত বেশি সম্ভব আকর্ষণ সৃষ্টিকারী দ্রব্য ভোক্তার কাছে পৌঁছে দেয়ার অনৈতিক দৌড়ের কারণে। সঙ্গতই 'সবার আগে পৌঁছাবে' এ ধরনের নেতিবাচক প্রতিযোগিতায় আমাদের মিডিয়ায় প্রতিনিয়ত ভুল হচ্ছে এবং সে প্রেক্ষাপটে সঠিক তথ্যের পাশাপাশি সংবাদপত্র থেকে যে শেখারও অনেক কিছু আছে তা থেকে আমরা ভোক্তারা ক্রমাগত বঞ্চিত হচ্ছি।

লেখায় অস্পষ্টতা ও স্ববিরোধিতা এবং তথ্যের ঘাটতি ও কোন বিবৃতির প্রমাণযোগ্যতা নিয়ে কয়েকটি ভ্রান্তি প্রথমেই তুলে ধরা যেতে পারে। আল-কায়েদা নেতা লাদেন নিহত হবার সম্ভবত একদিন পর একটি নামী পত্রিকা লিখলো 'লাদেন চরম অর্থকষ্টে ছিলেন', শিরোনামের সঙ্গে সংবাদ শীর্ষের সম্পর্কও ছিল। একে সমর্থন করার জন্য সংবাদবিবরণীর মধ্যাংশে একটি দুর্বল সূত্রেরও উল্লেখ করা হয়েছিল, কিন্তু লাদেন কিভাবে বা কেন অর্থকষ্টে ছিলেন তা সে পত্রিকার নিউজডেস্কের সেদিনের তৈরি করা ওই সংবাদবিবরণীতে স্পষ্ট ছিলনা। বরং ওই



www.pathagar.com

রিপোর্ট অনুযায়ী সেসময়ে সৃষ্ট পরিস্থিতির কারণে লাদেন কী মাত্রায় গৃহবন্দী ধরনের জীবন যাপন করছিলেন তার একটা বর্ণনা পাওয়া যায় মাত্র। অর্থাৎ যে শিরোনাম ও সংবাদশীর্ষকে কেন্দ্র করে ওই লেখাটি তার স্পষ্ট প্রতিফলন সংবাদের পুরো অবয়বে ছিল না, বরং 'লাদেন অর্থকষ্টে ছিলেন' বলে লেখক (পত্রিকা) সম্ভবত অজান্তেই একটু চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে পাঠকের অনাহুত সহানুভূতি আদায় করে পত্রিকার 'বিক্রির আকর্ষণ' (Selling appeal) বাড়ানোর চেষ্টা করেছেন।

অপরদিকে একটি নামী ইংরেজি পত্রিকায় আটদশ বছরের একটি গৃহপরিচারক বস্তুত বন্দীদশা থেকে বের হতে গিয়ে কেমন করে একটি বাড়ির সাততলার জানালা গড়িয়ে নিচে পড়ে গেলো নাকি তাকে গৃহমালিকা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো তা খুব একটা স্পষ্ট ছিলো না; কিন্তু তার চেয়ে বরং বড় ত্রুটি ছিল খবরের প্রথম দুটো অনুচ্ছেদের পরস্পরবিরোধিতায়। সংবাদবিবরণীর বাংলা মর্মার্থটি ছিল এরকম : অমুক এলাকায় একটি ছেলে সাততলার জানালা দিয়ে নিচে পড়ে গিয়ে গুরুতর জখম হলেও মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়েছে (Deceived to his death)। বিবৃতিটি ধারণা দেয় যে ছেলেটি অন্তত প্রাণে বেঁচে গেছে। কিন্তু তার পরের অনুচ্ছেদেই বলা হলো : গরীব (Poor) ছেলেটি এখন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। যে রিপোর্টার এটি লিখলেন তাঁর সম্ভবত নজর এড়িয়ে গেলো যে তিনি একটি দ্ব্যর্থবোধক কথা লিখলেন এবং সহসম্পাদকও তা সংশোধনের প্রয়োজন বোধ করেননি অথবা তা শনাক্ত করতে সক্ষম হননি।

একটি ইংরেজি পত্রিকায় টাঙ্গাইলের এক তরুনী শিক্ষিকার সম্ভাব্য অপহরণ (নাকি স্বেচ্ছায় পলায়ন) ঘটনার সংবাদশীর্ষ লেখা হলো :

'Police on Tuesday rescued the female school teacher who was abducted in Ghatail Upazila on April 17' এখানে ব্যকরণগত কারণে 'the' কথাটার বদলে 'a' হবে।

পরের অনুচ্ছেদেই বলা হলো : 'Shathi Ghosh, 22, an assistant teacher of Kuripara Goverment Primary School fled from a house in Tangail town, police said'.

পরের দিকে আরেকটি অনুচ্ছেদেও বলা হলো 'A gang forceibly picked up Shathi...'। মেয়েটিকে কী অপহরণ করা হয়েছিল নাকি সে পালিয়েছিল?

এ ধরনের আরো দু-একটি নমুনা তুলে ধরা যেতে পারে। যেমন একটি পত্রিকার একটি খবরের একটি লাইন ছিল এরকম 'গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে ছেড়ে দেয়া হয়'। গুরুতর আহত হবার পর প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে কাউকে ছেড়ে দেয়া যায় কিনা


www.pathagar.com

ভেবে দেখার বিষয়। অপর একটি সংবাদবিবরণীতে বলা হলো 'বিপরীত দিক থেকে আসা দুটো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে...'। বিপরীত দিক থেকে এলেইতো মুখোমুখি সংঘর্ষ হতে পারে। অন্যভাবে হওয়ার সুযোগ কম। এছাড়া কতগুলো ভ্রান্তি আছে যা আমরা ভালো করে খেয়াল করিনা। যেমন লিখছি 'খেলা চলাকালীন সময়ে'। এটা হয় লিখতে হবে 'খেলার সময়ে' অথবা 'খেলা চলাকালে'। টিভিতে যেমন কোন খেলার সময় (বিশেষত ক্রিকেট) প্রায়শই বলা হয় 'শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত খেলা চলছিল অথবা অমুকে ব্যাট করছিল'। ঝড় বৃষ্টি, ভূমিকম্প, মারামারি না হলে তো খেলা চলতেই থাকবে। এটা বলার কি আছে? আবার কতগুলো শব্দ আমরা ক্রমাগত ব্যবহার করতে করতে পচিয়ে ফেলেছি। যেমন 'নির্ভীক সাংবাদিক' 'মেধাবী ছাত্র', 'ঐতিহাসিক জনসভা' 'লাখ লাখ লোকের জনসমাগম', 'রোড ম্যাপ'। অথবা ৯/১১ হয়েছিল বলে সব কিছুতে ১১ লাগানো বা বলার চেষ্টা। সাংবাদিকতার ভাষায় একে বলে Fetish অর্থাৎ কোন কিছুকে নিজ স্বার্থে অনাহুত মহিমান্বিত (Glorify) রূপে দেখানোর চেষ্টা। এক রিপোর্টে যেমন বলা হলো, শীতকাল এসেছে অথচ ঠান্ডা পড়ছে না, পরীযায়ী পাখিরাও আসছে না। পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য এসব হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ তখন অগ্রহায়ণ মাসের শুরু কেবল।

এবার আমরা কয়েকটি শিরোনাম দেখি যেগুলো টেকনিক্যাল কারণে ত্রুটিপূর্ণ। একটি নামী বাংলা পত্রিকার একটি শিরোনাম লেখা হয়েছে :

স্রোতহীন হয়ে ক্ষীণ ধারায়
বইছে এখন প্রমত্তা তিস্তা

বলছি 'প্রমত্তা তিস্তা' অথচ স্রোতহীন ক্ষীণ ধারায়'। শিরোনামটি বরং হতে পারতো 'প্রমত্তা তিস্তা এখন স্রোতহীন ক্ষীণধারা'। শিরোনামটি একেবারে ভুল হয়েছে এমন বলা যাবে না কিন্তু টেকনিক্যালী ত্রুটিযুক্ত। আরেকটি শিরোনামে বলা হলো যে 'শিশুমাতৃস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে চাকরি হারালেন ১৪ চিকিৎসক'। মনে হবে যেন ১৪ জন চিকিৎসক ওই ইনস্টিটিউটের ১৪ চিকিৎসক চাকরি হারালেন' অথবা 'চাকরি হারালেন শিশু-মাতৃস্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের ১৪ চিকিৎসক। অপর একটি বাংলা শিরোনাম লেখা হলো :

লোকমান হত্যার আসামী এসপি রাজুর
রিমান্ড ও জামিন আবেদন নামঞ্জুর

রিমান্ড ও জামিন আবেদন নামঞ্জুর কথাটি অস্পষ্ট ও পরস্পরবিরোধী। একদিকে রিমান্ডের জন্যই জামিনের আবেদন এবং সেটা মঞ্জুর। তার রিমান্ডের জন্যই জামিনের আবেদন এবং সেটা মঞ্জুর হয়নি। অতএব শুধুমাত্র দ্বিতীয় অংশটির ওপর মনোনিবেশ করলেই হতো। আরেকটি শিরোনাম 'চিরসমাহিত স্কয়ার চেয়ারম্যান


www.pathagar.com

স্যামসন'। কাউকে সমাহিত করা হলে তা চিরকালের জন্যই করা হয়। অতএব চির কথাটি এখানে প্রয়োগযোগ্য নয়। বরং 'চিরনিদ্রায়' চির কথাটি লাগসই। এইবার একটি শিরোনাম থেকে শিরোনামের কাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে আমাদের টেকনিক্যাল দুর্বলতার দিকটি স্পষ্ট করা যেতে পারে। শিরোনামটি ছিল :

সউদী আরবে আট বাংলাদেশীর
শিরচ্ছেদ

একটি কথা মাথায় রাখতে হবে শিরোনামের দৈর্ঘ্য কলামের প্রস্থ দ্বারা সর্বদাই নিয়ন্ত্রিত। প্রযুক্তির কারণে কিছু সুবিধা পাওয়ার পরও কলামের (সেটা এক দুই তিন যে কয় কলামেই হোক) মধ্যবর্তী জায়গার (space) মধ্যেই একটি শিরোনাম আটাতে হয়। এখন লভ্য একটি জায়গায় কয় লাইনে আমি শিরোনাম লিখবো, কয় কলামে লিখবো, কোন স্টাইল বা কাঠামোতে লিখবো এ সম্পর্কে ভালো ধারণা না থাকলে শিরোনামের চেহারা ওপরের শিরোনামের মতো হবে। প্রথম লাইনটি যেমন বিরাট, দ্বিতীয়টি তার তুলনায় অতীব ছোট। শিরোনামটি এমন ছিলনা যে 'শিরচ্ছেদ' কথাটি প্রথম লাইনের মতো সমান বিস্তৃত কিংবা তাকে নানা অলংকারে সজ্জিত করে প্রদর্শন করা হয়েছে। বরং 'বাংলাদেশীর' কথাটা দ্বিতীয় লাইনে নিয়ে এলে দু'লাইনের মধ্যে একটা ভারসাম্য থাকতো। যদিও দ্বিতীয় লাইনটি সামান্য বড় হতো তার Character বা Unit সংখ্যার কারণে কিন্তু তাতে কোন অসুবিধা হতো না। কারণ শিরোনামের দ্বিতীয় লাইন প্রথম লাইন থেকে বড় হতেই পারে। কিন্তু লাইন দুটোতে প্রায় সমান হওয়ায় Unit এর সংখ্যা কমে যেতো এবং শিরোনামটির Type আরো ৫-১০ পয়েন্ট বাড়িয়ে এর ট্রিটমেন্টের মাত্রা যথেষ্ঠ পরিমাণ বাড়ানো যেতো। এটা হয়নি শিরোনামের যথাযথ লেখা ও ট্রিটমেন্ট দেয়ার টেকনিক্যাল বিষয়টি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকার কারণে।

আরেকদিন একটি খবরে 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংখ্যালঘুরা বৈষম্যের শিকার হচ্ছে' শিরোনামের সঙ্গে সংবাদবিবরণীর কোন মিল ছিল না বরং এমন কিছু উদাহরণ আনা হয়েছে যে কেউ হয়তো বলবে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংখ্যাগুরু মুসলিম কিংবা সংখ্যালঘুদের মধ্যে সংখ্যাগুরু হিন্দুদের ধর্মীয় বই পুস্তক নিয়েই বরং পাঠ্যক্রম নেই। একটা খবর শিরোনাম সূচনা ও অবয়ব নিয়ে। কোনটার সঙ্গে যদি কোনটার মিল না থাকে তবে তা লিখে লাভ কি? এ সবই সম্পাদনার ঘাটতিকে ইঙ্গিত করে।

টেলিভিশন মাধ্যমে শুদ্ধ উচ্চারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। টেলিভিশনে যাঁরা যে ভাবে যে অবস্থান থেকেই পারফর্ম করুন না কেন তাঁদের সবার (Performence) জন্যই এটি প্রযোজ্য। যাঁরা টিভির প্রেজেন্টার তাঁদের বলার ধরন মোটামুটি ভালোই যদিও দু'চার জন আঞ্চলিক টানে কথা বলেন। কেউ দ্রুত পড়েন ফলে দাড়িকমা তথা Pause ভালো করে বোঝা যায় না। কেউ কাটা কাটা করে পড়েন


www.pathagar.com

ফলে তা শ্রুতিমধুর লাগেনা। কিন্তু সবচেয়ে বিদঘুটে লাগে যখন তারা স্পষ্ট ও শুদ্ধ উচ্চারণ করেন না। তবে বেশিমাত্রায় অস্পষ্ট উচ্চারণ করে থাকেন রিপোর্টাররা। আরেকদিন শুনলাম একজন প্রেজেন্টার 'প্রয়াত'কে উচ্চারণ করছেন 'প্রয়াত্' হিসেবে আবার পথিকৃৎকে উচ্চারণ করছেন 'পথিকৃতো' হিসেবে যেমন করে আরেকজন 'অভিজাত'কে বলছেন 'অভিজাত্'। অন্য একজন 'শৈলপ্রপ্রাত'কে বলছেন 'শৈল্প্রপাত'। মমতা ব্যানার্জিকে কেউ কেউ হিন্দি স্টাইলে 'মম্তা' ব্যানার্জিও বলছেন। 'স্পষ্ট'কে বলছে 'এস্পষ্ট'। 'আহবায়ক' কে বলছে 'আহব্বায়ক'। প্রকৃত উচ্চারণ আওভায়ক' অথবা 'আওভান'; আরেক রিপোর্টার সেদিন 'অস্থিতিশীল'কে উচ্চারণ করলেন 'অয়েস্থিতিশীল'। যুক্তরাষ্ট্রের আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান দলের সম্ভাব্য প্রার্থী মিট রমনি (উচ্চারণটা আসলে 'রম্নী') কে একজন টিভি রিপোর্টার নির্দ্বিধায় 'রমোনী' উচ্চারণ করলেন। যেমন করে ঢাকায় মনমোহন সিংয়ের সময় অনেক চ্যানেলেই তাঁর নাম উচ্চারণ করা হয়েছে 'মনোমোহন' সিং। এতে অর্থের বিকৃতি ঘটে। কেউ কেউ তাকে 'সিংহ' বলেও উচ্চারণ করেছে। সেটিও ভুল।

আরেকদিন একটি বাঙলা পত্রিকায় বৌদ্ধ ধর্মগুরু অতীশ দীপংকরের ওপর একজন নামী লেখকের লেখায় ওই পন্ডিতের মৃত্যু সাল একবার ১০৫৪, আরেক বার ১০৫২ লেখা হয়েছে। একই লেখার ইংরেজি অনুবাদ আরেকটি ইংরেজি পত্রিকার একটি ম্যাগাজিনে একই ভুল করা হয়েছে। সম্পাদনা বিভাগের লোক কি কোথাও নেই?

টেলিভিশনে ভুলের যে হিড়িক চলছে তার আরো কিছু নমুনা উল্লেখ করা যেতে পারে। গত বছরে ৮ অক্টোবর এক নামী টেলিভিশন চ্যানেলের স্ক্রলবারে (একাডেমিক টার্ম হচ্ছে Telop) বলে যাচ্ছিল 'ট্রেনে কেটে গাজিপুরের মৌচাকে একজন নিহত'। এটা সঠিক নয়। ছোট করতে গিয়ে বিকৃত করা ঠিক নয়। এখানে 'ট্রেনে কাটা পড়ে' বলতে হবে অথবা একদম সোজা করে বলতে হবে 'গাজিপুরের মৌচাকে একজন ট্রেনে কাটা পড়েছে'। এর মমার্থ হলো সে মারা গেছে। একদিন ভূমিকম্প ঢাকাসহ সারা দেশকে ভালো করে নাড়া দিয়ে গেলো। টেলিভিশন মারফত বোঝার চেষ্টা করলাম ভূমিকম্পের মাত্রাটা কেমন ছিল। এক চ্যানেল তাদের ব্রেকিং নিউজে স্ক্রলবারে দেখাতে শুরু করলো ঢাকাসহ বাংলাদেশে তীব্র ভূমকম্পন অনুভূত। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৬ দশমিক ৮। বলে কী! ৬.৮ মাত্রার ভূমিকম্পে ঢাকা অক্ষত রয়ে গেলো? প্রকৃতপক্ষে বহুদূরে সিকিমে ভূকম্পনের উৎপত্তিস্থলে এর মাত্রা ছিল ৬.৮। ঢাকায় এটা ছিল ৪ এর কাছাকাছি। আরেকদিন এক চ্যানেল তার ব্রেকিং নিউজে বললো 'খিলগাঁও ফ্লাইওভার দেবে গেছে'। তার পাঁচ সাত মিনিট পরে অন্যেরাও ব্রেকিং নিউজ বলা শুরু করলো। টেকনিক্যালী তাদের জন্য সেটা ব্রেকিং নিউজ নয়। ঠিক আছে, অন্যেরাও যখন ব্রেকিং নিউজ বলা শুরু করলো তখন প্রকৃতই যে চ্যানেল নিউজটা ব্রেক করেছে



www.pathagar.com

তারা বাংলার পাশাপাশি ইংরেজিতেও নিউজটি দিলেন এইভাবে 'Khilgaon flyover devastated'; খিলগাঁও ফ্লাইভার ধ্বংস হয়ে গেছে? কাঁরা লেখে আর কাঁরা এডিট করে? কেউ নেই দেখার? যেদিন শিল্পী অজিত রায় মারা গেলেন তার ঘন্টা খানেক আগে এক টিভি চ্যানেল তাঁকে মেরে ফেললো। পরে তা কায়দা করে সংশোধন করলো। তারও পরে যখন তিনি সত্যিই মারা গেলেন তখন কর্তব্যরত চিকিৎসকের উদ্ধৃতি দিয়েই কেবল জানানো হলো এবং সেটাই ছিল সঠিক। ভারতে সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণকে আগাম মেরে ফেলার জন্য সেদেশের পার্লামেন্টে তোলপাড় হয়ে গিয়েছিল। বিশ্বকাপে একটা শিরোনাম লেখা হলো 'আজ ভারত-বধের দিন'। এ কেমন শিরোনাম! সাংবাদিকতার নীতি মেনে চলাটা একটি জরুরী বিষয় যা আমরা প্রায়শই অনুসরণ করিনা।

এ লেখাটা শেষ করা যেতে পারে সংবাদের ট্রিটমেন্ট নির্ধারণে আমাদের ব্যর্থতা প্রসঙ্গে। দুটো সময়ের উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। গত বছরের বিশ্বকাপ ক্রিকেটের সময় খেলা নিয়ে আমরা এতটাই বুঁদ হয়ে ছিলাম যে কোন পত্রিকা দেখে মনে হয়নি ক্রিকেট ছাড়া এ বিশ্বে আর কোন ঘটনা ঘটছে। গ্রুপ পর্যায়ের খেলায় ইংল্যান্ডকে দু'উইকেটে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালের আশা বাংলাদেশ জাগিয়ে রাখার দিন অন্য কিছু না হলে তা অবশ্যই বড় সংবাদ। কিন্তু সেদিনই জাপানে সাম্প্রতিককালের বিরাট ভূমিকম্পে হাজারো মানুষের মৃত্যুর পাশাপাশি প্রশান্ত মহাসাগর জুড়ে ৩৩ ফুট উচু সুনামীতে ভেসে গিয়েছিল ঘর বাড়ি, জাহাজ, ট্রেন অনেক কিছু। ৮ দশমিক ৯ মাত্রার ওই ভূমিকম্প ফুকুশিমা পারমানবিক চুল্লিতে আঘাত হানায় বায়ুমন্ডলে তেজস্ক্রিয় ছড়িয়ে পড়েছিল। সুনামীর ধাক্কাটা বঙ্গোপসাগর পর্যন্তও আসার আশংকা ছিল। এই বিশাল ঘটনাকে বাংলাদেশের অধিকাংশ বাংলাভাষার পত্রিকা যথাযথ ট্রিটমেন্ট দিতে ব্যর্থ হয়েছিল। ট্রিটমেন্ট কিসের ওপর দিতে হয় তার কতগুলো টেকনিক্যাল শর্ত আছে সেগুলো না বুঝলে Selling point-কে মাথায় রেখেও পত্রিকা শুধু আবেগে চলে না। পত্রিকার 'Personality' তৈরি হয় অন্যভাবে। মনমোহন সিংয়ের ঢাকা সফরের সময় দেশের বা এ অঞ্চলের রাজনীতি আমাদের স্বার্থ এ সমস্তকে ভুলে মনমোহনের সফরের ফুটবলার মেসিকে নিয়ে আমরা বেশি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পরেছিলাম। উল্লিখিত দুটো ঘটনা নিয়ে যখন আমাদের মোহভংগ ঘটেছে ততক্ষণে উপলব্ধি করতে কষ্ট হয়েছে সংবাদের বিচারে দুটো বিরাট ঘটনাকে যথাযথ ট্রিটমেন্ট দিতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। পরে সে দুটো ঘটনার ফলোআপ দিয়ে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু ভ্রান্তি ভ্রান্তিই থাকে। দুধের স্বাদ ঘোলে মেটেনা।



www.pathagar.com

# নামে কী আসে যায়

একটা কথা অনেক সময়ই বলা হয়ে থাকে 'নামে কী আসে যায়' (What's in a name?)। হ্যাঁ নামে কিছু আসে যায় না। কিন্তু নামেই আবার অনেক কিছু এসে যায়। সবাই নিজের নামকে ভালোবাসে। প্রতিটি মানুষই নামের কাঙাল। কলংকের কালিমাহীন তাঁর সুনামকে সে গৌরবময়, অক্ষয় ও আকাঙ্খিত সম্পদ বলে মনে করে এবং সত্যকার অর্থে ঐ সুনাম নামক পরম ধনের ওপর সে কোন ধরনের কলংক আরোপের একান্ত বিরোধী।

মানুষ নামের জন্য কতখানি কাঙাল, তার গভীরতা আঁচ করা যায় শেকসপিয়ারের 'ওথেলো' নাটকের একটি অংশ থেকে। সে নাটকের নায়ক ওথেলো এক জায়গায় বলেছেন, '...But he who filches' (কেড়ে নেয়া) from me my good name robs me of that which not enriches him and makes me poor indeed' অর্থাৎ সে আমার সুনাম কেড়ে নিয়েছে। কেড়ে নেয়া সেই সুনাম তাকে সমৃদ্ধ করেনি। কিন্তু আমাকে নিঃস্ব বানিয়ে ছেড়েছে।

এতো গেলো অন্যের নাম কেড়ে নিয়ে নাম করার চেষ্টার কথা। কিন্তু সে চেষ্টা যে সফল হয় না তা উপরের উদ্ধৃতি থেকেই আমরা বুঝতে পারছি। কিন্তু কেড়ে নিয়ে নয়, বরং অন্যের নাম ধার ও ধারণ করে এ জগত সংসারে অনেকেই বড় মহাজনে পরিণত হয়েছেন তার দু'একটি উদাহরণ আছে বৈকি। এখানে যে দু'জনের নাম উল্লেখ করা যায় যাঁরা প্রকৃতপক্ষে অন্যের নাম ধারণ করেননি বরং অন্যের নাম তাঁদের মাথায় এসে ভর করেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের এই 'ক্লিনটন' পদবীটি তাঁর নিজের নয়, উত্তরাধিকার সূত্রেও নয় বরং এ পদবী তাঁর সৎ পিতার থেকে ধার নেয়া। জন্মের আগেই পিতাকে হারিয়েছিল বিল। বাবার নামের সঙ্গে মিল রেখে তাঁর নাম রাখা হয়েছিল উইলিয়াম জেফারসন ব্লিদি, ডাক নাম বিল। কিন্তু সৎপিতা রোজার ক্লিনটন যখন তাঁর মায়ের ওপর খবরদারি করতে শুরু করেন তখন সৎপিতার 'ক্লিনটন' পদবীটিও তাঁর ঘাড়ে এসে চাপে। অথচ ক্লিনটন নামটি এখন আপন মহিমায় উজ্জল। অন্যভাবে বলা যায়, 'ক্লিনটন' নামটি না এলে এ জগত সংসারের একটি খন্ডাংশ অপূর্ণ থেকে যেতো।



www.pathagar.com

দ্বিতীয় যে মহাজন অন্যের পদবীতে নিজের নামকে দারুণ মর্যাদাশালী করেছেন তিনি ভারতের সংবিধান প্রণেতা ভীমরাও আম্বেদকার। এই 'আম্বেদকার' পদবীটি তাঁর নিজের নয় তাঁর এক শিক্ষকের। ভীমরাও ছিলেন 'অচ্ছুত'। হরিজন ছিলেন বলে তাঁর পিতৃদত্ত 'সাকপাল' পদবীটাও যেন 'অচ্ছুত' হয়ে পড়েছিল। স্থানীয় ভালো স্কুলে হয়তো পড়াশুনাও হতো না তাঁর, আর তাই তাঁর শিক্ষক আরেক 'আম্বেদকার' সাহেব নিজের পদবীটি তাঁর একজন প্রিয় ছাত্রের মাথায় তুলে দিলেন। আর এ ঘটনাটাই বিশ্বসংসারে ভীমরাওয়ের মতো বিদ্বজনকে উপহার দিয়েছিল।

এই পদবী বা নাম হারিয়ে যাবার ঘটনা আমাদের দেশেতো অহরহ চলছে। গ্রামে গঞ্জে (এমনকি শহরাঞ্চলেও) অজস্র মহিলা ছেলেপুলে হবার পর তাদের পিতৃদত্ত নামখানি কখন যে হারিয়ে ফেলেন তা তাঁরা নিজেরই বুঝতে পারেন না। পাড়াপড়শিরাতো বটেই, স্বয়ং স্বামী প্রবরও লজ্জায় স্ত্রীর নাম উচ্চারণ করতে পারেন না। তখন তারা কেউ হয়ে যান দুলালের মা, কেউ আলালের। এ নামেই এক সময় এ জগৎসংসার থেকে তাঁদের বিদায়, এমনকি বিদায়ের পরও 'অমুকের মা' নামেই পরিচিত থাকেন। অর্থাৎ আগেই সূত্র ধরে বলা যায়, নামে কিছুই আসে যায়না। কিন্তু কোন ভদ্রমহিলাকে যদি 'অমুকের মা' বলে ডাকা হয় তাহলে সেটা সংবাদপত্রের ভাষায় অপলেখ'র (Libel) সামিল হতে পারে। অতএব বলতেই হয় নামে অনেক কিছুই আসে যায় বৈকি।

যদিও একথা মানতেই হয় যে পত্রপত্রিকায় তথা গণমাধ্যমে কোন কোন সময় মানুষের নামের উচ্চারণ বা বানানের মধ্য দিয়ে কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রয়াস চলে থাকে। অথবা নিজ প্রতিষ্ঠানের নীতি অনুসারে কিংবা অজ্ঞাতবশত কারো কারো নাম বিকৃত বানানে লিখা হয়ে থাকে। যেমন বিরোধী দলীয় নেত্রী (বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী) শেখ হাসিনা ইংরেজিতে তার নাম কেমন করে লিখে থাকেন সেটা জানা থাকুক বা না থাকুক বাংলায় তাঁর স্বাক্ষরিত নাম আমরা অহরহ দেখার পরও কোন কোন পত্রিকায় তাঁর নাম 'শেখ হাছিনা' লেখা হয়। ১৯৯০-'৯১ সালে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের নাম 'শাহাবুদ্দিন আহমদ' লেখা হতো কোন কোন পত্রিকায়। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট যখন তাঁর নামটা 'দস্ত স' দিয়ে লিখেন তখন আমরা কেন 'তালব্য শ' বসাই! জানি না, যাঁরা এভাবে লেখে তাঁদের এভাবে লেখার হেতুটি কি?

কিছু কিছু নাম নিয়ে অবশ্য আমাদের (বিশেষ করে সংবাদপত্রওয়ালাদের) প্রায়শই অসুবিধা হয়, কিন্তু আমাদের দেশের প্রচলিত ধারা ও নিয়ম কানুন অনুসারে যদি আমরা সেই নামগুলো লিখি তাহলে অসুবিধেটা কোথায়? অবশ্য আমাদের মতো করে লেখার পেছনে অবশ্যই এমন কোন ইঙ্গিত থাকবে না যে আমি কারো নাম লেখার সময় তাঁকে কটাক্ষ করে লিখছি। গত বছর মে দিবসে সার্কের অন্যতম



www.pathagar.com

নেতা এবং শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট 'রানাসিংগে প্রেমাদাসার' প্রাণ কেড়ে নিলো তামিল গেরিলারা। তিনি কিভাবে নিহত হলেন সে ভিন্ন প্রসঙ্গ। কিন্তু তাঁর নামের উচ্চারণ নিয়ে একটু খটকা আছে অনেকের কাছেই। ইংরেজিতে তাঁর নাম যেভাবে লেখা আছে বাংলায় হুবহু সেভাবে লিখলে রানাসিংগে প্রেমাদাসাই হয়। কিন্তু এতে করে তাঁর নামের বাংলা অর্থগত দিকটি অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। Semantics (শব্দার্থ বিজ্ঞান) অনুসারে তাঁর নামের বাংলা বানানটা হওয়া উচিত 'রণসিংহ প্রেমদাস'। রণে যিনি সিংহের ন্যায় তেজোদীপ্ত বা বলীয়ান তিনিই রণসিংহ। আর কেউ যদি প্রেমের প্রতি ঘোরতর নিষ্ঠাবান বা প্রেমের দাসানুদাস হন তবেই তিনি প্রেমদাস। গত এপ্রিলে ঢাকায় সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে এসে তিনি শ্রীলংকার সাথে বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও বংশানুক্রমিক যোগাযোগের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন যে আড়াই হাজার বছর পূর্বে বাংলাদেশের যে নৃপতি বিজয়সিংহ সিংহল জয় করেছিলেন তিনিই ছিলেন তাঁদের পূর্বপুরুষ। সেই বিজয়সিংহ বিজয় সিঙ্গে হননি। তাহলে রণসিংহ কেন রাণাসিংগে হবেন?

শ্রীলংকার যিনি নতুন প্রেসিডেন্ট হয়েছেন তাঁর নাম ডিবি বিজেতুঙ্গা (DB Bijetunga)। আসলে তা হওয়া উচিত ডিবি বিজয়তুঙ্গ। বিজয়ের তুঙ্গে আছেন যিনি তিনিই বিজয়তুঙ্গ। তাঁর নামের প্রথম অংশটি অর্থাৎ 'D' দিনগিরি অথবা দীনগিরি। দিনগিরির অর্থ সূর্যদেবতা আর দীনগিরির অর্থ বিশ্ব প্রতিপালক। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর নামের দ্বিতীয় অংশটি অর্থাৎ 'B' মানে হচ্ছে হয় 'বন্দা' অথবা 'বান্দা'। তবে কিছু সঙ্গত কারণেই 'বন্দা' হওয়া উচিত 'বন্দনা' অর্থে, 'বান্দা' নয়। বান্দা হচ্ছে চাকর, বন্দা হচ্ছে তোমার গুণকীর্ত্তণ করি। পুরো অর্থে হে সূর্যদেবতা অথবা বিশ্ব প্রতিপালক তোমাকে নমস্কার করি।

প্রেসিডেন্ট প্রেমদাসের সঙ্গে তার একজন ঘনিষ্ট সহযোগী মারা গেছেন। ইংরেজি থেকে হুবহু লিখলে তাঁর নামটা হওয়া উচিত এ.এস. মহিদীন। সম্ভবত তিনি মুসলমান। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর নামটি লেখা উচিত ছিল এ. এস. মহিউদ্দিন। এসব নামগুলো আমরা বাংলারীতি অনুযায়ী আমাদের মতো করে লিখলে শুনতেও ভালো লাগে, কটাক্ষ করার অবকাশও বোধ হয় তাতে নেই।

ইংরেজিতে অনেকেই অনেক রকম করে তাঁদের নাম লিখে থাকেন। আমাদের শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমিরুদ্দিন সরকার তাঁর নামের পদবীটা ইংরেজিতে লিখেন 'Sircar' এ ভাবে। এটাকে যদি আমরা বাংলায় হুবহু লিখতে গিয়ে সিরকার লিখি তাহলে তা শুদ্ধতো হবেই না বরং তাঁকে কটাক্ষ করা হবে। ভারতের মৌলবাদী হিন্দু সংগঠন 'শিবসেনা'র নেতার নাম ইংরেজিতে 'Bal Thakarey'। যদি আমরা তা বাংলায় 'বল' লিখি তা হবে শোভন ও শ্রুতি মধুর। কিন্তু হিন্দীভাষীদের মতো করে বলতে গিয়ে যদি আমরা 'ব' ও 'ল'-এর মাঝখানে একাটা 'আকার' বসিয়ে দিই তাহলে তা হিন্দীভাষীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হলেও বাংলাভাষীদের কাছে হবে অশোভন ও অশ্লীল।



www.pathagar.com

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নাম বিভিন্ন জনে বিভিন্ন ভাবে লিখলেও তাঁর নামের প্রকৃতরূপ হওয়া উচিত নরসিংহ রাও। মহাভারতে ভক্ত প্রহ্লাদের একটি কাহিনী আছে। তাঁর গভীর ধর্মানুরাগ থেকে তাঁকে বিরত রাখার জন্য তাঁর পিতা হিরণ্যকশিপু অনেক চেষ্টাচরিত্র করেও ব্যর্থ হন। প্রহ্লাদের বক্তব্য ছিল, ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান। এরই প্রেক্ষাপটে একটি ফটিকস্তম্ভ দেখিয়ে পাষন্ড পিতা তার পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে কী তোর ঈশ্বর আছে? প্রহ্লাদ জবাব দেন : হ্যাঁ, এখানেও আছেন। তখন হিরণ্যকশিপু তা পদাঘাতে ভেঙ্গে ফেলেন। তখন সেই স্তম্ভের থেকে আবির্ভূত যে মূর্তি হিরণ্যকশিপুর বুক চিড়ে ফেলেন তিনি ছিলেন এক নৃসিংহ মূর্তি বা নরসিংহ মূর্তি।

পাকিস্তান ক্রিকেট দলের স্পীডস্টার ওয়াকার ইউনুসের নামের শেষাংশ ইংরেজিতে লেখা হয় Yunis হিসেবে, বাংলাদেশে পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত আনোয়ার কামালের নামের শেষাংশ ইংরেজিতে লেখা হয় Kemal হিসেবে। আমাদের সাবেক প্রধান বিচারপতি কামালউদ্দিন হোসেনের নামের প্রথম অংশ ইংরেজিতে লেখা হয় Kemaluddin হিসেবে। বাংলায় লিখতে গিয়ে কিন্তু আমরা ঠিকমতোই ইউনুস, কামাল বা কামালউদ্দিন লিখি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও যশস্বী চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের নাম ইংরেজিতে 'রবীন্দ্রনাথ টেগোর' ও 'সত্যজিৎ রে' হিসেবে লেখা হয়। কিন্তু বাংলায় লেখার সময় আমরা বিশুদ্ধরূপে ঠাকুর ও রায় লিখি। যেমন করে মধুকবি মাইকেল পুরোপুরি সাহেব হলেও বাংলায় তাঁকে বলা হয় না মাইকেল মধুসূদন ডাট্।

আসলে এ জগতে কোনো কিছুই পূর্ণাঙ্গ নয়। ভাষার মতো নামও একটি মানুষকে চেনার একটি অপূর্ণাঙ্গ প্রতীক মাত্রা। তবুও নামের বানান, উচ্চারণ বা তার অর্থগত কারণে কোনো মানুষের নামটিতেই তার স্বরূপে উদঘাটিত হয়ে থাকে, সেই স্বরূপে তিনি মহিমান্বিত হয়ে থাকেন। একজন মানুষ যখন নিজের বৃত্ত পেরিয়ে বিশ্বসভায় তাঁর নামকে ছড়িয়ে দেন, তখন তাঁর সেই অপূর্ণাঙ্গ প্রতীকী নামটিই একটি বিরাট অর্থ তুলে ধরে। তখন তাঁর নামের সামান্যতম বানান ও উচ্চারণগত ত্রুটিও আমাদের পীড়া দেয়। সামান্যতম ভুলও মহালংকাকান্ড বাঁধিয়ে ফেলতে পারে। কারণ 'KAMAL' শব্দটি কামালও হতে পারে, কমলও হতে পারে। আবার 'DANISH' শব্দটি দানিশও হতে পারে। ড্যানিশও হতে পারে। শুদ্ধ রূপটি ঠিকমতো না লিখলে মানহানির মামলায় পড়ে যেতে পারেন সংবাদপত্রওয়ালা। সামান্য ভুলের কারণে ব্যক্তিগত সমস্যা থেকে শুরু করে সামাজিক সংঘাতও হয়ে যেতে পারে। কারণ নামে অনেক কিছুই আসে যায়।

*সূত্র : দৈনিক আজকের কাগজের সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত।*



www.pathagar.com

# বাংলাদেশের বাংলা সংবাদপত্র : সাম্প্রতিক প্রবণতা (ভাষা, বিষয় ও পরিবেশনায়)

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের বাংলা সংবাদপত্রে বিচিত্রধর্মী বিষয়ের পরিবেশনা ও ভাষার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। গত পাঁচ থেকে দশ বছরে এই পরিবর্তন বেশি মাত্রায় লক্ষণীয়। পঞ্চাশ বছর আগে এমনকি বছর পঁচিশেক আগেও বাংলা সংবাদপত্রে যে ভাষা ব্যবহার হতো অথবা যে কায়দায় ভাষার ব্যবহার হতো তার অনেক কিছুই আর এখন হয় না। বর্তমানের মোবাইল সংস্কৃতি কিংবা ফেসবুকের মতো বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ নেটওয়ার্কের কল্যাণে সার্বজনীন কথ্য ভাষার বাইরে সৃষ্ট এক বিচিত্র ভাষাও সংবাদপত্রে বেনোজলের মতো ঢুকে পড়েছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ের নাটক, টেলিফিল্ম কিংবা ফিচার ফিল্মে ব্যবহৃত কিছু ভাষাও। সংবাদপত্রে ভাষার প্রয়োগের ক্ষেত্রে বড় ধরনের পরিবর্তন বলতে গেলে গত শতকের শেষ দশকের শুরু থেকে। এই পরিবর্তন সংবাদবিবরণী ও সংবাদভাষ্য রচনার ক্ষেত্রে, এই পরিবর্তন শিরোনাম গঠনের ক্ষেত্রে এবং এই পরিবর্তন সংবাদপত্রের পাতায় প্রকাশযোগ্য যেকোন ধরনের রচনার ক্ষেত্রে।

কেন এই পরিবর্তন? এই পরিবর্তন সঙ্গতই যুগের দাবির চাহিদাকে মেটানোর স্বার্থে। এই পরিবর্তন নতুন প্রজন্মের পাঠকের চাহিদা মেটানোর স্বার্থে। গত শতাব্দীর শেষ দশক থেকেই বিশ্বায়নের যুগ শুরু। একদিকে যেমন জটিল যুগযন্ত্রণা, অন্যদিকে সর্বগ্রাসী তথ্যপ্রযুক্তির কারণে উৎসারিত বিপুল তথ্যরাশির ভিতরে হতবিহ্বল পাঠককে বিভিন্ন পত্রিকার বিভিন্ন লেখায় ধরে রাখা, আকৃষ্ট করা এবং যন্ত্রের ন্যায় প্রায় ছুটে চলা মানুষের কাছে আরো যুগোপযুগী ও সহজ করে বলার স্বার্থেই সংবাদপত্রের বিষয়, ভাষা ও পরিবেশনা বদলাতে হচ্ছে। অনেকের দাবি এখন হয়তো অনেক বেশি জীবনঘনিষ্ঠ করে বলার চেষ্টা হচ্ছে।

আমরা জানি ভাষা সদা পরিবর্তনশীল। আবার সংবাদপত্রগুলোও ভাষা তৈরির এক একটি কারখানাও বটে। নতুন ভাষা তারা তৈরি করবে এটাই স্বাভাবিক।



www.pathagar.com

ভাষা সৃষ্টি ও তা প্রচারের হাতিয়ার হচ্ছে সংবাদপত্র। বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলো গত পাঁচ দশ বছরে ভাষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনে ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু পরিবর্তন করতে গিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে সংবাদপত্রগুলো দৃশ্যত কোন কোন ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় স্বাধীনতা ভোগ করে ফেলছে। আগেই বলেছি, 'ভোঁদাই' শব্দটির মতো একটি অশোভন শব্দ আমরা টেলিভিশন বা সংবাদপত্রে অবলীলায় বলে ফেলছি। অপরদিকে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কল্যাণে প্রাথমিক তথ্য ও খবরগুলো আগে ভাগেই পেয়ে যাওয়ায় তার প্রাথমিক বিষয়গুলো সরেস করে বর্ণনা করতে গিয়ে প্রায়শই তা হয়ে পড়ছে অস্পষ্ট ও ভাবার্থবোধক। অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট লেখকের অজ্ঞতায় কিংবা অসতর্কতায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সজ্ঞানে সাংবাদিকতার নীতি লংঘন করা হচ্ছে। অজান্তে অথবা অসচেতনতায় কারো ব্যক্তি বা মৌলিক অধিকার লংঘন করা হচ্ছে, কিংবা করা হচ্ছে আদালত অবমাননা। কিন্তু আমরা জানি সাহিত্যের ভাষা ভাববাচক আর সংবাদপত্রের ভাষা মুক্ত, স্পষ্ট। সংবাদপত্রের পাঠক নয় বছরের শিশু থেকে নব্বই বছরের বৃদ্ধ। পত্রিকা পড়তে পারে, পত্রিকা পড়ে পত্রিকার কথা বুঝতে পারে এমন সকল শ্রেণীর পাঠকের ভাষাই হলো সংবাদপত্রের ভাষা। উল্টোদিকে সাহিত্যের ভাষা শুধুমাত্র একটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণীর ভাষা। সাহিত্যের ভাষা ভাববাচক ও ইঙ্গিতময়, সংবাদপত্রের ভাষা স্পষ্ট ও সরাসরি। সংবাদপত্রের জ্ঞাপনকর্ম চলে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ের একটি অন্যতম প্রবণতা হচ্ছে ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা। নির্ভেজাল সতেজ সংবাদ লেখার ক্ষেত্রেও এই দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট লক্ষ করা যায়।

সংবাদপত্রের অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে শিক্ষিত করা। পঁচিশ তিরিশ বছর আগে পত্রিকাকে শিক্ষার অন্যতম বাহন হিসেবে নির্ভর করার এক ধরনের আস্থা পাঠকের ছিল। এখন সংবাদপত্রে অসংখ্য তথ্য আছে কিন্তু পত্রিকা পড়ে শিক্ষিত হবার ঝুঁকিও তৈরি হয়ে গেছে। এটা ইংরেজি পত্রিকায় যতটা না, তার চেয়ে বেশি বাংলা সংবাদপত্রে। অনেক পাঠক ঠিক নিশ্চিত নন যে তিনি বা তার পরবর্তী প্রজন্ম পত্রিকা পড়ে সঠিক জিনিসটি শিখছে কিনা। অনেক উন্নতির পরও পত্রিকা পাঠকের এক ধরনের আস্থার সংকট তৈরি হয়েছে। এরই আলোকে আমরা সংবাদপত্রে প্রকাশিত বেশ কিছু লেখার থেকে বাংলা সংবাদপত্রের ভ্রান্তি বা সমস্যাগুলো বোঝার চেষ্টা করতে পারি। কয়েক বছর ধরে 'বিচারিক' শব্দটি আমাদের পত্রিকায় একটি বহুল প্রচারিত শব্দ। কিন্তু ভাষাবিদরা ব্যকরণের আলোকে একে ভুল বলে অ্যাখ্যায়িত করে 'বৈচারিক' কথাটি লেখার পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন, যেমন করে আমরা লিখি বৈমানিক। কিন্তু কে শোনে কার কথা!

কোন কোন সময় লেখকের অজ্ঞতায় ভ্রান্তি তৈরি হয়। এরকম একটি ভ্রান্তি আদালত অবমাননা করে ফেলেছিল তার উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। একটি পত্রিকায় প্রকাশিত একটি শিরোনাম ছিল নিম্নরূপ :

'মাতৃহন্তারক বেকসুর খালাস' এই শিরোনটি লেখার পর সংশ্লিষ্ট আদালত পত্রিকার সম্পাদকের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ এনে আদালতে হাজির হবার



www.pathagar.com

সমন জারী করেছিল। পত্রিকাটির সংশ্লিষ্ট সহ-সম্পাদক বুঝতেই পারেননি যে মাকে হত্যার অভিযোগে যিনি অভিযুক্ত হয়েছিলেন আদালত তাকে দোষী সাব্যস্ত করেনি বিধায় তাকে খালাস দিয়েছে। সহ-সম্পাদকও আদালতকে চ্যালেঞ্জ করতে চায়নি। শব্দ প্রয়োগের ত্রুটি বা টেকনিক্যাল সমস্যাটি তিনি বুঝতে পারেননি। তাঁর ভাষাগত ভুলের খেসারত দিতে হয়েছে তাঁর সম্পাদককে। সাম্প্রতিক সময়েও কয়েকজন বড় সম্পাদক আদালতের কাছে এ ধরনের ভ্রান্তির কারণে সৃষ্ট নীতির লড়াইয়ে হার মেনেছেন। শব্দ প্রয়োগের অজ্ঞানতা ও অসতর্কতায় একজন সহ-সম্পাদক হয়তো ওপরের ভুলটি করেছিলেন কিন্তু যখন কোন একটি সংবাদবিবরণীর শিরোনাম লেখা হয় 'লম্পটের পুত্র লম্পটই হয়' তখন বোঝা যায় তা শোভনের সীমার মাত্রা ছাড়িয়েই লেখা হয়েছে এবং সেখানে নৈতিকতার বালাই একবিন্দুও রক্ষা করার চেষ্ট হয়নি। শিরোনামের ভাষ্যটি এমন হতে পারে যে কেউ বলেছে কিন্তু এ ধরনের কথা শিরোনামে লেখা উচিত কিনা এটাই নীতির প্রশ্ন। অপরদিকে বছর কয়েক আগে সাহিদা নামে একজন ম্যাজিস্ট্রেট হত্যা মামলার রায় ঘোষণার পর সংবাদবিবরণী প্রকাশের সময় দুয়েকটি নামী পত্রিকায় হত্যাকান্ডের বিবরণ দিতে গিয়ে নিম্নরূপ শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছিল। '...সাহিদার উরুতে ও স্তনে লাগাতার ছুরিকাঘাত করে তাকে হত্যা করা হয়...'। সাধারণত মানুষের বুকে পিঠে বা পেটে ছুরিকাঘাত করলে মারা যাবার আশংকা অনেক বেশি থাকে। কিন্তু নারী দেহের দুটো বিশেষ প্রত্যঙ্গকে উল্লেখ করে রিপোর্টার বা বার্তা সম্পাদক আরো কয়েকটি কপি বিক্রির আশা করে থাকলে তা ছিল ভুল। বরং এরকম শব্দ প্রয়োগ করে পত্রিকার মর্যাদাকে অনেকটাই নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। এখানে ছুরিকাঘাতের গুরুত্বকে তুলে না ধরে নারী দেহের বর্ণনা প্রাধান্য পেয়েছে। একইভাবে একটি শিরোনাম 'দৃষ্টিনন্দন' কথাটি বসিয়ে পাহাড় কেটে ফেলার ক্রুরতা থেকে দৃষ্টি তুলে নিয়ে 'দৃষ্টিনন্দন' কথাটায় নিবদ্ধ করা চেষ্টা হয়েছে এবং এতে পাঠক পাহাড় কেটে ফেলার সামাজিক সমস্যাতে দৃষ্টি দেয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

ইংরেজি শব্দের বাংলান্তর করার সময় অজ্ঞতার কারণে অদ্ভূত ও বিদঘুটে যে অর্থ তৈরি হয়ে যায় তার দুটো উদাহরণ আমরা দেখতে পারি। যার একটি সম্পর্কে আমরা আগেও একটু বলেছি। বিশেষত ক্রিকেট খেলা 'Ritired hurt' বলে একটি শব্দগুচ্ছ রয়েছে। একবার এর ভাষান্তর করা হলো 'হৃদযন্ত্রের গোলযোগ' বলে। যিনি ভাষান্তর করলেন এবং যিনি এটি চেক করলেন তাদের একবারের জন্যও কি মনে হলো না Retired Hurt-এর প্রকৃত অর্থ কি। অথবা এটির প্রকৃত অর্থ যিনি জানেন তাঁর কাছ থেকে জেনে নেওয়ার প্রশ্নও কি জাগলো না মনে? অপর একটি পত্রিকা 'The Court granted leave for appeal' কথাটির অর্থ করেছিল 'আদালত আপীলের জন্য ছুটি মঞ্জুর করেছে'।

এই ধরনের অর্থগত ভ্রান্তি আমাদের পত্রিকায় অহরহ ঘটছে। দেখার কি লোক নেই? বাংলা শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ জানা না থাকলেও তার অজ্ঞতাপ্রসূত প্রয়োগ কোন কথাকে হাস্যাস্পদ করে তোলে। ঢাকার একটি নামী ও লক্ষাধিক



www.pathagar.com

সার্কুলেশনের পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদবিবরণী ভাষাগত অজ্ঞতা ও শৈথিল্যের কারণে যে উৎকট অর্থ তৈরি করেছিল তার উদাহরণটি দেখা যেতে পারে। '...বাবুল সদ্য বিবাহিত, তাহার একটি দেড় বছরের কন্যা সন্তান রহিয়াছে।...' লেখাটি একটি সংবাদবিবরণীর অংশ। সুনামগঞ্জে একটি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় নিহত জনৈক বাবুলের ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে গিয়ে রিপোর্টার রিপোর্টে সম্ভবত এমন একটি বিষয়কে আনার চেষ্টা করেছিলেন যাতে করে তা পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করে। লেখাটি পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শতো করেইনি বরং লেখকের কিংবা সহ-সম্পাদকের পেশাগত অনুৎকর্ষ ও অসচেতনতাকে স্পষ্ট করেছে এবং পত্রিকার গ্রহণযোগ্যতাকে করেছে প্রশ্নের সম্মুখীন।

অন্য একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝা যেতে পারে একটি শব্দের পিঠে আরেক শব্দের ভ্রান্তিকর প্রয়োগ পুরো বিষয়কে কেমন দূর্বল ও হালকা করে তোলে। লক্ষাধিক সার্কুলেশনের আর একটি পত্রিকায় লেখা হলো-...তিন্নির মৃত্যুর পর তিন্নির মতোই তার মেয়ে আনুশকার জীবনেও নেমে এসেছে পরম অনিশ্চয়তা। বাবা পিয়াল এখন জেলে। আনুশকার দিন কাটছে তার দাদা-দাদী আর চাচাদের কাছে। গতকাল... প্রতিবেদকের সঙ্গে আলাপকালে আনুশকার দাদী দীদার হোসেন জানান, গত এক মাস ধরে আনুশকা মোটেই খাওয়া-দাওয়া করছে না...। লেখাটি ফিচারধর্মী সংবাদবিবরণীর একটি অংশ মাত্র। এই অংশবিশেষ লেখার মধ্যেই দু'একটি শব্দ যেমন 'খাওয়াদাওয়া' মোটেই জুৎসই নয়। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা আনুশকার জীবনকে 'পরম' অনিশ্চয়তা বলে অভিহিত করা হয়েছে। তা 'মুদ্রণ বিভ্রাট' বলে মনে হতে পারে। কিন্তু দীদার হোসেনের সামনে যখন 'দাদী' কথাটা বসানো হয়েছে তখন বুঝতে অসুবিধা হয়না লেখায় প্রতিবেদক ও সহসম্পাদক উভয়ের কাজের ক্ষেত্রে অজ্ঞতা ও শৈথিল্য রয়েছে। 'পরম' অনিশ্চয়তা না হয়ে 'চরম' অনিশ্চয়তা হওয়ার কথা, কিন্তু তার পরেও কথাটি ভাববাচক।

অজ্ঞতা ও শৈথিল্য সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস, জাতি, ধর্ম সবকিছু নিয়ে ছবির ক্যাপশনেও গোলমাল ধরা পড়ে মাঝে মধ্যেই। একবার নামী একটি পত্রিকার ক্যাপশনে বলা হলো যে টেলিভিশন চ্যানেলে অশ্লীল দৃশ্য প্রদর্শনের প্রতিবাদে আকালীদলসহ ভারতের কট্টরপন্থী কিছু মৌলবাদী সংগঠন গত রোববার নয়াদিল্লিতে এক বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে নকল টেলিভিশনে অগ্নিসংযোগ করে। ছবিটি ছিল বেশ বড়। তবে সেটার ত্রুটি ছিল না। ওই ক্যাপশনে যা কিছু লেখা থাকুক না কেন, ছবিতে কিন্তু পাগড়ি মাথার শিখদের দেখা যাচ্ছিল। ক্যাপশনেও লেখা ছিল, আকালী দল। কিন্তু তারপরেও লেখা হয় 'কট্টর হিন্দু মৌলবাদী সংগঠন'। আকালীরা হিন্দু নয় একথা ক্যাপশন লেখক সম্ভবত জানেন না। কিন্তু এই ভুলগুলো আমাদের বলা হচ্ছে, আমরাও তাই শিখছি। যেমন করে একটি বাংলা পত্রিকার শিক্ষা বিষয়ক পাতায় লেখা হয়েছিল 'Nobel laureate Mother Teresa got Nobel award in 1971'. পুরো বাক্যে গোটা দুয়েক ভুল ছিল। একটি বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে, অপরটি তথ্যের ক্ষেত্রে।



www.pathagar.com

এবার একটি সংবাদশীর্ষ দেখি যেখানে পঞ্চাশটির ওপরে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। অথচ তা অনায়াসেই কুড়ি শব্দের নিচে লেখা যেতো। সংবাদশীর্ষটি নিম্নরূপ :

> চাঁদপুর থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি : চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার সীমান্ত বর্তী দুটি গ্রাম মনতলা ও জলশাবায় খালের ওপর বাঁধ নির্মাণকে কেন্দ্র করে গতকাল শুক্রবার জুম্মার দিনে বেলা সাড়ে ১১টায় গ্রামবাসীদের সাথে পুলিশের এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে ৭জন পুলিশসহ ৫০ জন আহত হয়েছে এবং আহতদের মধ্যে ১৫ জনকে গতকালই আশঙ্কাজনক অবস্থায় চাঁদপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ওপরের সংবাদশীর্ষটি পড়তে একজন পাঠককে তিনবার দম নিতে হবে, সম্ভবত একবার পানিও খেতে হবে। অনেক ভালো ভালো ও স্মার্ট সংবাদশীর্ষের পাশাপাশিও উপরের উদাহরণটির মতো অতিমাত্রায় দূর্বল সংবাদশীর্ষও আমরা ছাপা হতে দেখছি।

এবার বাংলা সংবাদপত্রের সংবাদবিবরণীতে ক্রিয়াপদের ব্যবহারটা লক্ষকরি :

> 'হজ্বের সকল আনুষ্ঠানিকতা ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। সৌদী কর্তৃপক্ষ ব্যাপক নিরাপত্তা গ্রহণ করেছেন। হজ্বব্রত পালনের উদ্দেশ্যে সৌদী আরবসহ বিশ্বের ১৬০টি দেশের প্রায় ২৫ লাখের বেশি ধর্মপ্রাণ মুসলমান নরনারী মক্কার পূণ্যভূমিতে সমবেত হয়েছেন। হাজীদের জন্য মিনায় ৪০ হাজার তাবু স্থাপন করা হয়েছে। আরাফাতের ময়দানেও এসি তাঁবুসহ হাজীদের যাতে সারাদিন অবস্থান করতে পারেন সে ব্যবস্থা করা হয়েছে। খাবার পানি, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র রাখা হয়েছে। হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিশের পাশাপাশি এবার সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।'

একটি পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদবিবরণীর ওই অংশটুকুতেই প্রতিটি বাক্যের শেষে ক্রিয়াপদের ব্যবহার করা হয়েছে সাতবার এবং শুধুমাত্র 'হয়েছে' ক্রিয়াপদটি ব্যবহৃত হয়েছে পাঁচবার। ইংরেজিতে ক্রিয়াপদের ব্যবহার সাধারণত বাক্যের মাঝখানে এবং কোন Noun-কেও ক্রিয়াপদে রূপান্তর করা যায়। কিন্তু বাংলায় এটা সাধারণত চলে না। তবে বৈচিত্র্য আনার জন্য প্রতিটি বাক্যের শেষে না দিয়ে বাক্যের মাঝখানেও ক্রিয়াপদের ব্যবহার করা যেতে পারে। বাংলা সংবাদপত্রে প্রতি বাক্যের ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের ব্যবহার অতি প্রচলিত ব্যাপার। ক্রিয়াপদের ব্যবহার বাক্যের মাঝখানে দু'চার বার ব্যবহার করলে কানে শুনতে-ভালোই লাগে। বৈচিত্রও তৈরি হয়।

আমরা পত্রিকার দু'একটি পাতার দিকেও মনোনিবেশ করতে পারি। বাংলা সংবাদপত্রের খেলার পাতাগুলোকে এখন গল্পের পাতা বললে বোধহয় খুব একটা বাড়িয়ে বলা হবে না। তবে ভুললে চলবে না যে গল্পের নায়ক নায়িকারা কল্পনার, আর খেলার পাতার পাত্রপাত্রীরা জীবন্ত। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কারণে খেলার খবরগুলো আমরা এখন প্রায় সাথে সাথেই পেয়ে যাচ্ছি। পরের দিন সংবাদপত্রের পাতায় শুধু খেলার ফলাফলের ওপর পত্রিকাগুলো চলবে না, পাঠক তা আশাও



www.pathagar.com

করে না। সে কারণে খেলার পরিবেশ পরিস্থিতি পারিপার্শ্বিকতা ও অন্তর্নিহিত অনেক বিষয় নিয়ে না লিখলে খেলার পাতার পাঠক পাওয়া যাবে না এও সত্য। তাই খেলার নানা দিক নিয়ে গল্প বলার ছলে পাঠককে আকৃষ্ট করার চেষ্টা চলে। কিন্তু সেই বলার ঢং অনেকক্ষেত্রেই গল্পেরও অতীত হয়ে যায়। এই প্রবণতা অতি মাত্রায়। একই সাথে খেলার পাতায় মন্তব্যের ছড়াছড়ি এবং সংশ্লিষ্ট লোকজনকে দোষী সাব্যস্ত করার প্রবণতা প্রবল। মাঝে মাঝে তা নীতি ও শোভনের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। অতিমাত্রায় প্রসঙ্গহীন কথাবার্তা বলা হয়। আরো অনেক বিষয় নিয়ে আলোকপাত করা যেতে পারে। তবে সম্পাদকীয় পাতা সম্পর্কে দু'চারটে কথা বলে এ লেখার সমাপ্তি টানা যেতে পারে। বাংলাদেশের বাংলা সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়গুলো ইতোমধ্যেই অনেকটা মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে। সম্পাদকীয় পাতায় কলামসহ অন্যান্য লেখার ভীড়ে সম্পাদকীয় অংশটুকু ম্লান হয়ে পড়েছে। সম্পাদকীয় কলামটি হারিয়ে ফেলেছে তার ভাবগাম্ভীর্য ও সংযম। হারিয়ে ফেলেছে ভাষার ঋজুতা। নেই আগের সেই শাণিত শব্দাবলী। ফলে দ্রুত কমে যাচ্ছে পত্রিকার কণ্ঠস্বর শোনার লোকও। আমরা আগে জানতাম সংবাদপত্র বাঁচে দারুণ দারুণ সব খবরে এবং সেই খবর বিবরণীগুলোর ওপর লেখা কড়া মাত্রার সম্পাদকীয়তে। কিন্তু সংবাদপত্রের সংবাদবিবরণীগুলোর বেশির ভাগই আজকাল খবরের চরিত্র হারিয়ে ফেলছে আর সম্পাদকীয়র জায়গায় জমিয়ে ফেলা হয়েছে নতুন জমানার নতুন ধারার ভাষায় গ্রন্থিত নির্বিচার কলামে।

সম্পাদকীয় পাতায় দায়িত্ব নিয়েছে প্রথম পাতায় প্রকাশিত অসংখ্য মন্তব্য ভারাক্রান্ত প্রতিবেদন। 'মন্তব্য প্রতিবেদন' নামেও অনেক লেখা ছাপা হচ্ছে। আমরা জানি মন্তব্যতো মন্তব্যই। প্রতিবেদন কি করে মন্তব্য হয় তা বিশুদ্ধ সাংবাদিকতার শব্দ ভান্ডারে লেখা নেই। মন্তব্যাশ্রয়ী প্রতিবেদনের চাপে সম্পাদকীয় তার জায়গা ও মর্যাদা হারিয়েছে। হারিয়েছে তার উদ্দেশ্য। কোন কোন সময় দেখা যাচ্ছে উপসম্পাদকীয় লিখছে বাইরের লোক। এতে সুনির্দিষ্ট পত্রিকার নীতি অনুসারে সম্পাদকীয় মতামত প্রতিফলিত হচ্ছে না। অন্যদিকে বাইরের লোকেরা লিখতে থাকায় অনেক কলাম লেখক তৈরি হচ্ছে বটে, কিন্তু সম্পাদকীয় অথবা উপসম্পাদকীয় লেখক আর সেহারে তৈরি হচ্ছে না। সব মিলিয়ে সংবাদপত্র বিশেষ করে বাংলাদেশের বাংলা সংবাদপত্র তার মূল বৈশিষ্ট্যগুলো ক্রমশ হারাচ্ছে। বাংলা সংবাদপত্রে অনেক পরিবর্তন হচ্ছে। কি বিষয়ে, কি পরিবেশনে, কি ভাষায় অনেক বেশি স্মার্ট এখন পত্রিকাগুলো। কিন্তু ভ্রান্তির পরিধিও বাড়ছে। আর নতুনত্বের আড়ালে পত্রিকার সনাতন ও শাশ্বত রূপটি ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। সনাতন ও নতুনের সংমিশ্রণে নতুন কোন ধারা পথ দেখাবে কি!

**পাদটীকা :** লেখাটির মনোনিবেশ সংবাদপত্রের ওপর থাকলেও একটি শীর্ষস্থানীয় টিভি চ্যানেলে প্রচারিত একটি সংবাদবিবরণীর একটি অংশ এখানে উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। গত ০৪.০১১.২০১১ তারিখে ওই চ্যানেলের প্রাইম টাইন বুলেটিনের (রাত ৭টা ৪০ মিনিট) একটি সংবাদবিবরণী স্পট থেকে বর্ণনার সময় রিপোর্টার বলছিলেন, 'বাজেটের মধ্য দিয়ে গরু কিনতে পেরে কেউ তুলেছেন তৃপ্তির ঢেকুর...'। তৃপ্তির ঢেকুর মানুষ কখন তোলে? কী সংবাদপত্রে কী টেলিভিশনে এমনি করেই ভাষার কচুকাটা করা হচ্ছে!

*সূত্র : মূল লেখাটি মিডিয়া ইনস্টিটিউট বিসিডিজেসি আয়োজিত এক সেমিনারে উপস্থাপিত। বর্তমান লেখাটি ইষৎ পরিমার্জিত।*



www.pathagar.com

গণমাধ্যমক্ষেত্রে সদাবিচরণকারী ড. সুধাংশু শেখর রায়ের জন্ম টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকায়। বিদ্বজ্জন পিতা স্বর্গীয় হীরালাল রায় ও সদা অনুপ্রেরণাদাত্রী মাতা শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র ড. সুধাংশু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে ১৯৮৭ (১৯৮৪ ব্যাচ) সালে প্রথম শ্রেণীতে এমএ এবং ২০০৭ সালে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

নিভৃতচারী ও অন্তর্মুখী ড. সুধাংশু শেখর রায়ের পরিচিতি বহুমাত্রিক। তিনি সাংবাদিকতা বিষয়ের একাডেমিক শিক্ষক আবার পেশাজীবীদের প্রশিক্ষকও বটে। এখন অধ্যাপনা করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে। পাশাপাশি ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে খন্ডকালীন শিক্ষক হিসেবেও পড়াচ্ছেন। সাংবাদিকতার মধ্য দিয়েই মূলত ড. সুধাংশুর পেশাজীবন শুরু। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে তৎকালীন দৈনিক পূর্বদেশের খেলার পাতায় প্রদায়ক হিসেবে কাজ শুরু করেন। পরে লেখালেখি করেন সাপ্তাহিক বিচিত্রা ও কিশোর বাংলায়। এরও পরে দৈনিক জনতাসহ বিভিন্ন পত্রিকায় পূর্ণকালীন সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেছেন। কাজ করেছেন কয়েকটি মানবাধিকার সংস্থায়ও।

বাংলাদেশে প্রেস ইনস্টিটিউটে (পিআইবি) সিনিয়র প্রশিক্ষক হিসেবে ১৯৯৮ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত তিনি পিআইবির পরিচালিত সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সের পাঠক্রম ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রতিষ্ঠাতা প্রধান ছিলেন। তিনি বেশ কিছু গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান এনআইএমসি, ম্যাসলাইন মিডিয়া সেন্টার, সেড, বিসিডিজেসি, বেলা, কারিতাসসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অতিথি শিক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন।

ড. রায় জার্মানীর বার্লিনস্থ ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর জার্নালিস্ট (আইআইজে)-এর ফেলো হিসেবে সাংবাদিকতার ওপর প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশ নিয়েছেন। পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্য জার্মানী, ইংল্যান্ড ও ভারত সফর করেছেন। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা সাত, মূলত সাংবাদিকতার ওপর লেখা। এটি হবে তার আট নম্বর গ্রন্থ। আমেরিকার বিখ্যাত প্যালগ্রেভ ম্যাকমিলান সহ দেশেবিদেশে বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা ও জার্নালে তাঁর অনেক গবেষণা নিবন্ধ ছাপা হয়েছে।

তিনি বাংলা একাডেমী, বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট কাউন্সিল এবং টাঙ্গাইলের বিখ্যাত করোনেশন ড্রামাট্রিক ক্লাব (সিডিসি)-এর আজীবন সদস্য।

ড. সুধাংশু শেখর রায় বিবাহিত ও একটিমাত্র মেয়ের বাবা।

www.pathagar.com

ISBN 978-984-603-240-6